ওমরার ডায়েরী থেকে

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ্ জাহান

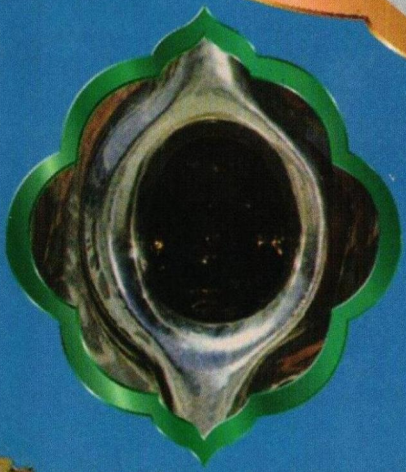

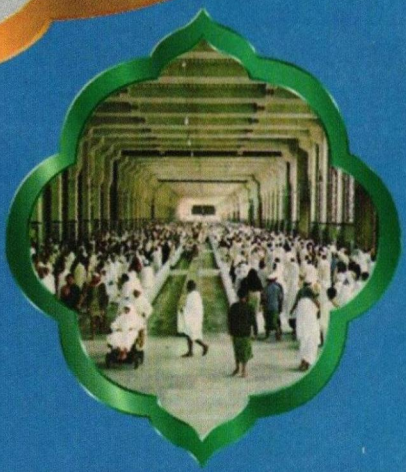

ওমরার ডায়েরী থেকে

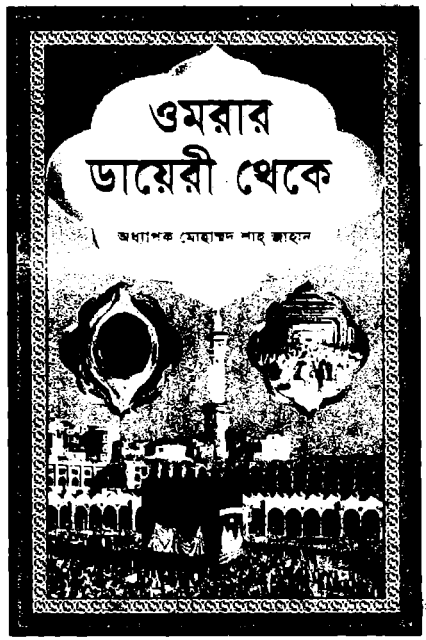

রচনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ্ জাহান

www.pathagar.com

ওমরার ডায়েরী থেকে

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
জিলকদ, ১৪২১ হিজরী
মাঘ, ১৪০৭ বাংলা
জানুয়ারী, ২০০১ ঈসায়ী

প্রকাশক
দোলন - চাঁপা
৩৯/৬, সেনপাড়া পর্বতা,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ
আহমদ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং
১৪৫, আরামবাগ, ঢাকা

দাম
একশত টাকা মাত্র

Umrar Diary Theke (From Diary of Umra) by Professor Mohammad Shah Jahan. Published by Dolon-Chapa, Mirpur, Dhaka-1216
Price Tk. 100.00/ US$ 5.00/ SRL. 15.00

www.pathagar.com

রাব্বির হাম হুমা
কামা রাব্বা ইয়ানি ছাগিরা

আল্লাহ্‌পাক
আম্মা-আব্বার প্রতি
রহম করুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মনোয়ারার প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ চিরন্তন	৯
মক্কা-মদীনা আমার কামনার ধন	৯
ওমরার সুযোগ হল	১১
ভিসা সংগ্রহে বিড়ম্বনা	১১
অফিস থেকে ছুটি প্রয়োজন	১৩
ওমরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে নিলাম	১৪
ওমরার করণীয় / বর্জনীয় জানা আবশ্যক	১৬
ওমরার প্রয়োজনীয় কিছু দোয়া শিখে নিলাম	১৯
তওয়াফের দোয়া সমূহ পড়া উত্তম	২০
সায়ীর দোয়া সমূহ	২৪
সফরের পূর্বরাতে	৩০
আমার সফরের সামান সমূহ	৩২
সফরের আগ মুহূর্তে	৩৩
সফর শুরু	৩৫
আমাদের বিমান ছেড়ে দিল	৩৬
মক্কা-মোয়াজ্জমার মধ্যমণি খানায়ে কা'বা / কা'বা দুনিয়ার প্রথম ঘর কোরআন / হাদীসের পাতা থেকে মক্কা	৩৬
শহর ও খানায়ে কা'বার ইতিহাস	৩৮
খানায়ে কা'বার মালিক এর সংরক্ষক	৪৭
আমাদের বিমান জেদ্দায় অবতরণ করল	৫১
মসজিদে হারামের গেইটে	৫২
ওমরা শুরু করলাম	৫৪
হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু	৫৬
রোকনে ইয়ামানীতে	৬৯
মাকামে ইবরাহীমে	৭৪
যমযম কূপের পাদদেশে	৮৬
আমরা পেট ভরে যমযমের পানি পান করেছি	৯৭
সাফা মারওয়ার পাদদেশে	৯৭
ওমরার কাজ শেষ	১০৮
মক্কার পবিত্র স্থানে জিয়ারত	১০৮
মসজিদে নামেরায়	১০৯
জাবালে রহমতে	১১০
মীনা-মুজদালিফায়	১১৪
জাবালে নূরে	১১৫
জাবালে সাওরে	১১৮
সাথের ব্যাগটি খোয়া গেল	১২৪
মুলতাযিম আশ্রয় প্রার্থনার স্থান	১২৫
হাতীমে	১২৭
মীযাবে কা'বার নীচে	১২৯
ব্যাগ হারানোর পর	১৩০
ব্যাগটি পাওয়া গেল	১৩২
বায়তুল্লাহর প্রতি চেয়ে থেকেছি	১৩৩
তওয়াফের দৃশ্য মনোহর কিন্তু পেছনে রয়েছে খুন ঝরা ইতিহাস	১৩৯
জান্নাতুল মোয়াল্লায়	১৫৩
জ্বিন মসজিদে	১৫৪
নবীপাকের (সঃ) জন্মস্থানে	১৫৪
সামিয়া হারাতুল বাবে	১৫৬
মদীনা-মনোয়ারার পথে	১৫৬
নবীর (সঃ) হিজরতের কাহিনী মনে পড়ে গেল	১৫৮
আমাদের বাস মদীনার হারাম এলাকায় প্রবেশ করল	১৬৬
জ্বিন ও ইনসানের মুহাব্বতের হেরেম মসজিদে নববী	১৬৭
মদীনা মনোয়ারায় পৌঁছে গেলাম	১৭১
ওহুদের ময়দানে	১৭৩
মসজিদে কেবলাতাইনে	১৭৮
খন্দকের ময়দানে	১৭৯
কুবা মসজিদে	১৮৯
মদীনা-মনোয়ারায় আমাদের রুটিন কাজ	১৯৪
সুফ্ফায় আমরা	১৯৫
আযান ঘরের নীচে	১৯৬
মসজিদে নববীতে কোরআনে পাকের জলসা বসে	১৯৮
জান্নাতুল বাকীতে	১৯৯
মদীনা-মনোয়ারার অন্যান্য মসজিদ জিয়ারত	২০১
আত্মীয়ের খোঁজে	২০১
বিদায় মদীনা-মনোয়ারা	২০২
আব্বাস আলী খান সাহেব ইন্তেকাল করলেন খবর পেলাম	২০২
তানঈম থেকে বার বার ওমরা করা থেকে বিরত থেকেছি	২০৪
এবার ফেরার পালা	২০৫

www.pathagar.com

পূর্ব কথা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুব্হানাল্লাহি রাব্বীল আরশীল আজীম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন। আস্সালাতু আসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়ালা আলিহী ওয়াস হাবিহী আজমাইন।

খানায়ে কা'বার তওয়াফ এবং রসূলে পাকের (সঃ) রওজা শরীফ জিয়ারত প্রতিটি মুসলমানের কামনার ধন। কারো এ মনোবাঞ্ছা পূরন হয়; কারো-বা অপূর্ণ থেকে যায়। এটি কপালের লিখন। অন্য কথায়, আল্লাহ্পাকের অনুমোদন থাকা চাই।

আলহামদুলিল্লাহ্, ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে হজ্ব পালন করার সৌভাগ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে সেই হজ্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ভিন্ন আঙ্গিকে ১৯৯৯ইং সালের জানুয়ারী মাসে "হজ্বের ডায়েরী থেকে" শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে; যা সুধী মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। কারণ, হজ্বের মাসায়েল ছাড়াও হজ্ব উপলক্ষে সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বইটিতে স্থান পেয়েছে। হজ্বকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও বইটি সফর বা ভ্রমন কাহিনীতে পরিগণিত হয়। ফলে যে কোন পাঠকের নিকট বইটির গ্রহণ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ১২-০৩-৯৯ ইং তারিখে দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাবে এবং ৩০-০৪-৯৯ইং তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বইটির উপর বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা "হজ্বের ডায়েরী থেকে" বইটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

১৯৯৯ইং সালের সেপ্টেম্বরে পবিত্র ওমরা উপলক্ষে খানায়ে কা'বা তওয়াফ ও নবীপাকের (সঃ) রওজা মোবারক জিয়ারত দ্বিতীয় বারের মত নসীব হয়। এবার পূর্ববৎ "ওমরার ডায়েরী থেকে" নামে একটি বই রচনার ইচ্ছা পোষন করি। এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট মাসালা-মাসায়েল এবং অভিজ্ঞতা বইটির উপকরন হিসেবে নির্বাচন করা হলেও তা যথেষ্ট মনে হল না।

হজ্ব ও ওমরা উপলক্ষে একজন জিয়ারতকারী আল্লাহ্পাকের যে সকল নিদর্শন ও ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্পর্শে আসেন সেগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্যক ধারনা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও তা বাহ্যত হজ্ব বা ওমরা কবুলের পূর্ব শর্ত নয়; তবে নিঃসন্দেহে তা জিয়ারতকারীর আত্মতৃপ্তি ও আত্মোলব্ধির কারন বৈকি! এরূপ ধারনার বশবর্তী হয়ে আমি আমার প্রস্তাবিত "ওমরার ডায়েরী থেকে" বইতে মক্কা ও খানায়ে কা'বার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে শুরু করে খানায়ে কা'বা তওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ, মুলতাযিম,হাতিম, মাকামে ইবরাহীম, যমযম, সাফা মারওয়ায় সায়ী, নবীজীর (সঃ) হিজরত, মসজিদে নববী, ওহুদ ও খন্দকের ময়দান, মসজিদে কেবলাতাইন, কুবা মসজিদ ইত্যাদির ঐতিহাসিক পটভূমি সহ পরিচয়, তাৎপর্য ও মহাত্ম যথাস্থানে পরিবেশন করার প্রয়োজন বোধ করি।

আল্লাহ্পাকের হাজারো শোকর যে, পরিকল্পনা মোতাবেক উপরোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে ওমরার যাবতীয় মাসালা-মাসায়েল ও ওমরার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে "ওমরার ডায়েরী থেকে" বইটি প্রকাশ করা হল। আশা করা যায় যে, "হজ্বের ডায়েরী থেকে" বইটির মত "ওমরার ডায়েরী থেকে" বইটিও সকল মহলে সমাদৃত হবে। বইটির শেষের পাতায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের হজ্ব স্কীমটি সংযোজন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, আগ্রহী মুসলমান ভাই বোনগণ এ থেকে উপকৃত হবেন। আমাদের জানামতে উক্ত স্কীমের অধীনে

www.pathagar.com

একাউন্ট খুলে অনেকেই পবিত্র হজ্ব সমাপন করে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহভাজন হয়েছেন। বইটিতে সন্নিবেশিত ঐতিহাসিক বিষয় ও ওমরার মাসালা-মাসায়েলের জন্যে বেশ কয়েকটি পুস্তক পুস্তিকার সহায়তা নিতে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আকরাম ফারুকের অনুদিত 'সীরাতে ইব্নে হিশাম', সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর রচিত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' ও 'তাফহীমুল কোরআন', এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলামের রচিত 'মক্কা শরীফের ইতিকথা' ও 'মদীনা শরীফের ইতিকথা', মাওলানা আবদুল খালেক রচিত 'সাইয়েদুল মুরসালীন', আবদুল হামীদ আল-খাতীবের রচিত 'মহানবী', মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহিম রচিত 'হাদীস শরীফ', মাওলানা মনির হোসেন ও মাওলানা আজিজুল হক সম্পাদিত 'ছবি দেখে হজ্ব ওমরা জিয়ারতে মদিনা', শেখ গোলাম মহিউদ্দিন সম্পাদিত "কিতাবুল হজ্ব", মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা সংকলিত 'হজ্বের ত্রুটিসমূহ', মাওলানা এ.কে.এম. আবদুল কাদের ভূঁইয়া রচিত 'হজ্ব ও উমরার ইতিহাস এবং জিয়ারতে বাইতুল্লাহ্র নির্দেশিকা', সাইফুল্লাহ্ বিন আহ্মাদ করিম সম্পাদিত 'হজ্ব ও ওমরার সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা' এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'জিয়ারতে বাইতুল্লাহ্'।

উল্লেখিত পুস্তক-পুস্তিকার লেখক/প্রকাশকের অধিকাংশের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। কয়েকজনের অনুমোদন নেয়া সম্ভব হয়নি বলে তাঁদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁদের সবার কল্যাণ কামনা করছি।

"ওমরার ডায়েরী থেকে" বইটি রচনা ও প্রকাশে অনেকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। বইটি লেখা ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে সহায়তা করেছে আমার পুত্র সন্তান ফারহান ও রিজওয়ান এবং কন্যা সন্তান মুনিরা। উৎসাহ যুগিয়েছে সহধর্মিণী এবং দুই সন্তান ফুরকান ও সালমান। সহকর্মী জনাব এ.টি.এম. সালেহ এবং জনাব আজা সরকার বইটির ভাষা উৎকর্ষতায় সহযোগিতা করেছেন। বন্ধুবর জনাব শিবলি মাহমুদ ও জনাব হোসাইন মাহমুদ (সিল্ক টেক্স গ্রুপের যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর), জনাব আরিফ মোহাম্মদ শাহজাহান ও জনাব শহিদুল ইসলাম (নিশু কুকি টিস্যু পেপার লিমিটেডের যথাক্রমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর), জনাব রজ্জব আলী (সুমা এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর), ডাঃ সৈয়দ হারুক শিহাব, জনাব আবদুস সাদেক ভূঁঞা -সহ অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ এবং আরো অনেকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। ছাত্রজীবনের হল মেট খ্যাতিমান শিল্পী বন্ধু জনাব হামিদুল ইসলাম বইটির সুন্দর প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন। জনাব আলাউদ্দিন কম্পিউটার কম্পোজের কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ্পাক সবার অবদান কবুল করুন এবং দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতে নাজাত মঞ্জুর করুন।

প্রসঙ্গতঃ, বইটিতে কোন ধরনের ভুলত্রুটি নজরে এলে তা জানানোর জন্যে পাঠকের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকল।

সর্বশেষে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল ও মঞ্জুর করার জন্যে আল্লাহ্পাকের নিকট নিবেদন করছি, আমীন।

৩১শে জানুয়ারী, ২০০১ ইং

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান

www.pathagar.com

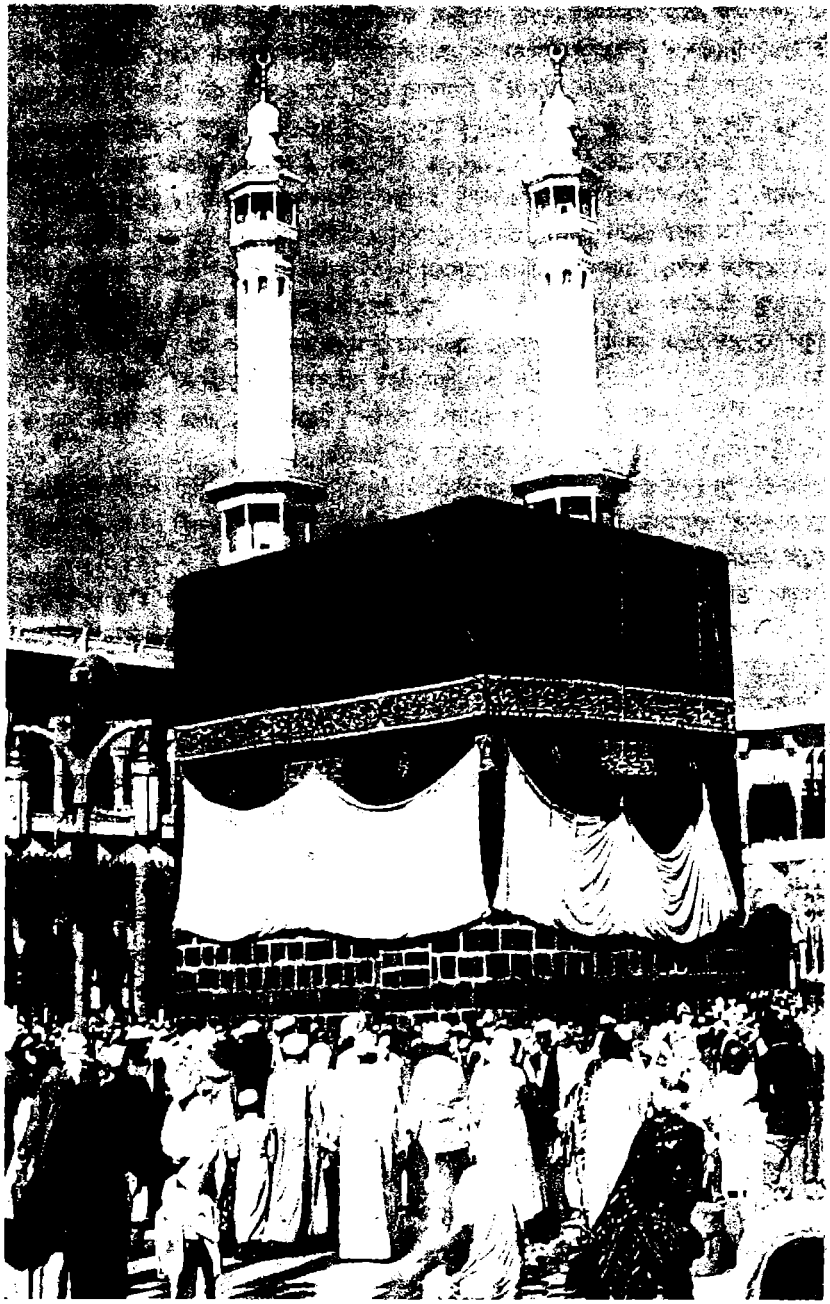

কা'বা শরীফ

www.pathagar.com

মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মনোয়ারার প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ চিরন্তন

মনের বড় আকুতি পবিত্র মক্কা মদীনা বার বার জিয়ারত করি। খানায়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে থাকি, মুলতাযিম ধরে আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর করুণা ও মাগফিরাতের দোয়া করি। 'লাব্বাইকা' বলে হাযিরা দেই। মদীনা মনোয়ারায় নবী পাকের (সঃ) রওজার পাশে গিয়ে তাঁকে সালাম পেশ করি।

এ বাসনা, এ ইচ্ছা আর আরাধনা কেবল আমার নয়, লক্ষ কোটি আল্লাহ রসূলের (সঃ) আশেকের। খানায়ে কা'বার আকর্ষণ শতকোটি ভক্তের অন্তরে ভালবাসার জ্বালা সৃষ্টি করে। এখানে হাজিরা দিয়েছেন লক্ষ কোটি নবী-রসূল ও আল্লাহর নেক বান্দা। পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমা এবং মদীনা মনোয়ারা আল্লাহর রহমতের ভান্ডারে অবগাহন করে তাঁরা ধন্য হয়েছেন, অনুগ্রহ ভাজন হয়েছেন। নেককারগণ নিজেদের নেক এর পাল্লা ভারী করেছেন এবং পাপীগণ গুণাহর পংকীলতা থেকে মুক্ত হয়েছেন। এহেন জায়গায় সফর করার অঙ্গীকার শতকোটি মুসলমানের। ছুটে চলেন পাগলের মত লক্ষ লক্ষ কা'বা প্রেমিক। কিন্তু সবার ইচ্ছা সর্বাবস্থায় পূরণ হবার নয়, স্বাভাবিক এবং সংগত কারণেই। বড় কথা হল, আল্লাহ পাকের মঞ্জুরী থাকতে হবে। অনেক অর্থ-সামর্থ ব্যক্তি ফরজ হলেও হজ্বব্রত পালন করার সুযোগ পায় না। আবার অনেকে আছেন যাঁদের ওপর হজ্ব ফরজ না হলেও আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় বার বার তাঁদের মক্কা মদীনায় জিয়ারত নসীব হয়। এ হল কপালের লিখন। বস্তুতঃ কা'বা নির্মাণ শেষে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ডাক যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরা যে কোন উছিলায় আল্লাহর ঘরে পৌঁছে যাবেন। আর যাঁরা খানায়ে কা'বা একবার দর্শন করেছেন, নবী পাকের (সঃ) হাজারো স্মৃতি বিজড়িত মক্কা মদীনায় হাযিরা দেয়ার সাধ পেয়েছেন, তাঁদের দৈহিক সত্বা যেখানেই থাকুক না কেন, অন্তর সত্বা কা'বার চত্বর অথবা মসজিদে নববীর অঙ্গনে পড়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বস্তুতঃ মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মনোয়ারার প্রতি ঈমানদারদের আকর্ষণ শুধুমাত্র আবেগ উচ্ছাসের ফলশ্রুতি নয়; এর সাথে সমস্ত মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ঈমান-আকিদা এবং সর্বোপরি আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতের নিদর্শন জড়িত। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্যে মুসলমানগণ মক্কা-মদীনার সাথে একটি নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করেন।

মক্কা-মদীনা আমার কামনার ধন

মূলতঃ কা'বাকে ভালবাসার অর্থ কা'বার মালিককে ভালবাসা; আর এর মাধ্যমে তাঁর ক্ষমা ও নৈকট্য অর্জন। কা'বার মালিকের খাছ নিদর্শনগুলোর দর্শন বস্তুতঃ তাঁর নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয়। কা'বার প্রতিটি পাথর, হাজরে আসওয়াদ, মুলতাযিম, মাতাফ, মাকামে ইবরাহীম, যমযমের পানি, প্রতিদিন অগণিত মানুষের তওয়াফ ও সায়ী ইত্যাদির চাক্ষুস দর্শনে ঈমানদারের মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা অপূর্ব। উপলব্ধিবোধ হয় মহাপ্রভুর সান্নিধ্যের। ভক্ত যখন বলে উঠে "লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা শারীকালাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নে'য়মাতা লাকা ওয়াল মুলক্, লা শারীকালাক্" - আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, আমি হাজির,

www.pathagar.com

কোন শরীক নেই আপনার, আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই, আর সকল সাম্রাজ্যও আপনার, আপনার কোন শরীক নেই।"

এমনি অবস্থায় মনে হবে যেন এমুহূর্তে প্রভু সামনে হাজির। তিনি বলছেন, বান্দা কি চাই তোমার? কি পেরেশানি তোমার? মোমেন তখন প্রাণ খুলে দোয়া করতে থাকবে। অতীতের সকল গুনাহ্ খাতার জন্যে মাফ চাইবে। অনাকাঙ্খিত পাপ আমলের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবে, অনুতপ্ত হবে। প্রভুর রহমত ও নৈকট্য কামনা করবে, দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করবে। নিজের জন্যে চাইবে, আত্মীয় স্বজনদের জন্যে, পাড়াপ্রতিবেশী এবং সর্বোপরি মুসলিম মিল্লাতের জন্যে কল্যান কামনা করে দোয়া করবে। এ সময় মনে হবে, মোমেন তার মনিব মালিকের সাথে কথোপকথন করছে। তার চোখের অবিরত অশ্রুধারা এবং অন্তর্চক্ষুই বলে দিবে, সে প্রভুমালিকের দয়ার সাগরে অবগাহন করছে কিনা। প্রভুকে রাজী খুশী করার আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে উঠবে। সে আত্মতৃপ্তি বোধ করবে যে, তার এ সফর সফল হয়েছে, সে পাপপঙ্কিলতা ঝেড়েমুছে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন লাভে ধন্য হয়েছে; এ প্রাপ্তি তাকে মহিমান্বিত করবে, গৌরবান্বিত করবে। তার জীবন সার্থকতায় ভরে উঠবে। একজন মোমেনের এর চেয়ে বেশী আর কি চাওয়া পাওয়ার থাকতে পারে! পবিত্র হজ্ব ও ওমরা উপলক্ষে মক্কা মোয়াজ্জমা আর মদীনা মনোয়ারা সফরের মাধ্যমে একজন মোমেন তার জীবনে এরূপ বিপ্লব উপলব্ধি করতে পারেন। বলাবাহুল্য যে, এ জন্যেই মোমেন তার জীবন তন্ত্রির সাথে মক্কা-মদীনার সংযোগ স্থাপনে উদগ্রীব হয়ে উঠে।

নব জীবন লাভে ধন্য মোমেন হজ্ব / ওমরা সমাপনের পর আল্লাহপাকের আরাধনা আর বন্দেগীর ব্যাপারে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে। ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে মালিক মনিবের দাসত্ব এবং নবীর (সঃ) আনুগত্য মেনে চলা এবং সমাজ জীবনে ইসলামী জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সে তৎপর হয়ে উঠে। মূলতঃ হজ্ব ও ওমরার শিক্ষা তা-ই। মক্কা-মদীনায় মোমেনদের মহা সম্মেলনে এ মহড়াই চলে। কাফনের কাপড় পরে মোমেন তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করে খানায়ে কা'বা ধরে প্রভুর হুকুম পালনের সার্বিক প্রস্তুতি এবং চূড়ান্ত কোরবানীর ঘোষনা দেয়। অতীতের ভুলত্রুটির পূনরাবৃত্তি না করা এবং তার ক্ষতি পূরণের জন্যে অধিকতর নেক কাজে শরীক হওয়ার প্রতিজ্ঞা নেয়। এভাবেই আল্লাহর সাহায্য, ভালবাসা, নৈকট্য প্রাপ্তির এবং তাকে রাজী খুশী করার আশা করা যায়। অন্যথা হলে হজ্ব ও ওমরার যাবতীয় অনুষ্ঠান, মক্কা-মদীনায় সফর অর্থ ও সময়ের অপচয় অথবা ভ্রমন-কাহিনীতে পর্যবসিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের হাজার শোকর যে, ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাসে হজ্ব পালনের সুযোগ হয়েছে। এর পর একান্তে যখনই নবী পাকের (সঃ) স্মরন হয়েছে খানায়ে কা'বা, মীনা, মুজদালিফা, আরাফাত, জাবালে নূর, জাবালে রহমত, নবী পাকের রওজা, ওহুদের পাহাড়, খন্দকের ময়দান, জান্নাতুল বাকি ইত্যাদি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, দোয়া করেছি আল্লাহ পাকের দরবারে - ইয়া বা'রে এলাহি, আপনার পবিত্র ঘরে বারবার হাযিরা দেয়ার তৌফিক এনায়েত করুন। আপনার ঘর ধরে আপনার নিকট ধর্না দেয়ার সুযোগ করে দিন। নবী পাকের (সঃ) রওজার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সালাম পেশ করার তৌফিক দিন।

www.pathagar.com

ওমরার সুযোগ হল

আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে, ১৯৯৯ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে পবিত্র ওমরা উপলক্ষে দ্বিতীয়বার পবিত্র মক্কা মদীনায় সফরের সুযোগ হয়েছে। ধারণাতীত ছিল যে, অত শীঘ্র অমন সুযোগ মিলবে। এ জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না কখনো।

এ ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগালেন বন্ধুপ্রতীম শহীদুল্যা সাহেব। কথায় কথায় তিনি বললেন, চলুন, পবিত্র ওমরা সেরে আসি। উত্তম প্রস্তাব নিঃসন্দেহে। কিন্তু সীমাবদ্ধতার কথা তাঁকে বলতেই তিনি বললেন, আরে ভাই, নিয়ত করুনত, আল্লাহ পাক একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা এবং নির্ভরতার কথা পরবর্তীতে অত্যন্ত নিকট থেকে উপলব্ধি করেছি। আল্লাহ পাককে রাজী খুশী করার জন্যে দেদার খরচ করার মত এমন লোক কমই দেখেছি।

২০০০ ইং সালে শহীদুল্যা সাহেব হজ্ব করার নিয়ত করেছেন। কিন্তু হজ্ব করার পূর্বে একবার ওমরা করার ব্যাপারে তিনি অবিচল, অনড়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ ওমরা সুষ্ঠুভাবে হজ্ব পালনে অত্যন্ত সহায়ক হবে। একদিন নয়, দুদিন নয়, শহীদুল্যা সাহেব অনেকদিন আমার নিকট হজ্বের সফরের কাহিনী শুনেছেন এবং ওমরার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং আমাকেই তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

অবশেষে আল্লাহ পাকের নামে ওমরার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিদ্ধান্ত হল যে, সেপ্টেম্বর, (১৯৯৯ ইং) মাসে শহীদুল্যা সাহেব ও তাঁর একমাত্র ছেলে জিল্লুর রহমান সহ আমরা ওমরার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা-মদীনা জিয়ারত করব। দেখা গেল যে, আমার পাসপোর্টটি এক্সপায়ার করেছে। কাজেই তা রিনিউ করার প্রয়োজন পড়ল। পাসপোর্ট অফিসে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট ফরম এবং ফি যথারীতি জমা দেয়া হল। ইতিমধ্যে পাসপোর্ট অফিসের একজন সহকারী পরিচালকের সাথে পরিচয় হল। তিনি মেহেরবানী করে অল্প সময়ের মধ্যে আমার পাসপোর্টটি রিনিউ করে দিলেন।

ভিসা সংগ্রহে বিড়ম্বনা

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল ভিসা সংগ্রহ। ভিসার আবেদনের জন্যে কনফার্মড্ টিকেট প্রয়োজন। সেই মতে গ্র্যান্ড ট্রাভেল্স এর নিকট থেকে সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ার লাইন্স এর টিকেট কেনা হল। সহ যাত্রী দুজনের নামেও টিকেট সংগ্রহ হল। সাধারণতঃ ভিসা সংগ্রহের কাজটি করে থাকেন সংশ্লিষ্ট ট্রাভেলিং এজেন্ট। তদনুসারে গ্র্যান্ড ট্রাভেল্স-কে ভিসার ব্যাপারে বললে তাঁরা তাঁদের অপারগতা প্রকাশ করলেন। তাঁরা জানালেন যে, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সৌদী দূতাবাস কোন ভিসা দিচ্ছেন না। বিষয়টি শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ হিসেবে বলা হল যে, ওমরার ভিসার মাধ্যমে অনেক বাঙ্গালী সৌদী আরবে গিয়ে আর ফেরত আসেনি। এ কারণে সৌদি দূতাবাস ভিসা মঞ্জুরীর ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেছেন। এক পর্যায়ে গ্রুপ ভিসা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ওমরার উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গমণ বাঙ্গালী জিয়ারতকারীদের সৌদি আরবে অবৈধ অবস্থান বন্ধ করা যায়নি। ওমরা ভিসার ব্যাপারে উপরোক্ত বিধিনিষেধ।

www.pathagar.com

সৌদি কর্তৃপক্ষের উক্ত অবজার্ভেশন যে সঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি হজ্ব মওসুমে হজ্বের নাম করে এদেশের অনেকের সৌদি আরবে থেকে যাওয়ার যথেষ্ট নজির রয়েছে। এ সম্পর্কে আমার লিখা 'হজ্বের ডায়েরী থেকে' বইতে আমি কিছুটা আলোকপাত করেছি। তাতে আমি উল্লেখ করেছিলাম -

"------এটা ছিল কমার্শিয়াল ফ্লাইট। হাজীর সংখ্যা ছিল নগন্য। হাজীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী ছিল। লক্ষ্য করলাম যে, বাঙ্গালী হাজীর অধিকাংশই সৌদি আরবে হাজীর বেশে গিয়ে সেখানে থেকে যাওয়ার জন্যে যাচ্ছেন। তাঁদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে এ বিষয়ে জানতে পারলাম।"

যাহোক, ভিসা সংগ্রহে বিধিনিষেধ আমাদের ভাবিয়ে তুলল। বিভিন্ন লেভেলে আলাপও হল কোন পন্থা বের করা যায় কিনা। নবী নেওয়াজ নামে আমার একজন সহকর্মী আছেন যাঁর স্ত্রী সৌদি দূতাবাসে চাকুরী করেন। ভদ্র মহিলার সাথে আলাপ হলে তিনি আমার অফিসের লেটার হেড প্যাডে সৌদি রাষ্ট্রদূতকে এডরেস করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ দূতাবাসে লিখতে বললেন। তাই করলাম। চিঠিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৌছানো ও তার ফলো আপের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করলেন।

ইতিমধ্যে পবিত্র ওমরা সমাপনার্থে সৌদি আরব যাব, এ-মর্মে আমার নিজ অফিসের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে টেলিফোনে অবহিত করলাম। ভিসা সংগ্রহে জটিলতা দেখা দেয়ায় ছুটির জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে আবেদনের বিষয়টি বিলম্বিত হল। খবরাখবর নিয়ে আশান্বিত হলাম যে, ভিসার কাজে অগ্রগতি হচ্ছে। দুঃখজনক যে, এ সময়ে কয়েকদিন পর পরই হরতাল চলছিল। যার কারণে দূতাবাসেও স্বাভাবিক কাজ কর্ম বিঘ্নিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় বার বার গিয়ে দূতাবাস থেকে খালি হাতে ফিরে আসতে হল। টেনশন বেড়েই চলল। অনিশ্চয়তার আশংকাও বোধ করছিলাম। সহযাত্রী দু'জনের তরফ থেকে বার বার তাগাদা পাচ্ছিলাম। বিব্রতকর পরিস্থিতি আর কি!

সর্বদা আল্লাহ পাকের সাহায্য চাইতে লাগলাম। হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, তাঁর করুণা ও মঞ্জুরী ব্যতীত এমন পরিস্থিতি উতরে যাওয়া সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহ যে, তাঁকে রাজী খুশী করার জন্যেই পবিত্র ওমরার বাসনা। তাঁর ইচ্ছা অন্যথা হলে কার সাধ্য যে, ভিসা মিলবে! নিজের অগাধ পাপরাশিকে স্মরণ করে মহামহিম আল্লাহ পাকের নিকট প্রতিনিয়ত ধর্ণা দিতে থাকলাম। নিবেদন করতে থাকলাম, ইয়া বা'রিতায়ালা আপনার ঘর জিয়ারত নসীব করুন। আপনার পবিত্র ঘর ধরে, মুলতাযিম ধরে, হাতিমে বসে, সাফা-মারওয়ায় বসে, যমযমের কূপের কিনারে দাঁড়িয়ে আপনার দরগায় প্রার্থনার সুযোগ করে দিন। আপনি ভালভাবে জানেন যে, এ যাত্রার পেছনে দুনিয়াবী কোন লক্ষ্য নেই। ধন দৌলতের কিংবা দুনিয়াবী সুখ সম্পদের মোহ নেই। এ বান্দা শুধু আপনার করুণা আর ক্ষমার ভিখারী। আপনার নৈকট্য আর আপনার প্রিয় হাবীবের সুপারিশের কাঙাল। আপনার দয়া আর মেহেরবাণীতে কত গুনাহগার মুক্তির সাধ পেয়েছে। আপনি শাস্তি দিলে, আপনার পবিত্র স্থান দর্শনে বাধা আরোপ করলে তা খন্ডন করতে পারে এমন কেউ নেই, আর আপনি মেহেরবাণী করে আপনার ঘর জিয়ারত নসীব করলে আপনার প্রিয় হাবিবের রওজার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে অতি নিকট থেকে সালাম পেশ করতে দিলে এ-ত আপনারই মহানুভবতা। এ অধমের প্রতি আপনার করুণা।

www.pathagar.com

আরজ করতে থাকলাম, হে মেহেরবান খোদাওন্দতায়ালা, হতে পারে আমার মত এমন পাপী আপনার এ জগতে নেই; কিন্তু মা'বুদ কা'র নিকট মাপ চাইব, যদি না আপনি আশ্রয় দান করেন। আপনিতো নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন।

হতোদ্যম না হয়ে আল্লাহপাকের নিকট তাঁর মঞ্জুরীর আশায় গোপনে তাঁর দরগায় ফরিয়াদ করতে থাকলাম প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে। কোন উছিলা খুঁজে পেলাম না যা তুলে ধরে মহামহিম আল্লাহপাকের করুণা চাইব। অতীত জীবনের সকল কর্মকান্ডকে স্মরণ করলাম যা পর্দার ছবির মত ভাসতে থাকল মনের কোণে। না, তেমন উল্লেখযোগ্য কীর্তি নেই যাকে কেন্দ্র করে মহাপ্রভুর কৃপা, তাঁর ক্ষমা আর করুণা মিলতে পারে। অসহায় বোধ হল, তা হলে কি আমার ক্ষমার দরজা বন্ধ? এ পর্যায়ে আমার একমাত্র সম্বল আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দার সেই অশ্রু বিন্দু দিয়েই তাঁর দরগাহে দু'হাত তুলে আবেদন করতে থাকলাম - হে বা'রি তায়ালা যাদের প্রতি আপনি করুণা করেছেন, যাঁদেরকে আপনি ক্ষমা করেছেন তাঁদের তালিকাভূক্ত হতে বঞ্চিত করবেন না। আপনার মাগফিরাত ও দয়া ভিক্ষা করার জন্যে 'লাব্বাইকা' বলে আপনার ঘরে হাযিরা দেয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর লক্ষ কোটি শোকর যে, ১৯শে সেপ্টেম্বর আমাদের তিন জনের ভিসা মঞ্জুর হল।

অফিস থেকে ছুটি প্রয়োজন

পবিত্র ওমরার উদ্দেশ্যে যাত্রার দিন ইতিপূর্বে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখ ধার্য করা হয়েছিল। মাত্র ৩ দিন বাকি। এক্ষনে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছুটি মঞ্জুরীর বিষয়টি জরুরী। তদনুসারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানালেন যে, প্রধান নির্বাহীর অনুমোদন ব্যতীত এ ব্যাপারে আমাকে ছুটি দেয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো জানালেন যে, পরের দিনই তিনি বিদেশ সফরে যাচ্ছেন; কাজেই এ মুহূর্তেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে তিনি পরামর্শ দিলেন। কাল বিলম্ব না করে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখ বিকেলে প্রধান নির্বাহীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম। ছুটির বিষয়টি উত্থাপনের সাথে সাথেই তিনি তা নাকচ করে দিলেন। তিনি বললেন, এডমিনিষ্ট্রেশনের প্রধান থেকেও তুমি ছুটির নিয়ম কানুন ভুলে গেলে? তুমি জান না যে, এ ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত লাগে? উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আমি কয়েক বছরের জন্যে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিভাগের প্রধান ছিলাম।

আমি বললাম, স্যার, ভিসা পেতে বিলম্বের কারনেই এদ্দিন ছুটির আবেদন করা যায়নি। ওমরার ব্যাপারে আমার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। বললাম, ভুলের জন্যে 'আই এপলজাইজ'। মনে হল যে, তাঁর রাগ কমল। তিনি সম্মানিত চেয়ারম্যানের সাথে সে মুহূর্তেই টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, বিষয়টি সেনসিটিভ। ছুটি দেয়া যেতে পারে।

আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলাম। প্রধান নির্বাহী ও উপস্থিত অন্য ক'জন বিভাগীয় প্রধান তাঁদের জন্যে ওমরা কালে দোয়া করার কথা বলে এ সময় চেম্বার ত্যাগ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা এবং সর্বোপরি অফিসের অনুমোদন পাওয়া গেল। এ পর্যায়ে ওমরা সম্পর্কে কিছু পড়া লিখা করার প্রয়োজনীয়তা দারুন ভাবে অনুভব করলাম। ওমরার ফজিলত, বরকত, মাহাত্ম, এর রুকন সমূহ,

www.pathagar.com

করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী, পাশাপাশি খানায়ে কা'বা, মক্কা-মদীনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পবিত্র নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তক অধ্যয়ন করে নিলাম।

ওমরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে নিলাম

ওমরা শব্দের অর্থ হল সাক্ষাৎ বা দেখার জন্যে উপস্থিত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় ওমরা হল পরিচিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অনুষ্ঠান বিশেষ প্রমাণিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে পালন করা।

মুল্লা-আলীকারীর মতে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা ও সাফা-মারওয়া দৌড়ানোর সংকল্প করার নাম ওমরা।

হজ্বের জন্যে সময় ও দিন তারিখ নির্দিষ্ট থাকে। সেই সময় ও দিন তারিখ ছাড়া হজ্ব হয় না। কিন্তু ওমরার জন্যে কোন সময় বা দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। ওমরা সব সময় এবং যে কোন সময়ই হতে পারে।

হজ্বের সময়কার ওমরা ব্যতীত অন্য সময়কার ওমরা কিন্তু ফরজ বা ওয়াজিব নয়। হজ্বের সময়কার ওমরা সম্পর্কে পবিত্র কালামে পাকে বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহরই জন্যে হজ্ব ও ওমরা কর।"

ওমরা কেন করব

বিভিন্ন সহীহ্ হাদিসে ওমরার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে পাক (সঃ) বলেছেন, তোমরা হজ্ব ও ওমরা পর পর, সাথে সাথে আদায় কর। কেননা, এ দুটি কাজ দারিদ্র ও গুণাহ-খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন রেত লোহার মরিচা ও সোনা রূপার জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্বের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই। - তিরমিজি, আবু দাউদ, মসনদে আহ্মদ, ইবনে খুজাইমাহ, ইবনে হিব্বান।

তায়্যিবী বলেছেন, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা যখন ওমরা সমাপন করলে তখন তোমরা হজ্ব কর, আর যখন হজ্ব অনুষ্ঠান শেষ করলে, তখন তোমরা অবশ্যই ওমরা করবে।

হযরত আমের ইবনে রবীয়াতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি বলেছেন, রসূলে পাক (সঃ) বলেছেন, এক ওমরা থেকে আর এক ওমরা পর্যন্ত এ দুটির মধ্যবর্তীকালীন সমস্ত গুণাহ ও ভুলত্রুটির জন্যে ওমরা কাফফারা। আর হজ্বে মাবরুর এর একমাত্র প্রতিফল হল জান্নাত --- মুসনদে আহ্মদ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেনঃ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ যার আছে তার উপর হজ্ব ও ওমরা ওয়াজিব। এ থেকে কেউই মুক্ত নয়। যদি কেহ তা আদায় করার পর অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা তার নফল ইবাদত এবং অত্যন্ত কল্যাণময় কাজ -- দারে কুতনী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ওমরা করা ওয়াজিব। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ হজ্ব ও ওমরা

www.pathagar.com

উভয়ই ফরজ। এ দুটির যে কাজটিই তুমি কর, করতে পার তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই -- দারে কুতনী।

অপর একটি হাদিসে আছে, হযরত আব রুজাইন আল উকাইলি (রাঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমার পিতা বয়োবৃদ্ধ, হজ্ব ও ওমরা কিংবা বিদেশ সফর করতে অক্ষম। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার তরফ থেকে হজ্ব ও ওমরা কর। এটা ছিল নির্দেশ। তাই আহমদ বলেনঃ ওমরা ওয়াজীব হওয়া পর্যায়ে উপরোক্ত উত্তম ও সহীহ সনদে বর্নিত অন্য কোন হাদিস আমি জানিনা।

ইবনে ওমর বলেছেন, এমন কেউ নেই যার উপর হজ্ব ও ওমরা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে হজ্বের সাথে সাথে ওমরা আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হজ্ব এবং ওমরার নিয়ত করলে তা পুরা কর" (আল-বাকারা)।

ইবনে জুরায়েজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইকরামা ইবনে খালেদ ইবনে ওমরকে হজ্ব আদায়ের পূর্বে ওমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইবনে ওমর বলেছেন, নবী পাক (সঃ) হজ্ব আদায় করার আগে ওমরা আদায় করেছিলেন।

ইমাম মালিক বলতেনঃ ওমরা করা রসূলে পাকের (সঃ) নীতি। তা তরক করবার অনুমতি কেউ দিয়েছে, এমন কথা আমার জানা নেই।

এক ব্যক্তি ওমরা ওয়াজিব কিনা এ সম্পর্কে রসূলে পাক (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলে রসূলে পাক (সঃ) বললেনঃ তা ঠিক ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য নয়, তবে তুমি যদি ওমরা আদায় কর, তা হলে তা তোমার জন্যে খুবই কল্যাণবহ হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মতে হজ্ব ফরজ এবং ওমরা নফল।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক মাসেই ওমরা করা যেতে পারে। অর্থাৎ হজ্বের জন্যে যেমন মাস ও সময় নির্দিষ্ট, ওমরার জন্যে তা নেই।

রমজান মাসে ওমরা সম্পর্কে অশেষ সওয়াবের উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

আনসার কবীলার একজন মহিলা হজ্ব করতে (অবশ্য নফল হজ্ব, ফরজ নহে) না পারায় নবী পাক (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ বছর আমার সাথে হজ্বে গমন করতে তোমাকে কোন জিনিস বাধা দিয়েছে? মহিলাটি জিজ্ঞাসার জবাবে যানবাহন না পাওয়ার কথা বলল। তখন নবী পাক (সঃ) তাকে বললেনঃ যখন রমযান মাস আসরে তখন তুমি ওমরা করো। কেননা, রমযান মাসের ওমরা হজ্বের সমান মর্যাদাশীল হয়ে থাকে।

হযরত উম্মে মা'কাল এসে রসূলে পাক (সঃ) কে বললেন ঃ আমার উটটি দূর্বল হয়ে পড়ার কারণে আমি হজ্বে যেতে পারিনি এখন আমি কি করব? নবী পাক (সঃ) বললেন ঃ আগামী রমযান মাসে তুমি ওমরা করবে। কেননা, রমযান মাসের ওমরা হজ্বের মতই।

www.pathagar.com

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে, উম্মে মা'কাল বললেন ঃ হে রসূল (সঃ)! আমি বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছি, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমার জন্যে এমন কোন আমল আছে কি যা আমার হজ্বের বিকল্প হতে পারে? জবাবে রসূলে পাক (সঃ) বললেন ঃ রমযানের ওমরা তোমার হজ্বের বিকল্প হতে পারে।

উপরোক্ত হাদিসগুলোতে রমযানে করা ওমরার ফযীলত ও অসীম সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। এতে হজ্ব ও ওমরার মধ্যে তূলনামূলক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যাতে রমযানের ওমরা হজ্বের মতই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে নফল হজ্বকে বুঝান হয়েছে, ফরজ হজ্বকে নয়। কারও ওপর হজ্ব ফরজ হলে সে হজ্বের পরিবর্তে ওমরা করলে তার ফরয আদায় হবে না।

ওমরার করণীয় / বর্জনীয় জানা আবশ্যক ঃ

ওমরার রুকন সমূহ ঃ

১. ইহরাম বাঁধা
২. তাওয়াফ করা (সাত চক্কর)
৩. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা

ইহরাম ঃ ওমরার অন্যতম প্রধান রুকন, ইহরাম বেঁধে কি ধরনের পোষাক পরতে হবে এ পর্যায়ে বহু হাদিস রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল (সঃ) ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি এবং দাস্তানা পরবেনা। তবে যদি কেউ এমন হয যে, তার জুতা নেই, তা হলে সে মোজা পরবে এবং গোড়ালীর নীচে থেকে বাকি অংশ কেটে ফেলবে। জাফরান বা ও যারস্ লাগান হয়েছে এমন কোন কাপড় পরিধান করো না; আর ইহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরবে না।

সাফায়ান ইবনে ইয়া'লা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি নবী পাক (সঃ) এর সাথে ছিলাম। (এমন সময়) হলুদ অথবা অনুরূপ আভাযুক্ত সুগন্ধি মাখা একটি জুব্বা পরিধান করে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসল। আর ওমর আমাকে বলতেন, যখন নবী (সঃ) এর প্রতি ওহী নাযিল হয় সেই মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর এক সময় নবী (সঃ) এর প্রতি ওহী নাযিল হলো এবং অহী নাযিলের অবস্থা বিদূরিত হলে তিনি বললেন, যেমন করে হজ্ব আদায় করো, ওমরাতেও তাই করো।

ইহরামে ক্রমধারা ঃ

ইহরামের মূল শিক্ষাকে সামনে রাখতে হবে। মনে করতে হবে এটাই চির বিদায় লগ্ন। ইহরামের কাপড় পরে আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তুতিই চলছে। এ চিন্তা করেই ইহরাম বাঁধতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে ঃ

১। নখ কাটা, অবাঞ্ছিত লোম কর্তন করা
২। অজু গোসল করা, সুগন্ধি মাখা

www.pathagar.com

৩। ইহরামের কাপড় পরিধান করা (ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার না-জায়েজ)
৪। দুই রাকাত নফল নামায পড়া
৫। 'লাব্বাইকা ওমরাতান' - এই বলে ইহরামের নিয়ত করা
৬। ইহরামের পর তালবীয়া (লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা, লাকা ওয়ালমুলক, লা শারীকা লাক) পাঠ করতে থাকা। এছাড়াও দোয়া-দরূদ পড়তে থাকা।

ওমরার ওয়াজিব সমূহ ঃ

১. মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তি মীকাত বা তার পূর্ব থেকে ইহরাম বাঁধা
২. মাথা কামানো বা চুল ছোট করা
৩. ওমরা ও হজ্ব করার ক্ষেত্রে ইহরাম, তওয়াফ ও সা'য়ী (দৌড়ান) করার পদ্ধতি এক ও অভিন্ন

ওমরার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ঃ

মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধার পর তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করবে। তারপর হাজরে আসওয়াদের কোণা হতে সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। তবে তাওয়াফ শুরু করার আগেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। এরপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোথাও দু'রাকাত নামাজ পড়ে, যমযমের পানি পান করে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাত বার সা'য়ী করবে। তারপর মাথার চুল কামিয়ে বা ছোট করে হালাল হয়ে যাবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ঃ

১. কোন ওজর ছাড়া চুল, দাড়ি, পশম ও নখ কাটা
২. ইচ্ছাকৃত সুগন্ধি ব্যবহার করা
৩. স্থলচর প্রাণী শিকার করা বা শিকারে সহায়তা করা
৪. বিবাহ করা, বিবাহ দেয়া ও বিবাহের পয়গাম দেয়া
৫. পুরুষদের জন্যে সেলাই করা কাপড় পরা ও মাথা ঢেকে রাখা
৬. মহিলাদের জন্যে মুখাচ্ছাদন ও হাত মোজা পরিধান করা
৭. যে কোন ধরনের কাজের মাধ্যমে যৌন স্বাদ উপভোগ করা
৮. ঝগড়া বিবাদ করা এবং শরীয়ত বিরোধী যে কোন কাজ ও কথা বলা

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান ঃ

১. মহিলাদের জন্যে সেলাই করা কাপড় পরা বৈধ
২. যে ব্যক্তি ভুলবশতঃ বা জোর পূর্বক সেলাই করা কাপড় পরিধান করল বা সুগন্ধি ব্যবহার করল অথবা মাথা ঢেকে রাখল, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না
৩. ইহরাম অবস্থায় যৌন সাধ নিলে ইহরাম বাতিল হয়ে যাবে
৪. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্য থেকে বাকী যে কোন একটি কাজ ইচ্ছাকৃত করলে ইহরাম বাতিল হবে না বরং ফিদিয়া দিতে হবে

www.pathagar.com

৫. ফিদিয়া হল-মক্কার হারাম এলাকায় একটি ছাগল যবেহ্ করা বা তিন দিন রোজা রাখা বা ছয় জন মিসকিনকে খাওয়ানো।

ইহরামের সুন্নাত সমূহ ঃ

১. ইহরামের পূর্বে গোসল করা
২. সুগন্ধি ব্যবহার করা
৩. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা
৪. দু'টি সাদা চাদরে ইহরাম বাঁধা
৫. নামাজের পর ইহরাম বাঁধা

তওয়াফের শর্ত সমূহ ঃ

১. নিয়ত (সংকল্প) করা
২. সতর করা
৩. নাজাসাত বা অপবিত্র বস্তুসমূহ পরিহার করা
৪. অজু করা (পবিত্রতা অর্জন করা)
৫. হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে তওয়াফ শুরু করা
৬. সাত চক্কর সম্পূর্ণ করা
৭. হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা
৮. আল্লাহর ঘর বাম দিকে রেখে (ডান দিকে) তাওয়াফ করা
৯. পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা (ক্ষমতা থাকলে)
১০. একাধারে সাত চক্কর তাওয়াফ সম্পূর্ণ করা
১১. মসজিদে হারামের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ না করা

তওয়াফের সুন্নাত সমূহ ঃ

১. রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা
২. হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করা
৩. হাজরে আসওয়াদের বরাবর রেখা থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা
৪. আল্লাহর ঘরের নিকটবর্তী হওয়া (সম্ভব হলে)
৫. তওয়াফের মধ্যে দোয়া করা
৬. তওয়াফের শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামাজ পড়া মতান্তরে ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোথাও দু'রাকাত নামাজ পড়লে যথেষ্ট হবে।

সায়ী'র শর্তসমূহ ঃ

১. সংকল্প করা বা নিয়ত করা
২. তাওয়াফের পরে সা'য়ী করা (তারতীব রক্ষা করা)
৩. একাধারে সাত চক্কর সম্পূর্ণ করা
৪. সাফা পাহাড় থেকে সা'য়ী আরম্ভ করা
৫. সাফা ও মারওয়া উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা

সায়ী'র সুন্নাত সমূহ ঃ

১. পবিত্রতার সাথে সা'য়ী করা

www.pathagar.com

২. তওয়াফের পর পর (সাথে সাথে) সা'য়ী করা
৩. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে আরোহণ করা
৪. পাহাড়দ্বয়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা
৫. সবুজ বাতিদ্বয়ে চিহ্নিত মধ্যবর্তী অংশে পুরুষদের দৌড়ানো
৬. সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হওয়ার বা আরোহণ করার সময় আল্লাহু আকবার বলে নিম্মোক্ত দোয়া পড়া ঃ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু-লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্‌ই ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়ানাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।"

ওমরার প্রয়োজনীয় কিছু দোয়া শিখে নিলাম

১. **ওমরার ইহরামের দোয়াঃ** আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান ।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি ওমরার উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত।

২. **তালবিয়া ঃ** লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান'নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা-শারীকা লাক।

অর্থঃ আমি হাজির আপনার দরবারে, আয় আল্লাহ। আপনার দ্বারে আমি হাজির, আপনার কোন অংশীদার নেই। আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নিয়ামত সামগ্রী সব কিছুই আপনার, সর্বযুগে ও সর্বত্র আপনারই রাজত্ব, আপনার কোন অংশীদার নেই।

৩. **মসজিদে হারামে প্রবেশের দোয়া ঃ** বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহি আউযুবিল্লাহিল আযীম, ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল ক্বাদীম, মিনাশ্‌শায়ত্বানির রাজীম, আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, দরূদ ও সালাম রসূল (সঃ) এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। হে রব, আমার জন্যে আপনার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন।

৪. **রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যভাগে পড়ার দোয়া ঃ** রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখেরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযাবন্‌নার; ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা-আলআবরার ইয়া আযীয়ু, ইয়া গাফ্‌ফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে মঙ্গল দান করুন, আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং পূণ্যবানগণের সাথী করে বেহেশতে দাখিল করুন, হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্বপালক!

www.pathagar.com

৫. **রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার দোয়া ঃ** বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর।

৬. **সাফা পাহাড়ে আরোহণের সময় পড়ার দোয়া ঃ** ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়াইরিল্লাহ্ ফামান হাজ্জাল বাইতা আওইয়েয়তামারা ফালাজুনাহা আলাইহে আই-ইয়্যাত্বাওয়াফা বিহিমা ওমান তাত্বাওয়া খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

অর্থঃ নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্ব অথবা ওমরাহ্ করে তার কোন অসুবিধা নেই এখানে তওয়াফ করতে। আর যে ভাল কাজ করল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রজ্ঞাময়।

৭. **সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে পড়তে হয় ঃ** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু-লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্‌ই ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আন্‌জাযা ওয়াহ'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম আধিপত্য ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্যে। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সকল কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। তিনি একক ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও একাই শত্রু দলকে পরাজিত করেছেন।

তওয়াফের দোয়া সমূহ পড়া উত্তম

প্রথম চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুমা ঈমানামবিকা ওয়া-তাস্‌দীক্বাম-বিকালিমাতিকা ওয়া-ওয়াফায়াম বিআহ্‌দিকা ওয়া-ইত্তিবায়ান লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা ওয়া-হাবিবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম। আল্লাহুমা ইন্নি আস্‌আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল-আফিয়াতা ওয়াল-মুয়াফাতাদ-দায়েমাতা ফিদ্দীনি, ওয়াদ্দুনইয়া ওয়াল-আখিরাতা ওয়াল-ফাওজা বিল জান্নাতি ওয়ান-নাজাতা মিনান্নার।"

অর্থঃ " হে আল্লাহ! আমি আপনাকেই মা'বুদ স্বীকার করছি এবং আপনাকেই বরহক জেনেছি এবং আপনার কালেমাকে (কোরআন) সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্‌র অনুকরণ করি। হে আল্লাহ! দ্বীন দুনিয়া ও আখেরাতে আমি আপনার নিকট ক্ষমা, সুস্থতা, স্থায়ী রোগমুক্তি কামনা করি; আর আপনার নিকট জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।"

দ্বিতীয় চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না হাজাল বাইতা বাইতুকা ওয়াল-হারামা হারামুকা ওয়াল-আমনা আম্‌নুকা ওয়াল-আব্‌দা আবদুকা ওয়া-আনা আবদুকা ওয়া-ইব্‌নু আবদিকা ওয়া-হাজা মাক্বামুল এয়জিবিকা মিনান্নারী ফাহাররেম লুহুমানা ওয়া বাশারা তানা আলান্নার। আল্লাহুম্মা হাব্‌বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া-জায়্যেনহু ফী কুলুবিনা-ওয়া-কার-রিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল-ফুসুকা ওয়াল-ইস্‌ইয়ানা ওয়াজ-আল্‌না মিনার রাশেদীন।

www.pathagar.com

আল্লাহুম্মা ক্বেনী আজাবাকা ইয়াওমা তাব্আছু ইবাদাকা আল্লাহুম্মার ঝুকনাল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! এ ঘর আপনারই ঘর। এ হারাম শরীফ আপনারই হারাম শরীফ। আর নিরাপত্তা, আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তাই; আর বান্দাহ আপনারই বান্দা। আমিও আপনারই বান্দা এবং আপনার বান্দারই সন্তান। দোযখের আগুন হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাওয়ার এ-ই উত্তম স্থান। অতএব, আপনি আমাদের দেহের গোস্ত ও চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের প্রতি হারাম করে দিন। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট সাজিয়ে তুলুন। কুফরী, অবাধ্যতা ও অপরাধকে আমাদের অন্তরসমূহে ঘৃণার ব্যাপারে পরিণত করুন এবং আমাদেরকে সত্য পথের পথিকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! যে দিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে বিচারের জন্যে সমবেত করবেন, সেদিনের শাস্তি হতে আমাকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বিনা বিচারে জান্নাত দান করুন।"

তৃতীয় চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাশ্শাক্কি ওয়াশ্শিরকি ওয়াশ্শিক্কাক্কি ওয়াননিফাক্কে ওয়াসুয়েল আখলাকি ওয়াসুয়িল মান্জরি ওয়াল-মুনকালাবি ফিলমালি ওয়াল-আহলি ওয়াল ওআলাদি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা রেদাকা ওয়াল-জান্নাতা ওয়া-আইজুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্নারি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ফিত্নাতিল ক্বাবরি ওয়া-আউজুবিকা মিন ফাতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল-মামাত।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমার ঈমানের মধ্যে কখনো যেন শক-শোবা-সন্দেহ ও মুনাফেকী না আসে- সেজন্যে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি যেন কখনো সত্য বিষয়ে ঝগড়া-ঝাটি না করি। আমার স্বভাব-চরিত্র যেন খারাপ না হয়। বাড়ি ফিরে আমি যেন আমার ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তানাদির অবস্থা খারাপ না দেখি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও বেহেশ্ত চাই এবং আপনার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি চাই। হে আল্লাহ্! আমি কবরের জঞ্জাল, হায়াতের ও মওতের দুরুহ অবস্থা হতে আপনার আশ্রয় চাই।"

চতুর্থ চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুম্মাজ আলহু হাজ্জান মাবরুরাও অসা'ইয়ান মাশকুরান ওয়া-জাম্বান মাগফুরান ওয়া-আমালান সালিহান মাকবুলান ওয়া-তিজারাতান লান্তাবুর। ইয়া আলিমা মাফিস সুদুরি আখরিজ্নী ইয়া আল্লাহু মিনাজযুলুমাতি ইলাননূর। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা মাওজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া-আজায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াস্সালামাতা মিন কুল্লি এছ্মিও ওয়াল-গনিমাতা মিন কুল্লি বিররিউ ওয়াল-ফাওজা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নার। রাব্বি ক্বান্নিনী বিমা রাজাকতানী ওয়া-বারিকলী ফীমা আতাইতানী ওয়াখলুফ আলা কুল্লি গায়িবাতিল্লী মিনকা বিখায়রিন।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমার হজ্ব, সায়ী ও সৎ কাজকে কবুল করুন। আমার পাপরাশিকে ক্ষমা করুন। আমার ব্যবসাকে ক্ষতি থেকে বাঁচান। হে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্! আমার অন্তরের অন্ধকার দূর করে আলোকোজ্জ্বল করে দিন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে রহমত, ক্ষমা ও শান্তি-সুখ কামনা করি। আমাকে বেহেশ্ত দিন এবং দোজখ হতে নিস্তার

www.pathagar.com

দিন। হে আমার প্রতিপালক! আপনার দেয়া রিযিকে আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে বরকত দিন। আমার ত্রুটিগুলো আপনার কল্যাণ দিয়ে পূরণ করে দিন।"

৫ম চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুম্মা আযাল্লানী তাহ্তা যিল্লি আরশিকা ইয়াওমা লাযিল্লা ইল্লা যিল্লু আরশিকা অলা বাকী ইল্লা ওয়াজহুকা ওয়াসকিনী মিন হাওযি নাবিয়্যিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামা শারবাতান হ্যানিয়্যাতাম মারিয়াতান লা আজমা'য় বা'দাহা আবাদান। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা মিনখাইরিমা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আউজুবিকা মিনশাররি মা'সতাযাজাবিকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকাল জান্নাতা অনাঈমাহা অমা ইউক্কাররিবুনী ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওফি'লিন আও আমালিন ওয়ালা আউজুবিকা মিনান নারি অমাইউক্কারেবুনী ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আও ফি'লিন আও আমালিন।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ দিন আপনার আরশের নীচে ছায়া দান করুন যেদিন আপনার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। এবং আপনি ছাড়া কেউই টিকে থাকতে পারবে না। আমাকে আমাদের নেতা আপনার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাউজ হতে পান করান, যে পানি পান করার পর আর কখনো পিপাসা লাগবেনা। হে আল্লাহ্! আপনার নবী আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে যে সব কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছিলেন, সেগুলো আমিও আপনার কাছে চাই এবং যেসব অকল্যাণ হতে আপনার নবী আমাদের নেতা আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেইগুলো হতে আমিও আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে বেহেশ্ত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং যা আমাকে তার নিকটবর্তী করতে পারে এমন কথা, কাজ ও ব্যবহার প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে এমন কাজ, কথা ও ব্যাপার হতে আশ্রয় চাই যা আমাকে দোযখের নিকটবর্তী করতে পারে।"

৬ষ্ঠ চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না লাকা আলা হুকুকান কাচীরাতান ফিমা বাইনী ওয়া-বাইনাকা হুকুকান কাছিরাতান ফীমা বাইনী ওয়া-বাইনা খালক্কিকা। আল্লাহুম্মা মা-কানা লাকা মিনহা ফাগফিরহুলী ওয়ামা কানা লিখালকিকা ফাতাহাম্মালহু আন্নী ওয়া-আগ্নিনী বেহাললিকা আন হারামিকা ওয়া-বিতায়াতিকা আন মায়সিয়াতিকা অবিফাদ্লিকা আম্মান সেওয়াক। ইয়াসিয়াল মাগফিরাতি আল্লাহুম্মা ইন্না বায়তাকা আযিমুন ওয়া ওয়াজহাকা কারিমুন ওয়া-আন্তা ইয়া আল্লাহু হালীমুন কারীমুন আযীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমার ওপর আপনার অর্পিত অনেক দায়িত্ব আছে যা কেবল আপনার-আমার মাঝে সীমাবদ্ধ এবং আরো অনেক দায়-দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে যা আপনার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ্! আমার ওপর আপনার যে হক আছে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে আপনার সৃষ্টির হকগুলো আদায়ে দায়িত্ব নিন ও আপনার হালাল দিয়ে আপনার হারাম হতে আমাকে মুক্ত রাখুন। আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে আপনার নাফরমানী হতে বাঁচান। হে মহা

www.pathagar.com

ক্ষমাশীল! আপনার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে বাঁচান। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আপনার ঘর অতিশয় মর্যাদাময় এবং আপনি দয়ালু, ধৈর্যশীল ও মহান। আপনিত ক্ষমা পছন্দ করেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"

সপ্তম চক্করের দোয়া ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা ঈমানান কামিলান ওয়া ইয়াক্বীনান সাদিকান ওয়া-রিজকান ওয়াসিয়ান ওয়াক্বালবান খাশিয়ান ওয়া-লিসানান জাকিরান ওয়া-কাসবান হালালান তাইয়েবান ওয়া-তাওবাতান নাসুহান ওয়া-তাওবাতান ক্বাব্লাল মাওতি ওয়া-রাহাতান ইনদাল মাওতি ওয়া-মাগফিরাতান ওয়া-রাহমাতান বা'দাল মাওতি ওয়াল-আফওয়া ইনদাল হিসাবি ওয়াল্ফাওজা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নারি বিরাহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু রাব্বি ঝিদ্নী ইল্মাও ওয়াআলহিক্নী বিস্ সালেহীন।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ ঈমান, সঠিক বিশ্বাস, পর্যাপ্ত রিযিক, ভীত হৃদয়, যিকির লিপ্ত জিহ্বা, পবিত্র ও হালাল রোযগার, সত্যিকারের তওবা, মৃত্যুর পূর্বে তওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময়ে মার্জনা, বেহেশ্ত দ্বারা সাফল্য ও দোযখ হতে পরিত্রাণ চাই। হে মহাপরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল, আপনার দয়ায় আমার দোয়া কবুল করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন এবং সৎ কর্মশীলদের দলে আমাকে শামিল করুন।"

মাকামে ইবরাহীমের দোয়া ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তালামু সির্রী ওয়া আলানিয়াতী ফাক্বাল মাযিরাতী, ওয়া তালামু হাজাতী ফাতিনী সু'লী ওয়া তালামু মা ফী নাফ্সী ফাগ্ফির লী যুনূবী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ঈমানাই ইউবাশিরু কাল্বী ওয়া ইয়াক্বীনান্ সাদিকান্ হাত্তা আলামা আন্নাহু লা ইউসীবুনী ইল্লা মা কাতাব্তা লী ওয়া রিযাআম মিন্কা বিমা কাস্সামতা লী, আন্তা ওয়ালিয়্যী ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাহ্, তাওয়াফফানী মুসলিমাও ওয়া আল্হিক্নী বিস্সালিহীন। আল্লাহুম্মা লা তাদা' লানা ফী মাকামিনা হাযা-যাম্বান্ ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্রাজতাহু ওয়ালা হাজাতান্ ইল্লা কাদাইতাহা ওয়া ইয়াস্সারতাহা ফাইয়াস্সির উমূরানা ওয়াশ্রাহ্ সুদূরানা ওয়া নাক্বির কুলুবানা ওয়াখ্তিম্ বিস্সালিহাতি আমালিনা। আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্ফানা মুসলিমীনা ওয়া আল্হিক্না বিস্সালিহীনা গায়রা খাযায়া ওয়ালা মাফতূনীন, আমীন, ইয়া রাব্বাল। আলামীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা হাবীবিহী সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলিহী ওয়া আস্হাবিহী আজমাঈন।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। সুতরাং আমার অনুশোচনা গ্রহণ করুন! আপনি আমার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং আমার গোণাহসমূহ মাফ করুন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি এমন ঈমান যা আমার অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং এমন সাচ্চা ইয়াকীন যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। আমার জন্যে আপনি যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাই আমার জীবনে ঘটবে এবং আপনি যা আমার ভাগ্যে রেখেছেন তাতে যেন আমি রাযী থাকতে পারি। ইহ-পরকালে আপনিই আমার সহায়। আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিন এবং সৎকর্মশীলগণের সাথী করুন। হে আল্লাহ্! আমার কোন গোণাহই মাফ না করে, কোন দুশ্চিন্তাই দূর না

www.pathagar.com

করে, কোন অভাবই না মিটিয়ে ছাড়বেন না। হে আল্লাহ্! আমাদের সকল কাজ সহজ করে দিন। আমাদের অন্তরসমূহকে বিকশিত করুন। আমাদের আত্মাসমূহকে নূরানী করে দিন। নেক আমলের উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ্! মুসলমানরূপে যেন আমাদের মৃত্যু হয়। পুণ্যবানগণের দলে যেন আমরা শামিল হতে পারি। বিনা লাঞ্ছনায়, বিনা হিসাবে যেন আমরা পার হতে পারি। হে বিশ্বপালক! আমাদের দো'আ কবুল করুন।

মুলতাযিমের দোয়া ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল্ বাইতিল আতীক, আতিক্ রিকাবানা ওয়া রিকাবা আবাইনা ওয়া উম্মাহাতিনা ওয়া ইখ্ওয়ানিনা ওয়া আওলাদেনা মিনান্ নার, ইয়া যাল্জূদি ওয়াল্ কারামি ওয়াল ফাদলি ওয়াল মান্নি ওয়াল আতায়ি ওয়াল্ ইহ্সান। আল্লাহুম্মা আহসিন আকিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজির্না মিন্ খিয্য়িদ্ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আব্দুকা, ওয়াকিফুন্ তাহ্তা বাবিকা মুল্তাযামুন বিআতাবিকা মুতাযাল্লিলুন বাইনা ইয়াদাইক। আরজু রাহমাতাকা ওয়া আখ্শা আযাবাকা মিনান্ নারি ইয়া কাদীমাল্ ইহ্সান। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আন তারফা'আ যিক্রী ওয়া তা'দাআ বিযরী ওয়া তুসলিহা আম্রী ওয়া তুতাহ্হিরা কাল্বী ওয়া তুনাব্বিরা লী ফী কাব্রী ওয়া তাগফির লী যামবী ওয়া আসআলুকাদ দারাজাতিল 'উলা মিনাল জান্নাহ্, আমীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক! আমাদেরকে, আমাদের মাতাপিতাকে, আমাদের ভাই-বোনদেরকে, সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিন। হে দয়ালু দাতা, করুণাময়, মঙ্গলময়! হে আল্লাহ্! আমাদের সকল কর্মের শেষ ফল সুন্দর করে দিন। ইহকালের অপমান ও পরকালের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। হে আল্লাহ্! আমি আপনার বান্দা, আপনার আযাবের ভয়ে, আপনার করুণার আশায় আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। হে চির মঙ্গলময়! হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি চাচ্ছি যেন আমার যশ বৃদ্ধি পায়, আমার পাপের বোঝা লাঘব হয়, আমার কর্ম সঠিক হয়; গোণাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং বেহেশ্তে উচ্চ মর্যাদার আসন আপনার কাছে আমি চাচ্ছি। আমার দরখাস্ত কবুল করুন।

যমযমের পানি পান করার দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইল্মান নাফিআন ওয়া রিয্কান ওয়াসিআন ওয়া শিফাআম মিন্ কুল্লি দায়িন।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ফলপ্রসূ এল্ম, সচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

সায়ীর দোয়া সমূহ

প্রথম সা'য়ীর দোয়া ঃ আল্লাহু আকবারু কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সোবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহিল কারীমি বুকরাতাও ওয়া আসীলা, ওয়া মিনাল লাইলি ফাস্জুদ লাহু ওয়া সাবিহ্হু লাইলান তাবীলা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আন্জাযা ওয়াহ্দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু লা শাইয়া কাব্লাহু ওয়ালা বা'দাহু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন দায়েমুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খায়রু ওয়া ইলাইহিল মাসীর; ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন

www.pathagar.com

ক্বাদীর। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররামু ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকাল্লাহু তা'লামু মালা না'লামু, ইন্নাকা আন্তাল আআযযুল আকরাম। রাব্বি নাজ্জিনা মিনান্নারি সালিমীনা গানিমীনা ফারিহীন, মুসতাবশিরীনা মাআ ইবাদিকাস্ সালিহীনা মাআল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দিকীনা ওয়াশ্শুহাদাই ওয়াস্সালিহীন। ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীকান যালিকাল ফাদ্লু মিনাল্লাহি ওয়া কাফা বিল্লাহি আলীমা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্কান হাক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'আব্বুদাঁও ওয়া রিকান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।

অর্থঃ আল্লাহ্ অতি মহান। অগণিত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বয়ান করছি, দয়ালু আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তনের সাহায্যে সন্ধ্যা ও সকালে, (হে মানব) রাতের সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সেজ্দা কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর পবিত্রতা বয়ান কর। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। (অতীতে) তিনি সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ সঃ)-কে। তিনি একাই সাহায্য করেছেন আর পরাজিত করেছেন কাফেরদের দলগুলোকে। তিনি অনাদি, অনন্ত তিনিই জীবন দেন এবং নেন, তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। প্রভু! ক্ষমা করুন, দয়া করুন, গোনাহ্ মাফ করুন, অনুগ্রহ করুন, আর আপনি যা জানেন তা মার্জনা করুন, হে আল্লাহ্! আপনি সবই জানেন, যা আমরা জানি না তাও জানেন, আপনার শক্তি আর অনুগ্রহের তূলনা নেই। প্রভু! দোযখ হতে আমাদেরকে বাঁচান। নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখুন, আপনার নেক বান্দাদের সঙ্গে এবং আপনার নেয়ামতপ্রাপ্তগণ অর্থাৎ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বান্দাগণের সঙ্গে, তাঁরাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এটা কেবল আল্লাহ্রই অনুগ্রহ। আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বলছি, উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত বন্দেগী পাবার যোগ্য কেউ নেই (স্বীকার করছি); উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই। শুধু এবাদত করি তাঁরই, সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্যে, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।

দ্বিতীয় সা'য়ীর দোয়া ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্ সাহিবাতাওঁ ওয়া লা ওয়ালাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল্ মুলকি ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিউম মিনায্ যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায্যালি, উদউনী আস্তাজিব্ লাকুম। দাআওনাকা রাব্বানা, ফাগ্ফির লানা কামা ওয়াআদ্তানা, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াই ইয়ুনাদী লিলঈমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুম ফা-আ-মান্না। রাব্বানা ফাগ্ফির লীনা যুনূবানা ওয়া কাফ্ফির আন্না সাইয়্যেআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আব্রার। রাব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়াআদ্তানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্যিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগফির লানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিলঈমানি ওয়ালা তাজআল ফী কূলূবিনা গিল্লাল্ লিল্লাযীনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

www.pathagar.com

অর্থঃ উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, একক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ, যিনি (কাউকে) পত্নীও বাননি, পুত্রও বাননি, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর কোন দূর্বলতাও নেই যে, তাঁর জন্যে সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। (হে মানুষ!) তুমিও তাঁর মহত্ত্ব ভাল করে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ্! আপনার প্রেরিত কিতাবে আপনি বলেছেন, ডাক, আমি সাড়া দিব। আমরা আপনাকে ডাকছি, সুতরাং আমাদের গোনাহ্ মাফ করুন। আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শুনেছি, "তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন", তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গোনাহ্ মাফ করে দিন, আমাদের সব অন্যায়-অনাচার মোচন করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন সৎ লোকদের সঙ্গে, আর তাই আমাদেরকে দান করুন, যার ওয়াদা আপনি আপনার নবী-রসূলগণের নিকট করেছেন, আর আমাদেরকে কেয়ামতের দিনে লজ্জিত করবেন না; নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! শুধু আপনারই উপর ভরসা করছি, আর আপনারই নিকট থেকে এসেছি এবং আপনার নিকটই ফিরে যেতে হবে; সুতরাং হে প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন আর আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষ দিবেন না, যারা ঈমান এনেছে। প্রভু! আপনি সত্যই বড় দয়ালু।

তৃতীয় সা'য়ীর দোয়া ঃ রাব্বানা আত্মিম লানা নূরানা ওয়াগ্ফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল খাইরা কুল্লাহু আজিলাহু ওয়া আ-জিলাহু, ওয়া আউযু বিকা মিনাশ্ শাররি কুল্লিহী আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী, আন্ত াগফিরুকা লিযামবী ওয়া আস্আলুকা রাহমাতাক। আল্লাহুম্মা রাব্বি যিদ্নী ইল্মান ওয়া লা তুযিগ ক্বালবী বা'দা ইয্ হাদাইতানী ওয়া হাব্লী মিল্ লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব। আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাম্'ঈ ওয়া বাসারী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যা-লিমিন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফ্রি ওয়াল ফাক্র। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া বিমোআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিন্কা লা উহ্সী সানাআন আলাইকা আন্তা কামা আস্নাইতা আলা নাফ্সিকা ফালাকাল হামদু হাত্তা তারদা।

অর্থঃ প্রভু! আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ করুন আর ক্ষমা করুন আমাদেরকে, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান। হে দয়ালু! আপনার নিকট প্রার্থনা করছি সব রকম কল্যাণ, যা তাড়াতাড়ি আসে তাও, যা দেরীতে আসে তাও। আশ্রয় চাচ্ছি আপনারই সব রকম অকল্যাণ হতে, তা আশু লভ্য হোক কিংবা গৌনে লভ্য; মার্জনা চাচ্ছি আমার গোণাহের, আর ভিক্ষা চাচ্ছি আপনার রহমতের। হে আল্লাহ্! হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন, সত্য পথ দেখাবার পর বিভ্রান্ত করবেন না আমাদের অন্তরকে, আমাদেরকে আপনার খাস রহমত দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা। হে আল্লাহ! নির্দোষ করুন আমার কান আর চক্ষুকে, আপনি ব্যতীত উপাস্য আর কেউ নেই। হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার নিকট কবরের আযাব হতে, উপাস্য আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই। পবিত্র আপনার সত্ত্বা, নিশ্চয়ই আমি পাপী-তাপী। হে

www.pathagar.com

আল্লাহ্! আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি কুফর্ আর দারিদ্র্য হতে। আল্লাহ! আশ্রয় চাচ্ছি আপনার তুষ্টির দ্বারা আপনার রোষানল হতে, আপনার বকশিশের দ্বারা আপনার শাস্তি হতে আর আপনার নিকট থেকে আপনারই আশ্রয় চাচ্ছি। কুলিয়ে উঠতে পারি না আপনার প্রশংসা করে। আপনি ঠিক তেমনি, যেমনটি আপনি নিজে বর্ণনা করেছেন, সব প্রশংসাই আপনার, যতক্ষণ না আপনি খুশী হবেন।

চতুর্থ সা'য়ীর দোয়া ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ খায়রি মা তা'লামু ওয়াস্তাগ্ফিরুকা মিন কুল্লি মা তা'লামু ইন্নাকা আল্লামুল গুয়ুব। লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল মালিকুল হাক্কুল মুবীন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহিস্ সাদিকুল ও'য়াদিল আমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা কামা হাদাইতানী লিল্ইসলামি আল্লা তানযিআহু মিন্নী হাত্তাতাতাওয়াফ্ফানী আলাইহি ওয়া আনা মুসলিম। আল্লাহুম্মাজ্'আল ফী ক্বালবী নূরান ওয়া ফী সাময়ী নূরান ওয়া ফী বাসারী নূরা। আল্লাহুম্মাশ্রাহ্ লী সাদ্রী ওয়া ইয়াস্সির লী আমরী ওয়া আউযু বিকা মিন শার্রি ওয়াসায়েসিস্ সাদ্রি ওয়া শাতাতিল আম্রি ওয়া ফিত্নাতিল কাব্র। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা ইয়ালিজু ফিল্লাইলি ওয়া মিন শার্রি মা ইয়ালিজু ফিন্নাহারি ওয়া মিন শার্রি মা তাহুব্বুর রিয়াহ্ ইয়া আরহামার রাহিমীন। সোবহানাকা মা আবাদ্নাকা হাক্কা এবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ্! সোবহানাকা মা যাকার্নাকা হাক্কা যিক্রিকা ইয়া আল্লাহ্!

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনার নিকট চাচ্ছি সব জিনিসের মঙ্গল, যা আপনার জানা আছে। আর মাফ চাচ্ছি সব গোণাহ হতে যা আপনি জানেন, আপনিই তো কেবল গায়েব সম্পর্কে জানেন, কোন উপাস্য নেই আল্লাহ্ ব্যতীত-যিনি সবার সম্রাট, সত্য সুস্পষ্ট, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রসূল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ্! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছেন তেমনি আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিবেন না মরণ পর্যন্ত, আর মুসলিম হিসাবে মরণ যেন হয় আমার। আলো দিন আমার অন্তরে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে। হে আল্লাহ! উন্মুক্ত করে দিন আমার বক্ষ, সহজ করে দিন আমার কাজ, আর পানাহ চাচ্ছি আপনার নিকট মনের সন্দেহ বিকারের অনিষ্ট হতে, বিষয়কর্মের পেরেশানী হতে আর কবরের ফেত্না হতে। হে আল্লাহ্! আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি সেসব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা রাতে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি। হে আল্লাহ্! আপনি পাক-পবিত্র। ঠিক যেমন করে করা উচিত স্মরণ করিনি আপনাকে তেমন করে, হে আল্লাহ্।

পঞ্চম সা'য়ীর দোয়া ঃ সোবহানাকা মা শাকারনাকা হাক্কা শুকরিকা ইয়া আল্লাহ্! সোবহানাকা মা ক্বাসাদনাকা হাক্কা ক্বাসদিকা ইয়া আল্লাহ্! আল্লাহুম্মা হাব্বিব্ ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়্যেনহু ফি ক্বুলূবিনা ওয়া কার্রিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসুক্বা ওয়াল ইস্ইয়ান, ওয়াজ্আলনা মিন ইবাদিকাস সালিহীন। আল্লাহুম্মা ক্বিনা আযাবিকা ইয়াওমা তাব আসু ইবাদাকা, আল্লাহুম্মাহদিনী বিল্হুদা ওয়া নাক্কিনী বিত্তাকাওয়া ওয়াগফির্ লী ফিল আখিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহুম্মাব্সুত আলাইনা মিম্ বারাকাতিকা ওয়া

www.pathagar.com

রাহ্‌মাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া রিয্‌ক্বিক। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকান নাঈমাল্ মুকীমাল্লাযী লা ইয়াহ্‌লু ওয়ালা ইয়াযুলু আবাদা। আল্লাহুম্মাজআল ফী ক্বাল্‌বী নূরান, ওয়া ফী সাময়ী নূরান, ওয়া ফি বাছারি নূরান, ওয়া ফি লিসানি নূরান, ওয়া আন ইয়ামিনি নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান ওয়াজআল ফী নাফ্‌সী নূরাওঁ ওয়া আয্‌যিম লী নূরা। রাব্বিশরাহ্ লী সাদ্‌রী ওয়াস্‌সির্ লী আম্‌রী। ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়অতা মিন শাআইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল্ বাইতা আবিতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই ইয়াত্‌তাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়াআ খায়রান ফাইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি পাক-পবিত্র, আপনার শোকর আদায় তেমন করিনি যেমন করা উচিত। হে আল্লাহ্! আপনি পাক-পবিত্র, আপনাকে চাওয়ার মত চাইনি। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন আর আমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করে দিন এবং আমাদের নিকট কুফরকে, দুষ্কৃতি আর অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য করে দিন এবং আমাদেরকে আপনার নেক্‌কার বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনার আযাব হতে বাঁচান সেদিন, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে আবার উঠাবেন। হে আল্লাহ্! দেখান আমাকে সরল পথ, নিষ্পাপ করুন আমাকে তাক্‌ওয়ার সাহায্যে। আমাকে মাগফেরাত করুন দুনিয়া আখেরাতে। হে আল্লাহ্! আমাদের উপর আপনার বরকত, ফযল আর রিয্‌ক ছড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ্! আপনার নিকট সে নেয়ামত চাচ্ছি যা স্থায়ী হবে এবং কখনও হাতছাড়া কিংবা বিনাশ হবে না। হে আল্লাহ্! ছড়িয়ে দিন আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবণশক্তিকে, আমার দৃষ্টিশক্তিকে, আমার যবানকে, আমার সম্মুখ এবং উপরকে আপনার নূরের আলোকে আলোকিত করে দিন। হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দেন এবং কর্মসমূহকে সহজ করে দেন। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন। সুতরাং যে খানায়ে কা'বার হজ্ব করে কিংবা ওমরা করে, তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তওয়াফ (সায়ী) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠ সা'য়ীর দোয়া ঃ আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু সাদাকা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল হুদা ওয়াত্‌তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা, আলত্মাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযী নাকুলু ওয়া খাইরাম মিম্মা নাকুলু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান্‌নার; ওয়া মা ইয়ুকার্‌রিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আও ফিলিন আও আমালিন। আল্লাহুম্মা বিনূরিকা ইহ্‌তাদাইনা ওয়া বিফাদ্‌লিকাআসতায়ান্না ওয়া ফী কুন্‌ফিকা ওয়া ইন্‌আমিকা ওয়া আতাইকা ওয়া ইহ্‌সানিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া আমসাইনা, আন্‌তাল আউয়ালু ফালা ক্বাব্‌লাকা শাইয়ুন, ওয়াল আখিরু ফালা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়াযযাহিরু ফালা শাইয়ু, ফাওক্বাকা ওয়াল বাতিনু ফালা শাইয়ুন দূনাক। নাউযু বিকা মিনাল্ ফাল্‌সি ওয়াল কাসলি ওয়া আযাবিল কাবরি ওয়া ফিত্‌নাতিল গিনা

www.pathagar.com

ওয়া নাসআলুকাল ফাওযু বিলজান্নাহ। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররাম্ ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আআয্যুল আকরাম। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আই রিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবিতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই ইয়াত্তাওা ওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়াআ খাইরান ফা ইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর ওয়াদা চির সত্য। তিনি তাঁর বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করেছেন, কাফেরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই এবাদত করি, যদিও বিধর্মীগণ এই সত্য ধর্মকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাচ্ছি হেদায়াত, তাকওয়া, শান্তি এবং ঐশ্বর্য। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা- যা আমরা করি এবং যতটুকু আমরা করি, তা হতে তুমি অনেক উর্ধ্বে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি এবং বেহেশ্ত চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি আপনার ক্রোধ ও দোযখ হতে এবং যেসব কথা ও কার্যক্রম দোযখের নিকটবর্তী করে, ঐ সব কথা ও কার্যক্রম হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আপনার নূরের আলোকে আমাদেরকে আলোকিত করুন, আপনার রহমত দ্বারা আমাদেরকে পরিপূর্ণ করুন। আপনারই নেয়ামতসমূহ এবং এহ্সানের মধ্যে আমরা সকাল বিকাল অতিবাহিত করি। আপনি সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ। আপনার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং আপনার পরেও আর কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। আপনিই যাহের আপনিই বাতেন। আমরা আপনার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, কবরের আযাব এবং প্রাচূর্যের ফেত্না হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনার নিকট বেহেশ্ত লাভের সাফল্য কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, দয়া করুন এবং মেহেরবানী করুন। নিশ্চয়ই আমরা যা করছি সব আপনার জানা আছে। নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্, মহাসম্মানী। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং যে খানায়ে কা'বার হজ্ব করে কিংবা ওমরা করে, তার জন্যে এ নিদর্শন দু'টির তওয়াফ (সায়ী) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সপ্তম সা'য়ীর দোয়া ঃ আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইয়্যাল ঈমানা ওয়া যাইয়্যেন্হু ফী ক্বাল্বী ওয়া কার্রিহ্ ইলাইয়্যাল কুফ্রা ওয়াল ফুসূক্বা ওয়াল ইসইয়ান, ওয়াজআলনী মিনার রা-শিদীনা। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মালা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আযযুল আকরাম। আল্লাহুম্মাখ্তিম বিলখায়রাতি আজালানা ওয়া হাক্কিক বিফাদলিকা আ-মালানা ওয়া সাহ্হিল লিবুলুগি রিদাকা সুবুলানা ওয়া হাস্সিন ফী জামীইল আহ্ওয়ালি আ'মালিনা, ইয়া মুন্কিযাল গার্কা, ইয়া মুন্জিয়াল হাল্কা ইয়া শাহিদা কুল্লি নাজ্ওয়া, ইয়া মুনতাহা কুল্লি শাক্ওয়া, ইয়া ক্বাদীমুল ইহ্সানি ইয়া দায়িমাল্ মা'রূফ, ইয়া মান্ লা গিনান্ বিশাইয়িন আন্হু ওয়ালা বুদ্দা বিকুল্লি শাইয়িম মিন্হু, ইয়া মার রিয্কু কুল্লা

www.pathagar.com

শাইয়িন আলাইহি, ওয়া মাসীরু কুল্লি শাইয়িন ইলাইহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আয়িযুম্ বিকা মিন্ শার্‌রি মা 'আতাইতানা ওয়া মিন শার্‌রি মা মানা'তানা আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌ফানা মুস্‌লিমীনা ওয়া আলহিক্‌না বিস্‌সালিহীন, গাইরা খাযাইয়া ওয়ালা মাফ্‌তুনীন। রাব্বি ইয়াস্‌সির ওয়ালা তুআস্‌সির, রাব্বি আত্‌মিম্ বিলখাইর। ইন্নাস সাফা ওয়াল্ মার্‌ওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই ইয়াত্‌তাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান্ তাতাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে। হে আল্লাহ্! আমার মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিন। আমার অন্তরে একে সুষমামন্ডিত করুন। আমার অন্তর হতে কুফ্‌র, পাপাচার এবং গোনাহ্‌সমূহ দূর করুন এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, মেহেরবানী করুন এবং সম্মানিত করুন। আমাদের (গোনাহ্) সম্পর্কে যা আপনি জানেন তা ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি তা জানেন যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্, মহাপরাক্রমশালী মহাসম্মানী। হে আল্লাহ্! আমাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ও আমাদের আশা-আকাঙ্খাকে আপনার দয়ায় পূর্ণ করুন। আপনার সন্তুষ্টি লাভের পথ সহজ করে দিন এবং কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান করুন, হে ডুবন্তকে উদ্ধারকারী! হে ধ্বংস এবং মৃত্যু হতে রক্ষাকারী! হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী! হে ফরিয়াদকারীর শেষ আশ্রয়স্থল! হে অনাদি অনুগ্রহকারী! হে সর্বকালের মঙ্গলকারী! হে ঐ সত্বা-যাঁর দরজায় না যেয়ে কারো উপায় নেই! সমস্ত বস্তু তাঁরই নিকট হতে আসে। হে ঐ সত্বা-যাঁর উপর প্রতিটি প্রাণীর রিযিক নির্ভর করে! প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যা দান করেছেন এবং যা দান করেন সকল কিছুর অশুভ হতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান করেন নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মিলন করে দিন। হে আমার প্রতিপালক! আমার সব কর্মকে সহজ করে দিন এবং কিছুই কঠিন করবেন না। হে আমার প্রতিপালক! আমার কর্মকে সুসম্পন্ন করে দিন। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনস্বরূপ, সুতরাং যে খানায়ে কা'বার হজ্ব করে কিংবা ওমরা করে, তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তওয়াফ (সায়ী) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সফরের পূর্বরাতে

পবিত্র ওমরা উপলক্ষে যাত্রার পূর্বরাতে নিজেকে সঁপে দিলাম নিরালায় মালিক মনিবের দরবারে। এ গুণাহ্‌গারকে মালিক তাঁর খাছ দরবারে ডেকেছেন; এ-ত খুশীর কথা। কিন্তু ৫০/৫২ বছরের বেশুমার গুণাহ-খাতার কথা মনে করে দারুন পেরেশানি বোধ করলাম। মালিক কি এ গুণাহ্‌গারকে স্থান দেবেন, তাঁর পবিত্র ঘরের আঙ্গিনায়? তিনি কি তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় দেবেন? ক্ষমাপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান দেবেন? সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে তাঁর রঙ্গে রঙ্গীন করবেন? এ পর্যায়ে রাশি রাশি গুণাহ্‌র কথা স্মরনে আসতে লাগল। ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠলাম। শুধু মনে হল আল্লাহপাক রহমানির রহিম, গাফুরুর রাহিম। আরো মনে পড়ল, তিনি সকল

www.pathagar.com

অবস্থায় নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। ভরসা হল। তাঁর প্রিয় হাবিবের নামে দরূদ ও সালাম পেশ করে করজোড়ে তাঁর নিকট নিজেকে পেশ করে দিলাম। অতীতের সকল গুণাহ্‌র জন্যে লজ্জিত হলাম। ভবিষ্যতে তাঁর সকল রকম নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করলাম। আর দোয়া করতে থাকলাম ঃ

হে পরওয়ারদিগার, আপনি দয়া করে আমাকে আপনার ঘরে যাবার জন্যে ডাক দিয়েছেন; আপনি দয়া না করলে ওমরায় যাওয়ার চিন্তাও আমার মনে আসত না। হে আল্লাহ, আমার নিয়তকে সহিশুদ্ধ করে দিন এবং ভালভাবে ওমরাহ সম্পাদনের কাজ আমার জন্যে সহজ করে দিন। হে আল্লাহ, আমি যে সব পরিবার, পরিজন, সন্তানাদি রেখে যাচ্ছি, তাদের আপনি হেফাজত করুন।

হে প্রতিপালক, আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যান দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচান। হে আল্লাহ, আপনার ক্ষমার দরজা আমার জন্যে সব সময় খোলা রাখুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে মঙ্গল দান করুন এবং আপনার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দিন, যেদিন আপনার আরশের ছায়া ব্যাতীত আর কোন ছায়া থাকবেনা এবং আপনি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না।

হে প্রভু, আপনার নিকট প্রার্থনা, আমাকে কামেল ও অটল ঈমান দান করুন যা হবে স্থায়ী আর যার ফলে আপনি আমার অন্তরে গেঁথে যাবেন, আমাকে সত্য ইয়াকীন দিন যেন আমি নিশ্চিন্তরূপে বুঝতে পারি যে, শুধু তাই আমি পাব, যা আপনি আমার ভাগ্যে লিখেছেন।

হে মহামহিম, আমাকে দিন উপকারী জ্ঞান, তাকওয়াপূর্ণ অন্তর, আপনাকে স্মরণকারী জিহ্বা, নেক্‌কার সন্তান, স্বচ্ছল জীবিকা যা হালাল আর পবিত্র। আর নসীব করুন তওবা, উত্তম ধৈর্য। বের করুন আমাকে আর সকল মুসলমানকে আঁধার থেকে আলোর দিকে।

হে আল্লাহ, আমি যেন ইসলামের প্রতি কখনও সন্দেহ পোষন না করি, কখনো যেন শিরক না করি, চরিত্র যেন নষ্ট না করি। আমার ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির বরবাদী থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ, আপনার দেয়া রুজিতে আমাকে তৃপ্তি দিন। বরকত দিন আমাকে দেয়া আপনার নিয়ামতে। আমার সকল অপূর্ণতাকে আপনার মঙ্গল দ্বারা পূর্ণ করে দিন।

হে আল্লাহ, আপনি অতিশয় দয়ালু, সহনশীল ও মহান। আপনিত ক্ষমা পছন্দ করেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিনে আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, ভাইদেরকে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, দাদা-দাদী, নানা-নানীকে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, ফুফা-ফুফু, খালা ও খালু সহ সকল আত্মীয় এবং সকল মুসলমান নর-নারীকে ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ, দুনিয়ার জীবনে আমাকে এমন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজন দান করুন যাদের আমল-আখলাক দর্শনে আমার চোখ জুড়ে যায়।

হে আল্লাহ, বড় আশায় বুক বেঁধে আছি। আপনি বলেছেন যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তারা যেন আপনার রহমত থেকে নিরাশ না হয়। আমি আপনার

www.pathagar.com

রহমত থেকে নিরাশ হইনি। আপনার নিজ গুনে অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে আপনার পরহেজগার, মুত্তাকী, করুণা ও ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দাহদের সাথে শামিল করুন এবং নেক কাজ করার তৌফিক দিন। আপনি তৌফিক না দিলে আমরা গুণাহ থেকে বাঁচতে পারব না।

আমার সফরের সামান সমূহ

২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, ১৯৯৯ ইং। বেলা ১২-৩০ টায় ফ্লাইট। ফজরের পর রাতের মতই আল্লাহ পাকের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনায় রত হই। জ্যেষ্ঠ মেয়ে মুনিরাকে ডেকে বন্ধু-বান্ধবকে, আত্মীয়ের নিকট দেনা-পাওনার একটি তালিকা প্রদান করি এবং ব্যাংক ব্যালেন্স কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার বিবরণসহ স্বাক্ষর করা দুটি চেক বিবিকে বুঝিয়ে দেই। এর পর মুনিরাকে ডেকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলো একটি তালিকাসহ আমাকে গুছিয়ে দেয়ার জন্যে বলি ঃ

১. পাসপোর্ট	
২. টিকেট	
৩. প্রয়োজনীয় ডলার	
৪. পায়জামা পাঞ্জাবী	ঃ ৩ সেট
৫. ইহরামের কাপড়	ঃ পরনের দুটি গায়ের ১টি
৬. গামছা	ঃ ১টি
৭. লুঙ্গি	ঃ ২টি
৮. গায়ের চাদর	ঃ ১টি
৯. গেঞ্জি	ঃ ২টি
১০. জাঙ্গিয়া	ঃ ২টি
১১. মোজা	ঃ ২ জোড়া
১২. টুপি	ঃ ২টি
১৩. হাজির বেল্ট	ঃ ১টি
১৪. সেন্ডেল	ঃ ১ জোড়া
১৫. চশমা	ঃ ১ জোড়া
১৬. প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের ফাইল	ঃ ১টি
১৭. পাসপোর্ট-ডলার রাখার জন্যে কাপড়ের থলে	ঃ ১টি
১৮. হজ্বের মাসআলার বই	ঃ ১টি
১৯. নিজের লিখিত ও প্রকাশিত "হজ্বের ডায়েরী থেকে" বই	ঃ ১২ টি
২০. রেজার বক্স	ঃ ১টি
২১. ব্লেড	ঃ ২টি
২২. টুথ পেষ্ট, ব্রাশ	
২৩. টয়লেট পেপার	ঃ ১ প্যাকেট
২৪. নাইলনের দড়ি	

www.pathagar.com

২৫. আয়না, চিরুনী
২৬. পানির ফ্লাস্ক
২৭. সাবান
২৮. সরিষার তেল
২৯. ব্যাগ মোট ৩টি (১টি হাত ব্যাগসহ)
৩০. প্লেট ঃ ১টি
৩১. গ্লাস ঃ ১টি
৩২. কাঁচি ঃ ১টি
৩৩. প্রয়োজনীয় ঔষধ
৩৪. খিলাল করার কাঠি ঃ ১ কৌটা
৩৫. ছুরি ঃ ১টি
৩৬. ব্যাগের তালা চাবি
৩৭. টেবিল ঘড়ি (এলার্ম যুক্ত) ঃ ১টি
৩৮. রুমাল ঃ ১টি
৩৯. রবারের বালিশ ঃ ১টি

নিশ্চিত মনে ওমরা উপলক্ষে সফরের জন্যে উপরোক্ত পাথেয় জরুরী। আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেনঃ "অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করবে, কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হল তাক্ওয়া।"**এ সম্পর্কিত হাদিস ঃ**

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "ইয়েমেন দেশের লোকেরা হজ্ব করতে আসত; কিন্তু সম্বল গ্রহন করত না। তারা বলত, আমরা তাওয়াক্কুলকারী লোক। তারা যখন মদীনায় উপস্থিত হত, তখন লোকদের নিকট ভিক্ষা চেয়ে বেড়াত।" তখন আল্লাহ পাক নাযিল করলেনঃ 'তোমরা অবশ্যই পাথেয় গ্রহণ করবে। বস্তুতঃ সর্বোত্তম পাথেয় হল তাক্ওয়া' (বুখারী,আবু দাউদ, নাসায়ী)।

ইতিমধ্যে সফর সঙ্গী শহীদুল্লাহ সাহেব ও তাঁর ছেলের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করি এবং তাঁদেরকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ী পাঠিয়ে দেই।

সফরের জাগ মুহূর্তে

যাত্রার সময় প্রায় সমাগত। সফর সঙ্গীগণ এসে পড়বেন কিছুক্ষনের মধ্যে। ফ্লাইট দুপুর ১২ঃ০০ টায়। তিন ঘন্টা পূর্বে এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে হবে। তবে আমরা সকাল ৯ঃ৩০ টায় রওয়ানা করার সিদ্ধান্ত নেই। ইহরাম বাসা থেকেই বেঁধে যাওয়ার এরাদা করি। সিদ্ধান্ত হয় যে, শহীদুল্লাহ সাহেব এবং তাঁর ছেলে আমাদের বাসায় এসে ইহরামের কাপড় পরবেন এবং আমি তাঁদেরকে কাপড় পরতে সহযোগীতা করব। তাঁদের আগমনের পূর্বেই আমি নিজে ইহরামের কাপড় পরার এবং নফল নামাজ পড়ে বিবি বাচ্চাদের নিয়ে দোয়া পরিচালনা করার মনস্থ করি।

সিদ্ধান্তমতে অজু গোসল করে নিলাম। ইতিপূর্বে নখ এবং অবাঞ্ছিত পশম ইত্যাদিও কেটে নিলাম। এর পর সুগন্ধি আতর মেখে নিয়ে ইহরামের কাপড় পরে নিলাম। অতঃপর দুই রাকাত নফল নামাজ শেষে 'লাব্বাইকা ওমরাতান' বলে ওমরার নিয়ত করলাম এবং কয়েকবার তালবিয়া পড়লাম।

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে বিবি বাচ্চাদের কাছাকাছি বসালাম। তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দি করার অসিয়ত করলাম। আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও তারিফ আদায় করে সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে তাঁর রহমত ও দয়া প্রার্থনা করলাম এভাবে ঃ

হে দয়ালু মেহেরবান আল্লাহ, শেষ বিচার দিনের মালিক, আমরা আপনারই বন্দেগী করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য কামনা করছি। আমাদেরকে সঠিক সোজা পথে পরিচালিত করুন, তাদের পথে যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নহে, যাদেরকে আপনি পথভ্রষ্ট করেছেন।

হে আল্লাহ, ইহকাল ও পরকালে আমাদের জন্যে উত্তম ব্যবস্থা দান করুন এবং দোজখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ, বালামুছিবতে আমাদের ধৈর্য ধারনের শক্তি দিন, যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে, আর কাফেরদের উপর আমাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ, জানা অজানাকৃত ভুলত্রুটিতে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভুলের বোঝাস্বরূপ বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না।

হে আল্লাহ্‌, আমাদের সাধ্যের অতীত বোঝা আমাদের চাপিয়ে দিবেন না।

হে আল্লাহ, হেদায়েত দানের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিবেন না। আর আমাদেরকে দান করুন আপনার করুণাধারা। কেননা, আপনিই শ্রেষ্ঠদানকারী।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না। আপনার প্রিয় হাবিব এবং কোটি কোটি বান্দার নিকট আখেরাতে লজ্জা দিবেন না। আমাদের হিসাব সহজ করুন। বিনা হিসাবে আমাদেরকে হাশর, নশর, পুলসিরাত এবং মিযান পার করে নিন।

হে আল্লাহ, আপনি রাহমানির রহিম, আপনি গাফুরুর রাহিম। আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনার রহমতের কোলে আমাদের আশ্রয় দিন। বস্তুতঃ আপনার রহমতের কারনেইত বেঁচে আছি। কেয়ামতের কঠিন দিনে আপনার রহমতের এবং আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিন। আপনি আমাদের ওলী হয়ে যান।

হে আল্লাহ, আপনি রুটি রুজির মালিক। আমাদেরকে উত্তম রিযিক দিন। রুজিতে বরকত দিন।

হে আল্লাহ, আমাদের নেক হায়াত দিন। আমাদেরকে দ্বীনী এলেম দিন। আমল আখলাক সুন্দর করুন। আপনার নাফরমানি থেকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ, যেসব আত্মীয় স্বজন আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে চিরতরে চলে গেছেন তাঁদের প্রতি রহম করুন। তাঁদের কবরে কোন আযাব ও গজব থাকলে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। তাঁদের কবরকে বেহেশতের বাগিচা বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আপনি আমার মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-খালু, ফুফা-ফুফু, শ্বশুর, মায়ের পক্ষের বাপের পক্ষের, শ্বশুরের পক্ষের সবাইকে মাফ করুন।

হে আল্লাহ, বিবি-বাচ্চা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে আপনার হাওলায় রেখে যাচ্ছি। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তাদের জান মালের হেফাজত করুন। দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ ও জিল্লতি থেকে তাঁদের রক্ষা করুন। দুনিয়া আখেরাতে

www.pathagar.com

তাদের সম্মান ও ইজ্জত দিন। আপনার খাঁটি বান্দাহ্-বান্দী করুন। নবী পাকের (সঃ) খাঁটি উম্মত করুন।

হে আল্লাহ, সকল মোমেন-মোমেনার প্রতি রহম করুন। মজলুম মুসলমানদের প্রতি আপনার গায়েবী মদদ দান করুন। হে আল্লাহ্, আপনি আমাদের দোয়া কবুল করুন।

এভাবে আল্লাহ পাকের নিকট আবেদন নিবেদনের পর বিবি-বাচ্চার সাথে মোলাকাত-মুসাফাহা করে যাত্রার জন্যে তৈরী হলাম।

ইতিমধ্যে শহিদুল্লাহ সাহেব এবং তাঁর ছেলে জিল্লুর এসে পড়েছেন। জায়নামাজ বিছিয়ে তাঁদেরকে এক এক করে ইহরামের কাপড় পরতে সহযোগীতা করলাম। আমার পরামর্শমত তাঁরা দু'রাকাত করে নফল নামাজ পড়লেন এবং "লাব্বাইকা ওমরাতান" বলে ওমরার নিয়ত করলেন। এর পর তিনবার তালবিয়া পড়লেন।

সফর শুরু

আমরা এবার যাত্রার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ছেলেরা গাড়ীতে আমাদের মালামাল তুলে দিল। শেষবারের মত আবার বিবি বাচ্চাদের সাথে মোলাকাত শেষে বিদায় নিলাম এবং পড়ে নিলাম ঃ "বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম"।

অর্থঃ "আল্লাহ্‌র নামে তাঁরই ওপর ভরসা করে বের হচ্ছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ থেকেও বিরত থাকা যায় না।"

সফরের নিরাপত্তার জন্যে, সফরে উত্তম আমলের তৌফিক চেয়ে, জান-মালের নিরাপত্তার জন্যে, সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্যে, মকবুল ওমরা এবং নবী পাকের (সঃ) জিয়ারত নসীব করার তৌফিক চেয়ে আল্লাহপাকের কাছে মিনতি করে গাড়ীতে পা রাখলাম।

পরিজনদের উদ্দেশ্যে পড়লাম ঃ

"আছতাউদিল্লাহা দ্বীনাকুম ওয়া আমানাতাকুম ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকুম।"

অর্থঃ আমি তোমাদের দ্বীন ও ঈমান এবং যাবতীয় আমলের পরিনাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।

সকাল ৯ঃ৩০ টায় এয়ার পোর্টের উদ্দেশ্যে আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিল।

পড়ে নিলামঃ "সোবহানাল্লাজী সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরেনীন।"

অর্থঃ "অতি পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই সমস্ত জিনিসকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, অথচ এই সব আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।"

পড়তে থাকলাম ঃ লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক------ আমি হাযির -------।

কয়েক ফোটা অশ্রু গন্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

এ যাত্রায় আমাদের সাথে একটি ক্যামেরা ছিল, পথে ক্যামেরার জন্যে একটি ফিল্ম কিনে নিলাম। 'ওমরার' ওপর একটি সচিত্র বই লিখব এবং নিজের তোলা প্রয়োজনীয় ছবি এতে সন্নিবেশিত করব এ উদ্দেশ্যেই ক্যামেরাটি সাথে নেয়ার পরিকল্পনা করলাম।

যথাসময়ে আমাদেরকে বহণ করে গাড়ী এয়ারপোর্ট পৌছল। ড্রাইভার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এয়ার পোর্টে প্রবেশ করলাম। এখানে বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ, লাগেজ বুকিং এবং চেকিং ইত্যাদি কাজ শেষে আমরা যাত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা

www.pathagar.com

করতে থাকলাম। বিমানে ওঠার ঘোষনার অপেক্ষায় বসে বসে তালবিয়া পড়তে থাকলাম।

আমাদের বিমান ছেড়ে দিল

বেলা ১২৪৩০ টায় সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স এর বিমানে ওঠার জন্যে ডাক এল। আমরা যথারীতি বিমানে উঠলাম। ১২ঃ৪৫ টায় বিমান ছেড়ে দিল। পড়ে নিলাম ঃ "সোবাহানাল্লাজী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরেনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা-মুনকালিবুন।"

বিমানে বসে বেশী বেশী তালবিয়া পড়তে চেষ্টা করেছি। বলেছিঃ "আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নেই আপনার, আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই, আর সকল সাম্রাজ্যও আপনার, আপনার কোন শরীক নেই।"

তালবিয়া যত পড়েছি ততই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছি। কত সৌভাগ্য যে, মহাপ্রভু আমার মত এক দীনহীন ব্যক্তিকে তাঁর খাছ দরবারে ডেকেছেন। তাঁর নিদর্শন দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধির এটি একটা সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি ভেবে শঙ্কিত হলাম যে, কা'বার মালিক কি আমার প্রতি রাজী খুশী হবেন? তিনি কি তাঁর রহমতের কোলে আমায় আশ্রয় দেবেন? আমার আকাশ চুম্বী পাপ রাশির কথা স্মরণ করে মাথা হেট হয়ে এল। বার বার এস্তেগফার পড়তে থাকলাম। অতীত কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হলাম, ক্ষমা চাইলাম। ভবিষ্যতে মালিক মনিবের নির্দেশিত এবং তাঁর হাবিবের (সঃ) প্রদর্শিত পথে চলার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত বোধ করলাম। মহাপ্রভুর আশ্বাস বাণী "আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না" এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি খুঁজে পেলাম। কা'বার মালিক মনিব তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে মেহমানকে নিরাশ করবেন না-এ ভরসা অনুভব করে পরিতৃপ্তি বোধ করলাম। মনের এহেন অবস্থায় মক্কা শহর ও খানায়ে কা'বার ইতিবৃত্ত মনের পর্দায় ধারাবাহিকভাবে ভেসে উঠতে থাকল।

মক্কা মোয়াজ্জমার মধ্যমণি খানায়ে কা'বা / কা'বা দুনিয়ার প্রথম ঘর

মক্কার ঐতিহ্য, সৌন্দর্য ও কৃষ্টি-কালচারের মধ্যমনি হচ্ছে 'বায়তুল্লাহ শরীফ' যাকে বাদ দিলে মক্কার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বায়তুল্লাহ শরীফের অন্যান্য নাম হচ্ছে- কা'বা শরীফ, আল-বিনইয়াহ্ ইবরাহীম।

মূলতঃ মক্কা নগরের উৎপত্তি খানায়ে কা'বাকে কেন্দ্র করে। আরবরা মক্কাকে "বাক্কা বলতো। মীম এর পরিবর্তে বা। মক্কা হচ্ছে সেই নগরের নাম - যে নগরে কা'বা অবস্থিত। তাকে "বাক্কা" বলা হয়েছে এ জন্যে যে, তা সকল অন্যায় ও যুলুমকে প্রতিরোধ করে।

সায়ীদ ইব্নে জুবাইর বলেছেন ঃ "মক্কাকে 'বাক্কা' নাম দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, মানুষ ওখানে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে, কা'বার তওয়াফে ভিড় করে।" মুহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকের, মুজাহিদ ও কাতাদাহ ও এ কথাই বলেছেন।

www.pathagar.com

কা'বা ঘর দুনিয়ার বুকে প্রথম ঘর। এ ঘর নির্মানের পূর্বে বিশ্বে আর কোন ঘর কিংবা নির্মাণ বসতি ছিলনা। মুজাহিদ বলেন, "আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর বুকে কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই সর্ব প্রথম এই ঘর নির্মাণ করেন।" অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, "আল্লাহ তায়ালা কা'বার স্থানটিকে দুনিয়ার কোন কিছু সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন।" হুসাইন ইবনে আলীর (রাঃ) পুত্র আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরশের নিম্নে একটি ঘর স্থাপন করেছেন, তাকে বলা হয় 'বায়তুল মামুর'। তিনি ফেরেশতাদের সেই ঘরের তওয়াফ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর পৃথিবীর বুকে অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করার আদেশ করেন। তদনুসারে ফেরেশতাগণই কা'বা ঘর প্রথম নির্মাণ করেন। এরপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ ঘর তওয়াফ করার নির্দেশ দেন। তখনও দুনিয়ায় মানুষের আগমণ ঘটেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, কা'বাই হচ্ছে সেই প্রথম ঘর, যা আদম (আঃ) দুনিয়ার বুকে নির্মাণ করেছিলেন। আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে আগমণ করেন, তখন একাকীত্বের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। আল্লাহ পাকের নিকট অনুযোগ করলে আল্লাহপাক তাঁকে এ ঘর তওয়াফের আদেশ দান করেন। নূহ (আঃ) এর সময় প্লাবন হলে আল্লাহ সে ঘরটি আসমানে তুলে নেন, কিন্তু ঘরের স্থানটি সুরক্ষিত থাকে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) সময় পর্যন্ত। তখন আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) নতুন করে কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

"স্মরণ কর, ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) যখন কা'বা ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তখন উভয়ই দোয়া করেছিল এই বলেঃ হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ কাজকে ক'বুল কর। তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুন, সব কিছু জান। হে আমাদের রব, আমাদের উভয়কেই তোমার অনুগত বান্দা বানাও। আমাদের বংশের লোকদের থেকেও তোমার অনুগত এক উম্মত গড়ে তোল। আর আমাদেরকে তোমার ইবাদতের নিয়মাবলী জানিয়ে দাও এবং আমাদের গুণাহখাতা মাফ কর। তুমিইতো তওবা কবুল করো - অতি দয়াবান। হে আমাদের মাবুদ! আমাদের বংশের লোকদের মধ্য থেকে এমন

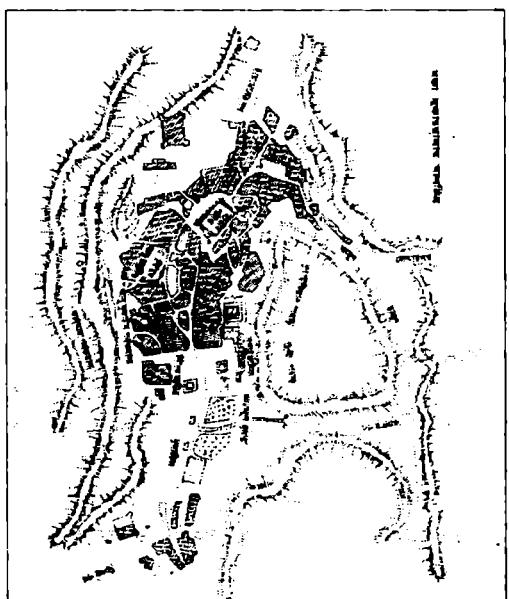

মক্কা শহরের মানচিত্র

www.pathagar.com

একজন রসূল প্রেরণ কর, যে লোকদেরকে তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে গড়ে তুলবে। তুমি নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, সর্বজয়ী ও মহা বিজ্ঞানী।" (বাকারা-১২৭, ১২৮,১২৯)।

নবী পাক (সঃ) এর আগমণ ও আবির্ভাব ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাইলের (আঃ) দোয়ার ফলশ্রুতি। রসূলে করিম (সঃ) নিজেই বলেছেন, "আমি ইবরাহীমের (আঃ) দোয়ার ফল।"

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক কা'বা নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর এর মর্যাদা উল্লেখ করে আল্লাহ পাক ঘোষনা করেনঃ "স্মরণ কর, আমরা যখন এই কা'বা ঘরকে জনগণের জন্যে মিলন কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান রূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম, তখন লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" (বাকারা-১৬৫)।

আল্লাহপাক আরো বলেন ঃ "এবং ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে তাকীদ করেছিলাম যে তওয়াফ - ইহতিকাফ ও রুকু-সিজদাকারী লোকদের জন্যে আমার এই ঘরকে তোমরা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে রাখো।" (বাকারা)

কোরআন / হাদীসের পাতা থেকে মক্কা শহর ও খানায়ে কা'বার ইতিহাস

পবিত্র ও বরকতময় মক্কা শহরের গোড়া পত্তন এবং কা'বা ঘর সম্পর্কে বুখারী শরীফের কিতাবুল আম্বিয়া অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নিম্মোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য ঃ

নারী জাতি সর্বপ্রথম হযরত ইসমাইল (আঃ) এর মা (হাজার) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজার সারা থেকে নিজ নিদর্শণাবলী গোপণ করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ বা কোমরে রশি বাঁধতেন। তারপর (হাজারকে নিয়ে সারা ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে মনোমালিন্য করায়) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হাজার ও তাঁর শিশু পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসন দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হলেন। পথে হাজার শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উভয়কে নিয়ে কাবাঘরের কাছে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদে হারামের উঁচু দিকে যমযম কূপের উপর একটি বড় গাছের নীচে তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় কোন লোকজন ছিল না এবং পানিও ছিল না। তিনি তাঁদেরকে সেখানে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে অল্প পানি দিয়ে গেলেন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (নিজ অবস্থানের দিকে) ফিরে চললেন। ইসমাইলের মা (হাজার) তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং (কাফা নামক স্থানে পৌঁছে) ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহীম কোথায় চলে যাচ্ছেন? অথচ আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, আর না আছে (পানাহারের) কোন বস্তু। তিনি বার বার তা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) সে দিকে ফিরে তাকালেন না। তখন হাজার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ কি আপনাকে এই (নির্বাসনের) নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। জবাব শুনে হাজার বললেন ঃ তাহলে (ঠিক আছে) আল্লাহ

www.pathagar.com

আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও (পেছনে না তাকিয়ে) সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌছলেন এবং স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ

হে আমাদের রব, তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এমন এক উপত্যকায় আমার সন্তান ও পরিবারের বসতি স্থাপন করেছি যা কৃষির অনুপযোগী। হে রব, উদ্দেশ্য এই, তারা নামায কায়েম করবে। অতএব তুমি অন্যান্য লোকের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করে দাও; যাতে করে তারা (তোমার নিয়ামতের) শুকরিয়া আদায় করতে পারে।"

তারপর ইসমাইলের মা, ইসমাইলকে (নিজের বুকের) দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। (ঐ পানি পান করার সাথে সাথে শিশু পুত্রের জন্যে তাঁর দুধে জোয়ার আসত)। শেষ পর্যন্ত মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও পিপাসায় কাতর হলেন এবং (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু পুত্রটিও পিপাসায় ছটপট করতে থাকে। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন যে, পিপাসায় শিশুর বুক ধড়পড় করছে কিংবা বলেছেন, সে যমীনে ছটপট করছে। শিশুপুত্রের এই করুণ অবস্থার দিকে তাকানো তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর কাছে সাফা পাহাড়কেই একমাত্র নিকটতম পাহাড় হিসেবে পেলেন। তারপর তিনি এর উপর উঠলেন এবং ময়দানের দিকে মুখ করলেন। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু না, তিনি কাউকে দেখলেন না। তখন তাড়াতাড়ি সাফা পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নীচে ময়দানে নামলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন ক্লান্ত ব্যক্তির মত দৌড়ে চললেন। তারপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা। (লোকের খোঁজে) তিনি (পাহাড় দু'টির মধ্যে) এভাবে ৭ বার দৌড়া দৌড়ি করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে নবী করিম (সঃ) বলেছেন, এ জন্যেই (হজ্বের সময়) মানুষ এই পাহাড় দু'টির মধ্যে ৭ বার সায়ী করে (জোরে হাঁটে) এবং এটা হজ্বের একটি অংগ।

তারপর হাজার যখন (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজে নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর, (মনোযোগ দিয়ে শুনি)। তিনি মনোযোগের সাথে ঐ আওয়াজের দিকে কান দিলেন। আবারও আওয়াজ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজতো শুনিয়েছ। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে, তাহলে আমাকে সাহায্য কর। হঠাৎ তিনি যমযমের জায়গায় একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালী দ্বারা আঘাত করলেন কিংবা 'তিনি বলেছেন', আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগল। হযরত হাজার, এর চারপার্শ্বে আপন হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে কূপের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হযরত হাজার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উথলে উঠতে লাগল।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইসমাইলের মাকে রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে রাখতেন, কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবাহমান ঝর্ণা ধারায় পরিণত হত।

বর্ণনাকারী বললেন, তারপর হযরত হাজার পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন ভয় করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার বাপের সাথে মিলে এই ঘরটি পূনঃনির্মাণ করবে। আল্লাহ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। তখন আল্লাহর ঘরের ভিটিটি যমীন থেকে বেশ উঁচু ছিল। বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট বন্যায় এর ডানে-বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

হযরত হাজার এভাবেই দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইয়েমেনের জোরহাম গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন, কিংবা, তিনি বলেছেন, জোরহাম গোত্রের কিছু লোক কাবার পথে (এদিকে) আসছিলেন। তাঁরা মক্কার নীচু দিকে অবতরণ করলেন। তারা দেখলেন যে, কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই এই পাখীগুলো পানির উপরেই ঘুরছে। অথচ আমরা ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি, কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তার পর তাঁরা একজন বা দু'জন লোক সেখানে পাঠালেন। তাঁরা গিয়েই পানি দেখতে পেলেন। তাঁরা ফিরে এসে অপেক্ষমান সবাইকে পানির খবর দিলেন। খবর শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাইলের মা পানির কাছে বসা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ' বলে রাজী হলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, এ ঘটনা ইসমাইলের মায়ের জন্যে এক সূবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। তারপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল; তারাও এসে এদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি বংশ জন্ম নিল। ইসমাইলও আস্তে আস্তে বড় হলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাদের ভাষা আরবী শিখলেন। যুবক হওয়ার পর তিনি তাদের কাছে অধিকতর প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর তারা তাদেরই এক মেয়েকে তাঁর কাছে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর ইসমাইলের মা হাজার ইন্তেকাল করেন।

ইসমাইলের বিয়ের পর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখার জন্যে মক্কায় আসেন। কিন্তু এসে ইসমাইলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বললেন, তিনি আমাদের খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্য বেরিয়ে গেছেন। পরে তিনি পুত্রবধূকে তাদের সংসার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধূ বললেন, আমাদের খুবই দূরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টে আছি। তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কাছে তাঁদের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তিনি পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী ঘরে ফিরে আসলে তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যেন তার ঘরের চৌকাঠটি বদলিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

ইসমাইল (আঃ) যখন ঘরে আসলেন, তখন তিনি যেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আগমন সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এমন আকৃতির একজন বুড়ো লোক এসেছিলেন এবং আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর জানিয়েছি। তিনি আবার আমাকে আমাদের সংসার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমরা বেশ দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাইল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন অসীয়ত করে গেছেন? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন যেন আমি আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং বলি যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে নেন। ইসমাইল (আঃ) বললেন, উনি আমার আব্বা। ঐ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেন তোমাকে আমি পৃথক করে দেই, অর্থাৎ তালাক দেই। সুতরাং তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে আপন লোকদের কাছে চলে যাও। এই বলে ইসমাইল (আঃ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ বংশের অপর আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। তারপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, ইবরাহীম (আঃ) ততদিন তাঁদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার এদেরকে দেখতে আসলেন। কিন্তু ইসমাইল (আঃ) কে পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর ঘরে ঢুকলেন এবং ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাঁর কাছে তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। পুত্রবধূ জবাব দিলেন, আমরা ভাল আছি ও সুখে আছি এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাবার কি? পত্রবধূ জবাবে বললেন, 'গোশত'। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পানীয় কি? তিনি জবাব দিলেন, 'পানি'। ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর'।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত না। যদি হত, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে ব্যাপারেও তাঁদের জন্যে দোয়া করতেন।

বর্ণনাকারী বলেছেন, কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ, শুধু গোশত ও পানি সব সময় মেজাজের অনুকূল হতে পারে না। (তবে মক্কায় ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়ার বরকতেই এটা সম্ভব হয়েছে)।

ইবরাহীম (আঃ) আলাপ শেষে, পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম বলবে এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

তারপর ইসমাইল (আঃ) যখন বাড়ী আসলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিলেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বুড়ো লোক এসেছিলেন। স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন। তার পর বললেন, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে আপনার খবর জানিয়েছি। তিনি আমাকে আমাদের সংসার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে,

www.pathagar.com

আমরা সুখে-শান্তিতে আছি। ইসমাইল (আঃ) জানতে চাইলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আপনার কাছে সালাম বলেছেন। আর আপনাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাইল (আঃ) বললেন, উনিই আমার বাপ। আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

আল্লাহর ইচ্ছায়, আবারও ইবরাহীম (আঃ) কিছুদিন তাদের কাছে থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার তাঁদের কাছে আসলেন। এসে দেখলেন, ইসমাইল (আঃ) যমযমের কাছে একটি গাছের ছায়ার নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। বাপকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পর একজন পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সাক্ষাত হলে যা করে তাঁরা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে ইসমাইল, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম করেছেন। ইসমাইল (আঃ) জবাব দিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে যা আদেশ করেছেন, আপনি তা করে ফেলুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, এতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাইল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য করবো। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে, এর চার পাশে ঘেরাও করে একটি ঘর তৈরী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু পাহাড়টির দিকে ইশারা করে তাঁকে স্থানটি দেখালেন। তারপর তাঁরা কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে শুরু করলেন। ইসমাইল (আঃ) পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আঃ) গাঁথুনি করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাইল (আঃ) মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর ঐ পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আঃ) এর জন্যে তা রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) এর উপর দাঁড়িয়ে এমারত তৈরী করতে লাগলেন এবং ইসমাইল (আঃ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন।

তাঁরা উভয়ে এই দোয়া করতে লাগলেনঃ 'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম'
অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কাছ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি বেশী শোনেন এবং জানেন।

আবার তাঁরা দেয়াল তৈরী করতে লাগলেন এবং কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন। আর উভয়ে এই দোয়া করছিলেনঃ 'হে আমাদের প্রভু। আমাদের এই পরিশ্রমটুকু কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি বেশী শোনেন ও জানেন।"
বুখারী শরীফের দীর্ঘ হাদীসটি এখানেই শেষ হল। এই সুদীর্ঘ হাদীসে কিভাবে পবিত্র মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
এভাবে, ইসমাইল (আঃ) কে কেন্দ্র করে মক্কায় মানুষের পূর্ণাঙ্গ আবাদি শুরু হয় এবং যমযম কূপের পানিই তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে দাঁড়ায়। যমযম কূপ না হলে, জোরহোম গোত্রের মক্কায় বসবাস করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, যমযমের পানির কারণেই তারা এখানে বাস করতে আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে মক্কায় বসতি গড়ে উঠে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ৩য় বার মক্কা সফরে এসে হযরত ইসমাইল (আঃ) কে নিয়ে কা'বা শরীফ তৈরী করেন।

www.pathagar.com

বর্তমান মক্কা শহরের ছবি

ফেরেশতারা প্রথমে কা'বা তৈরী করেন

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে কা'বা তৈরী করে এখানে ইবাদত করেন। তখন যমীনে মানুষ ছিলনা, ছিল জ্বিন। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহপাক আদম (আঃ) কে দুনিয়ায় পাঠিয়ে মক্কাকে তাঁর বাসস্থান ও ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। তিনিই মূলতঃ মক্কার প্রথম আবাদকারী মানুষ ও নবী, কাজেই স্পষ্টতঃ ইবরাহীম (আঃ) কা'বার প্রথম নির্মাণকারী নন। পবিত্র কোরানেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "স্মরন কর, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বাইতুল্লার ভিত্তিকে উপরের দিকে উঠান।" এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবরাহীম (আঃ) নিজে কা'বার ভিত্তি স্থাপন করেন নি। তিনি পূর্বের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর উপরের দিকে দেয়াল তোলেন। ইবরাহীম (আঃ) এর পূর্বেও কা'বা ঘর বিভিন্ন পর্যায়ে পূনঃ নির্মাণ করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা বলেছেন। তাঁদের মতে ফেরেশতার পর নবীদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ), হযরত শীস (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা পূনঃনির্মাণ করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমালেকা সম্প্রদায়, জোরহোম গোত্র, কুসাই বিন কিলাব, কোরাইশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়ের, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং সুলতান মুরাদ কা'বা ঘর পূনঃ নির্মাণ/সংস্কারের কাজ করেন। বর্তমানের কা'বার ডিজাইনটি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কা'বা নির্মাণের ঘটনা আল্লাহপাক কোরআন মজিদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ "স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কা'বার ভিত্তির উপর দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে তা উঁচু করে; তখন তারা দোয়া করে যে, হে

www.pathagar.com

আমাদের রব, আমাদের কাজকে কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনি বড় শ্রোতা ও জ্ঞানী।"

আল্লামা আমবাকীর মতে ইবরাহীম (আঃ) কাদা ও চূনা ব্যতীত পাথরের উপর পাথর বসিয়েই কা'বা শরীফের ছাদ দেননি। তিনি ঘরের ছাদ ও দরজা ফাঁকা রেখেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের নির্মাণকাজে ৫টি পাহাড়ের পাথর ব্যবহার করেছিলেন। এগুলো হলোঃ ১. সিনাই পাহাড়, ২. বাইতুল মাকদাসের যাইতা পাহাড়, ৩. লুবনান পাহাড়দ্বয়, ৪. জুদি পাহাড় ও ৫. হেরা পাহাড়। ফেরেশতারা ঐ সকল পাহাড় থেকে প্রয়োজনীয় পাথর এনে দিয়েছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) তাকে পাথর তুলে দিয়ে সহায়তা করতেন। তিনি হযরত আদমের (আঃ) প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর দেয়াল তৈরী করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের মাত্র দুটো কোণ তৈরী করেন। একটা হচ্ছে রোকনে ইয়ামানী আর অপরটি হচ্ছে রোকনে আসওয়াদ বা হাজরে আসওয়াদের কোণ।

তিনি হিজরে ইসমাইলের দিকটিকে অর্ধবৃত্ত রেখার মত গোলাকার রেখেছেন। হিজরে ইসমাইল (আঃ) কর্ণার আবার কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত কা'বার দেয়াল ৯ হাত উঁচু। দরজা সংলগ্ন সামনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩২ হাত, এর বরাবর পিছনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩১ হাত। হিজরে ইসমাইল এবং মীযাবে কা'বার দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২২ হাত এবং হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মাঝামাঝি দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২০ হাত ছিল।

সৌদি আমলে কা'বা শরীফের যে সঠিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছেঃ দরজা সংলগ্ন সামনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩৩ হাত, এর বরাবর পেছনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩২ হাত, হিজরে ইসমাইল এবং মীযাবে কা'বার দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২৭ হাত এবং হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মাঝামাঝি দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২০ হাত। এটাই ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর নির্মিত কা'বার সঠিক মাপ বলে সর্বশেষ ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেন।

আরব এবং সারা দুনিয়ার কা'বার মর্যাদা

কা'বা ঘরখানি নিছক একটি ইবাদতের স্থানই ছিলনা, যেমন মসজিদগুলো হয়ে থাকে। বরঞ্চ প্রথম দিন থেকেই দ্বীন ইসলামের বিশ্বজনীন আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এক খোদাকে যারা মানে তারা প্রতিটি স্থান থেকে বের হয়ে এখানে এসে সমবেত হবে, সকলে মিলে খোদার ইবাদত করবে এবং ইসলামের বাণী সাথে করে পুনরায় আপন আপন দেশে ফিরে যাবে। এই ছিল সেই সমাবেশ, যার নাম রাখা হয়েছিল 'হজ্ব'। এ কেন্দ্রটি কিভাবে তৈরী হয়েছিল? কোন ভাবাবেগ ও দোয়ার সাথে উভয় পিতাপুত্র এ গৃহের দেয়াল নির্মাণ করেন এবং কিভাবে হজ্বের সূচনা করেন এর বিস্তারিত বিবরণ কোরআন মজীদে এভাবে বয়ান করা হয়েছে ঃ

বস্তুতঃ প্রথম যে ঘর মানুষের জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছিল তা হচ্ছে সেই ঘর যা মক্কায় নির্মাণ করা হয়। এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ ঘর এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্যে হেদায়েতের

www.pathagar.com

কেন্দ্র। এতে রয়েছে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং মাকামে ইবরাহীম। যে কেউ এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। (আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)

এরা কি দেখেনি আমরা কি রকম নিরাপদ হারাম বানিয়েছি। অথচ তার চারপাশে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়। (আন্‌কাবুত ঃ ৬৭)

অর্থাৎ আরবে দুহাজার বছর ধরে চারদিকে লুঠতরাজ, হত্যা, ধ্বংসলীলা, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রচন্ডভাবে চলছিল, এ হারামে সর্বদা নিরাপত্তাই বিরাজ করতো। এমন কি অসভ্য বেদুইন পর্যন্ত তার সীমারেখার ভেতরে তার পিতার হত্যাকারীকে দেখতে পেলেও তার গায়ে হাত দিতে সাহস করতো না। সূরা বাকারায় (১২৫-১২৯) এরশাদ হয়েছেঃ

-এবং স্মরণ কর যখন আমরা এ ঘরকে লোকদের জন্যে কেন্দ্র, প্রত্যাবর্তনের ও নিরাপত্তার স্থান বানালাম এবং হুকুম দিলাম যে, ইবরাহীমের এবাদতের স্থানকে জায়নামাজ বানাও এবং ইবরাহীম ও ইসমাইলকে নির্দেশ দিলাম আমার ঘরের তওয়াফকারী-ইহতেকাফকারী এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্যে পাক-সাফ রাখ। এবং যখন ইবরাহীম দোয়া করলো, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে একটা নিরাপত্তাপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে ফলমূলের রিযিক দান কর। যারাই তাদের মধ্যে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনয়নকারী হবে এবং যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল এ ঘরের ভিত গড়ছিল তখন দোয়া করছিল-হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের চেষ্টা কবুল কর। তুমি সবকিছু শ্রবণ কর ও জান। পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার মুসলিম (অনুগত) বানাও। এবং আমাদের বংশ থেকে এমন এক জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। এবং আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের পন্থা পদ্ধতি বলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার কৃপা দৃষ্টি রাখ, তুমি বড়ো ক্ষমাকারী ও মেহেরবান। হে পরওয়ারদেগার! তুমি এসব লোকদের মধ্যে এদের কওম থেকে এমন এক রসূল পাঠাও যে তাদেরকে তোমার আয়াত শুনাবে এবঙ তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই তুমি বিরাট শক্তিশালী ও বিজ্ঞ। সূরা ইবরাহীমে (৩৫-৩৭) এরশাদ হয়েছেঃ

-এবং যখন ইবরাহীম দোয়া করলো, পরওয়ারদেগার! এ শহরকে নিরাপদ শহর বানিয়ে দাও, আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও। পরওয়ারদেগার! এসব প্রতিমা বহু লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব যে কেউ আমার পথ অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পথ থেকে সরে পড়বে, তবে তুমিতো ক্ষমাকারী ও মেহেরবান। পরওয়ারদেগার! আমি আমার বংশের একটি অংশ তোমার এ মহিমান্বিত ঘরের পাশে এ পানি ও তরুলতাহীন উপত্যকায় এনে পুনর্বাসিত করেছি যাতে করে হে পরওয়ারদেগার, তারা নামায কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মনকে এমন অনুরক্ত করে দাও যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসে এবং তুমি তাদেরকে ফলমূলের রিযিক দান কর। আশা করা যায় যে তারা কৃতজ্ঞ হবে। সূরা হজ্বে (২৬-২৮) বর্ণনা করা হয়েছেঃ

-এবং যখন আমরা ইবরাহীমের জন্যে এ ঘরের স্থান নির্ধারিত করে দিলাম এ হেদায়েত সহ যে, কাউকে আমার সাথে শরীক করবেনা এবং আমার ঘরকে তওয়াফকারী, রুকু

www.pathagar.com

ও সিজদাকারীদের জন্যে পাকসাফ রাখবে এবং (হুকুম দিলাম) লোকের মধ্যে হজ্বের সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দাও যাতে করে তোমার নিকটে তারা চলে আসে, তা পায়ে হেঁটে আসুক অথবা দূরদূরান্ত থেকে দূর্বল উটনীর উপর চড়ে, যাতে তারা দেখতে পায় যে তাদের জন্যে কত প্রকারের দ্বীন ও দুনিয়াবী লাভ রয়েছে। তারপর এ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ যে সব পশু তাদেরকে দিয়েছেন তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারন করবে অর্থাৎ কুরবাণী করবে। সে সবের গোশত তারাও খাবে এবং নিঃস্ব ও অভাবী লোকেরাও খাবে।

অতীতে আরব দেশে কা'বার মর্যাদা শুধু একটি ইবাদতখানা হিসাবেই ছিলনা। বরঞ্চ তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও পবিত্রতার কারণে তা গোটা দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে পড়েছিল। হজ্ব ও ওমরার জন্যে সমগ্র দেশ থেকে দলে দলে কাবার উদ্দেশ্যে লোক আসতো এবং এ জনসমাবেশের মাধ্যমে শতধা বিচ্ছিন্ন আরববাসীদের মধ্যে ঐক্যের এক সম্পর্ক স্থাপিত হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোক পারস্পরিক তামাদ্দুনিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। কাব্য প্রতিযোগিতার ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধান হতো। ব্যবসায় লেনদেনের ফলে সারাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ হতো। হারাম মাসগুলোর বদৌলতে বছরের একতৃতীয়াংশ সময় আরববাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ মিলতো। এ সময়টাই এমন ছিল যে, তাদের বিভিন্ন কাফেলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারতো। কুরবাণীর জন্যে গলায় পট্টি বাঁধা পশু তাদের সাথে থাকলে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতে বড়ো সুবিধা হতো। কারণ মানতের চিহ্ন স্বরূপ সেসব পশুর গলায় পট্টি বাঁধা থাকতো, যেসব দেখার পর আরববাসীদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনমিত হতো। সে সবের উপর হস্তক্ষেপ করতে কোন লুন্ঠনকারী গোত্রেরও সাহস হতোনা।

খানায়ে কা'বার কারনে আল্লাহ্পাক মক্কা শরীফের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। নাসায়ী, তিরমিজী ও ইবনে মাজা আবদুল্লাহ বিন আদী বিন হামরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে মক্কায় সওয়ারীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় মক্কাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর শপথ, তুমি আল্লাহর যমীনের মধ্যে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ; যদি আমাকে তোমার কাছ থেকে বের করে দেয়া না হত, তাহলে আমি কিছুতেই বের হতাম না।" ইমাম তিরমিজী এই হাদীসকে হাসান বা উত্তম বলেছেন।

নাসায়ী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হল ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) হাযওয়ারা নামক বাজারে বলেছিলেন, 'হে মক্কা, আল্লাহর শপথ, তুমি আল্লাহর উত্তম যমীন এবং আল্লাহর প্রিয় শহর; যদি তোমার কওম, আমাকে তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত না করত, তাহলে আমি কখনও বের হয়ে যেতাম না। ইবনে আসীর বলেছেন, হাযওয়ারা মক্কার একটি জায়গার নাম। এই জায়গাটি বাবে ইবরাহীমের পশ্চিমে, সাধেক সোকে সগীরে অবস্থিত। এটি বর্তমানে মসজিদে হারামের নতুন সম্প্রসারণের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম তিরমিজি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ "তুমি মক্কা, কতইনা

www.pathagar.com

ভাল এবং আমার নিকট কতইনা প্রিয়! যদি তোমার লোকেরা আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমার থেকে দূরে অন্য কোথাও বাস করতাম না।" বলা বাহুল্য যে, এই নিরাপদ নগরীর সবচাইতে বড় মর্যাদা মসজিদে হারামের অস্তিত্বের কারণেই হয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ কা'বা শরীফকে সম্মানিত ঘর এবং মানুষের টিকে থাকার কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।'

বাইতে হারামের এই সম্মানিত এলাকা, গোটা হারামের সীমান্তের ভেতরের সকল এলাকাকে বুঝায়। হারাম এলাকার চারদিকের সীমান্তের মধ্যে স্তম্ভ নির্মাণ করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ গোটা হারাম এলাকার মর্যাদা কাবা মরীফের মর্যাদার অনুরূপ করে দিয়েছেন। এতে করে কাবা শরীফের সম্মান বাড়ানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য। শরীয়তের বিধি নিষেধ উভয় জায়গার জন্যেই সমান করে দেয়া হয়েছে।

ইমাম যুহুরী বলেছেন, হারাম এলাকার সীমানা, সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজেই নির্ধারণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর নির্দেশক্রমেই তিনি সীমানা চিহ্নিত করণের কাজ শেষ করেন। তারপর কুসাই বিন কিলাব তা পূনঃনির্মাণ করেন। এর পর মক্কা বিজয়ের বছর, রসূলুল্লাহ (সঃ) তামীম বিন উসাইদ আল খোজায়ীকে তা পূনঃনির্মাণের জন্যে পাঠান। তিনি সেগুলোর পূনঃ সংস্কার করেন। এভাবেই শত শত বছর ধরে হারাম শরীফের সীমানার হেফাজত করা হচ্ছে।

খানায়ে কা'বার মালিক এর সংরক্ষক

খানায়ে কা'বা দুনিয়াতে আল্লাহপাকের একটি অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এ নিদর্শন দুনিয়ার মানুষের জন্যে হেদায়াতের একটি আলোকবর্তিকা হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। এ পবিত্র ঘরের প্রতি একেশ্বরবাদীদের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে নাছারা-মোশরিক-অগ্নিপূজকরা একে ধ্বংস করা কিংবা এর বিপরীতে আকর্ষনীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ উপাসনালয় দাঁড় করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল, কিন্তু কা'বার মালিক তা হতে দেননি। আবরাহার ঘটনা এর একটি বড় দৃষ্টান্ত। ঘটনাটি এরূপ -----

আবরাহা সানাতে কুল্লাইস নামে এমন একটি গীর্জা তৈরী করে, তৎকালীন বিশ্বে যার সমতূল্য ও সদৃশ কোন ঘর ছিল না। এটাই হলো সেই ঐতিহাসিক গীর্জা, যাকে আবরাহা পবিত্র কা'বার বিকল্প হিসেবে তৈরী করেছিলো। আরবরা কা'বার পরিবর্তে ঐ গীর্জাকে হজ্বের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করুক, ঐ গীর্জার এলাকায় হজ্বকে স্থানান্তরিত করুক এটাই ছিল তার অভিলাষ। অতঃপর সে নাজ্জাশীকে পত্র লিখলো, "হে রাজা, আমি আপনার জন্যে এমন একটা গীর্জা গড়েছি, যার তূলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আরবদের হজ্বকে আমি এই গীর্জার এলাকায় স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না।" নাজ্জাশীর কাছে লেখা আবরাহার এই চিঠির কথা অচিরেই আরবদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো। বনী কিনানা গোত্রে রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়ার মাসকে হালাল করণের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী একটা গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীকে বলা হতো নাসায়াহ। তাদের একজন রগচটা লোক গোপনে গিয়ে আবরাহার ঐ গীর্জায় পায়খানা করে রেখে আবার নিজের বসতিতে ফিরে এলো।

www.pathagar.com

যথা সময়ে ব্যাপারটা আবরাহার কানে গেল। সে লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, "এই কান্ডটা কে করলো?" লোকেরা জানালো, জনৈক আরব এ কাজ করেছে। সে মক্কার কাবাঘরে হজ্ব আদায়কারীদের দলভূক্ত। আপনি মক্কা থেকে এখানে হজ্ব স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক একথা শুনে সে রেগে গিয়ে এ কাজ করেছে। এ দ্বারা সে প্রমাণ করতে চায় যে, এই গীর্জা কা'বার বিকল্প হতে পারে না এবং এটা হজ্বের কেন্দ্র হবার যোগ্য নয়।"

আবরাহা তো রেগেই আগুন। সে শপথ করলো যে, যেমন করেই হোক সে কা'বাকে ধ্বংস করবেই। হাবশীদেরকে সে তার অভিপ্রায় জানালো। হাবশীরা সব রকমের উপকরণ ও সরঞ্জাম দিয়ে তাকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করলো। যথা সময়ে সে একদল হস্তী নিয়ে কা'বা অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। আরবরা ব্যাপারটা জানতে পেরে ভীষণ প্রমাদ গুণলো এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বাকে আবরাহা ধ্বংস করতে চায় শুনে আরবরা উপলব্ধি করলো যে, এ হানাদারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তাদের একান্ত কর্তব্য।

ইয়ামানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী নাগরিক 'যুনফর' সমগ্র ইয়ামানবাসী ও অন্যান্য আরবদেরকে আহবান জানালেন কা'বা শরীফকে রক্ষা করার জন্যে আবরাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। যারা তার আহবানে সাড়া দিল তাদের নিয়ে যুনফর আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁর বাহিনী পরাজিত হলেন এবং যূনফর বন্দী হলেন।

এরপর আবরাহা তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে গেলো। খাস'য়াম উপজাতীয়দের এলাকায় পৌঁছুলে নুফাইল ইবনে হাবীব আল্ খাসয়ামী দু'টি খাসয়ামী গোত্র শাহরান ও নাহিস এবং আরো কয়েকটি সমমনা আরব গোত্রকে সাথে নিয়ে আবরাহার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে নুফাইলও সদলবলে পরাজিত ও বন্দী হলেন। আবরাহা নুফাইলকে মুক্তি দিলে নুফাইল তার পথ প্রদর্শক হিসেবে সহযাত্রী হলেন। আবরাহা যখন তায়েফের উপর দিয়ে এগিয়ে চলছিল, তখন সকীফ গোত্রের কিছু লোকজন সাথে নিয়ে মাসউদ ইবনে মু'আতিব তার সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং তাকে বললো, "হে রাজা, আমরা একান্ত অনুগত গোলাম তূল্য। আপনার বিরোধী নই আমরা। আপনি যে ঘর লক্ষ্য করে চলেছেন, ওটা আমাদের উপাসনার ঘর নয়। আপনিতো চাইছেন মক্কার ঘরে হামলা চালাতে। বেশ, আমরা আপনার পথ প্রদর্শক হিসেবে একজন লোক সঙ্গে দিচ্ছি। সে আপনাকে দেখিয়ে দেবে কা'বা ঘর।" আবরাহা তাদের প্রতি প্রীত ও সদয় হলো। তায়েফবাসী তার সাথে 'আবু রিগাল' নামক এক ব্যক্তিকে মক্কার পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে পাঠালো। আবরাহা ও তার দলবলকে সাথে নিয়ে মুগাম্মাস নামক স্থানে উপনীত হলে আবু রিগাল মারা গেল। পরবর্তীকালে আরববাসী আবু রিগালের কবরে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং আজও মুগাম্মাসে তার কবরে লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করে থাকে।

আবরাহা মুগাম্মাসে যাত্রা বিরতি করার সময় আসওয়াদ বিন মাকসূদ নামক জনৈক হাবশী নাগরিককে ঘোড়ায় চড়িয়ে মক্কা পরিদর্শনে পাঠায়। আসওয়াদ মক্কা পর্যন্ত যায় এবং ফিরে আসার সময় উপত্যকায় চারণ ভূমিতে বিচরণশীল কুরাইশ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

গোত্রের লোকদের গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসে। এইসব গবাদি পশুর মধ্যে আবদুল মোত্তালিব ইবনে হাশিমের দুশো উটও ছিল। তিনি ঐ সময় কোরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বড় নেতা ছিলেন। গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ঐ এলাকার কোরাইশ, কিনানা ও হুযাইল গোত্র আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে পেরে তারা সে ইচ্ছা পরিহার করে।

আবরাহা হুনাতাহ আল্ হিমইয়ারীকে মক্কায় পাঠাবার সময় বলে দিল, "প্রথমে মক্কার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা যিনি, তাঁকে চিনে নিও। অতঃপর তাঁকে বলো, রাজা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। এসেছেন শুধু কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে। তোমরা যদি আমাদেরকে এ কাজে বাধা দিতে কোন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হও তা হলে তোমাদের রক্তপাতের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। তিনি যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক না হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

হুনাতাহ মক্কায় প্রবেশ করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, মক্কায় সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা হলেন আবদুল মোত্তালিব ইবনে হাশিম। সে আবদুল মোত্তালিবের কাছে উপস্থিত হলো এবং রাজা তাকে যা যা বলতে বলেছিলো তা বললো। আবদুল মোত্তালিব বললেন, "আল্লাহর কসম, আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতে চাইনে এবং সে ক্ষমতাও আমাদের নেই। এটা আল্লাহর পবিত্র ঘর। এটা তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের ঘর ও নিজস্ব সম্ভ্রমের ব্যাপার। আর যদি তিনি বাধা না দেন তবে আমাদের কিছু করার থাকবে না।"

তখন হুনাতাহ বললো, "আপনি আমার সাথে রাজার কাছে চলুন। কারণ তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আপনাকে সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে যেতে।" আবদুল মোত্তালিব তাঁর এক পুত্রকে সাথে নিয়ে আবরাহার নিকট চললেন। আবরাহার সৈন্যদের কাছে পৌঁছেই তিনি যূনফর সম্পর্কে খোঁজ নিলেন, যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। বন্দী যূনফরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, "হে যূনফর, আমাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছে, তার প্রতিকারে তোমার দ্বারা কি কোন সাহায্য হতে পারে?" যূনফর বললো, "এমন একজন রাজবন্দীর কি-ইবা সাহায্য করার ক্ষমতা থাকতে পারে, যে প্রতিমুহূর্তে প্রহর গুণছে, এই বুঝি তাকে হত্যা করা হয়? আমার বাস্তবিকই তোমাদের এই মুসিবতে তেমন কিছু করার নেই। তবে আনীস নামক একজন মাহুত আছে। সে আমার বন্ধু। তাকে আমি বার্তা পাঠাচ্ছি। তোমার উচ্চ মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে তাকে অবহিত করবো ও রাজার কাছে তুমি যাতে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পার সেজন্যে তাকে অনুমতি চেয়ে দিতে বলবো। এমনকি সম্ভব হলে সে যাতে তোমার ব্যাপারে সুফারিশও করে, সেজন্যে তাকে অনুরোধ করবো।" আবদুল মোত্তালিব বললেন, "এ টুকুই যথেষ্ট হবে।" এরপর যূনফর আনীসের নিকট এই বলে বার্তা পাঠালো, "শোনো! আবদুল মোত্তালিব হলেন কুরাইশদের একচ্ছত্র অধিপতি। মক্কার বণিক সমাজের নেতা। উপত্যকাভূমিতে মানুষের এবং পাহাড় পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী হিসেবে তিনি পরিচিত। যেসব পশু রাজার হস্তগত হয়েছে, তন্মধ্যে দু'শত উট এই আবদুল মোত্তালিবের। সুতরাং তুমি রাজার সাথে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করে দাও এবং যতটা পার তাঁর উপকার কর।" আনীস বললো, "ঠিক আছে। আমি

www.pathagar.com

সাধ্যমত চেষ্টা করবো।" আনীস আবরাহাকে বললো, "হে রাজা, কোরাইশদের নেতা আপনার দরবারে উপস্থিত। তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান। তিনি মক্কায় বণিকদের দলপতি। তিনি উপত্যকা ভূমিতে যেমন মানুষের আহার করান তেমনি পর্বত শীর্ষের বন্যপশুর খাদ্য সরবরাহকারী বলেও সুখ্যাত। অনুগ্রহ পূর্বক তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে তাঁর দাবীদাওয়া পেশ করতে দিন।" আবরাহা তাঁকে অনুমতি দিলো।

আবদুল মোত্তালিব ছিলেন সেই সময়কার শ্রেষ্ঠতম সুদর্শন এবং অতি গণ্যমান্য ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আবরাহা তাঁকে দেখেই মুগ্ধ ও অভিভূত হলো। সে আবদুল মোত্তালিবকে এতখানি সম্মানিত মনে করলো যে, নিজে উচ্চ আসনে বসে তাঁকে নীচে বসতে দিতে পারলো না। পক্ষান্তরে হাবশীরা তাঁকে রাজার সাথে একই রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট দেখুক, তাও পছন্দ করলো না। অগত্যা আবরাহা স্বীয় রাজকীয় আসন থেকে নেমে নীচের বিছানায় বসলো এবং আবদুল মোত্তালিবকে সেখানে নিজের পাশে বসালো। অতঃপর দো-ভাষীকে বললো, "তাঁকে বক্তব্য পেশ করতে বলো।" দোভাষী আদেশ পালন করলো। আবদুল মোত্তালিব বললেন, "আমার অনুরোধ, আমার যে দুশো উট রাজার হাতে এসেছে, তা ফেরত দেয়া হোক।" দোভাষী যখন একথা আবরাহাকে জানালো তখন আবরাহা দোভাষীর মাধ্যমে বললো, "তোমাকে প্রথম দৃষ্টিতে যখন দেখেছিলাম তখন অভিভূত হয়েছিলাম কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি আমার ভীষণ বীতশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, তুমি আমার সাথে আমার হস্তগত দুশো উটের দাবী নিয়ে কথা বলছো। অথচ তোমার ও তোমার বাপদাদার ধর্মের কেন্দ্র যে কা'বাগৃহ, আমরা সেটাকে ধ্বংস করতে এসেছি এ কথা জেনেও তুমি সে সমন্ধে কিছুই বলছোনা।" আবদুল মোত্তালিব বললেন, "আমি শুধু উটেরই মালিক। কা'বা গৃহের মালিক আর একজন আছেন, তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন।" আবরাহা বললো, "আমার আক্রমণ থেকে তিনি এ ঘরকে ঠেকাতে পারবেন না।" আবদুল মোত্তালিব বললেন, "সেটা আপনার আর কা'বা ঘরের মালিকের ব্যাপার।"

আবরাহা আবদুল মোত্তালিবের উট ফিরিয়ে দিলো। আবদুল মোত্তালিব কোরাইশদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে সমস্ত ব্যাপারটা জানালেন। তিনি তাদেরকে মক্কা থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড় পর্বতের গোপন গুহা গুলোতে আশ্রয় নিয়ে আবরাহার সৈন্যদের সম্ভাব্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আবদুল মোত্তালিব নিজে কোরাইশদের একদল লোককে সাথে নিয়ে কা'বার দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর কাছে আবরাহা ও তার সৈন্য সামন্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তাঁর সাহায্য কামনা করে দোয়া করতে লাগলেন। আবদুল মোত্তালিব কা'বার চৌকাঠ ধরে বলতে লাগলেন,

"হে আল্লাহ, একজন বান্দাও তার দলবলকে রক্ষা করে থাকে। অতএব তুমি তোমার অনুগত লোকদেরকে রক্ষা কর। ওদের ক্রুশ এবং বলবিক্রম যেন তোমার শক্তির উপর জয়যুক্ত না হয়। আমাদের কেবলাকে তুমি যদি ওদের করুণার ওপর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তাহলে যা খুশী কর!"

www.pathagar.com

এরপর আবদুল মোত্তালিব কা'বার দরজার চৌকাঠ ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ও তাঁর কুরাইশ সঙ্গীরা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে তারা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন আবরাহা মক্কায় ঢুকে কি করে।

পরদিন প্রত্যুষে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তার হস্তী বাহিনী ও সৈন্য বাহিনীকে সুসংহত করলো। তার হাতীর নাম ছিল মাহমূদ। আবরাহার সংকল্প ছিল, প্রথমে কা'বাকে ধ্বংস করবে, অতঃপর ইয়ামান ফিরে যাবে। হস্তী বাহিনীকে মক্কা অভিমুখে পরিচালিত করলে নুফাইল ইবনে হাবীব এগিয়ে এলো এবং আবরাহার হাতীর পাশে দাঁড়ালো। অতঃপর সে হাতীর কান ধরে বললো, "হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো। নচেৎ যেখান থেকে এসেছো ভালোয় ভালোয় সেখানে ফিরে যাও। জেনে রেখো তুমি আল্লাহর পবিত্র নগরীতে রয়েছো।" অতঃপর তার কান ছেড়ে দিতেই হাতী হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। নুফাইল হাতীকে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে কোন রকমে পাহাড়ের উপর চড়ালো। এর পর অনেক মারধোর করেও হাতীকে উঠানো সম্ভব হলো না। অতঃপর তার শুঁড়ের ভেতর আঁকা বাঁকা লাঠি ঢুকিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয়া হলো যাতে হাতী উঠে দাঁড়ায়। তবুও উঠলো না। অতঃপর তাকে পেছনের দিকে ইয়ামান অভিমুখে ফিরতি যাত্রা করার জন্য চালিত করা মাত্রই ছুটতে আরম্ভ করলো। সিরিয়ার দিকে চালিত করলেও জোর কদমে চলতে লাগলো। অতঃপর যেই মক্কার দিকে চালিত করা হলো অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ঠিক এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে এক ধরনের কালো পাখী পাঠালেন। প্রতিটি পাখীর সাথে তিনটে করে পাথরের নুড়ি ছিল। একটা তার ঠোঁটে আর দুটো দুই পায়ে। পাথরগুলো কলাই ও বুটের মত। যার গায়েই সেগুলো পড়তে লাগলো, সে-ই তৎক্ষাণাৎ মরতে লাগলো। কিন্তু সবার গায়ে পড়তে পারলো না। অনেকেই পালিয়ে যেখান থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে লাগলো। লোকেরা রাস্তার যেখানে সেখানে পড়ে মরতে লাগলো। আবরাহার গায়ে একটা নুড়ি পড়তেই সে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। ইবনে ইসহাক বলেন,
আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠানোর পর এই ঘটনাকে কোরাইশদের প্রতি তাঁর বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমেই তিনি হাবশীদের পরাধীনতার বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। যাতে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বহাল থাকে। আল্লাহ সূরা ফীলে বলেন ঃ

"তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক হাতীওয়ালাদের সাথে কি রকম আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন যারা তাদের প্রতি কঠিন কংকর নিক্ষেপ করছিলো আর এভাবে তাদেরকে চর্বিত ভূষি বা ঘাসের মত বানিয়ে দিয়েছিলেন।"

আমাদের বিমান জেদ্দায় অবতরণ করল

খানায়ে কা'বার ইতিহাস আদ্যোপান্ত ভাবছিলাম, ইতিমধ্যে আমাদের বিমান জেদ্দায় পৌছার ঘোষণা কানে এল। তখন স্থানীয় সময় বিকাল ৩-৩০ টা। তালবিয়া পড়তে থাকলাম আর পড়ে নিলামঃ

www.pathagar.com

"রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিউ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদকিউ ওয়াজ-আলুনি মিল্লা দুন্কা সুলতানান নাসিরা"

দোয়াটি পড়তে পড়তে আমরা যথারীতি বিমান থেকে অবতরণ করলাম। বিমান বন্দরের যাবতীয় ফরমালিটি শেষ করতে প্রায় সোয়া ঘন্টা লেগে গেল। বিমান বন্দরের নামাজ কক্ষেই আমরা আছরের নামাজ পড়ে নিলাম, তখন বিকাল ৪-৪৫ টা।

প্ল্যাট ফরমে বেশ ক'জন লোক আমাদেরকে দেখে এগিয়ে এল। ইহরাম পরা দেখে তারা বুঝে নিল যে, আমাদের গন্তব্য পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমা। তারা যে ট্যাক্সি ড্রাইভার আলাপ করার পূর্বে বুঝার উপায় ছিল না। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আমরা অনুসরন করলাম। সে আমাদের লাগেজ বহনে সহায়তা করল। ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডে এসে আমরা যথারীতি ট্যাক্সিতে আরোহণ করলাম। ট্যাক্সি ছুটে চলল। ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ আলাপী। আমাদের দেশ, আমাদের পরিচয় জানতে চাইল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে। আমরা বাংলাদেশী জেনে সে খুশী হল এবং আমাদেরকে অভিনন্দিত করল। আমরাও তার পরিচয় নিলাম। সে একজন সৌদি নাগরিক বলেই পরিচয় দিল। এখানে একটি বিষয় মনে পড়েছে যে, সৌদি আরবে ট্যাক্সিতে উঠার ব্যাপারে কোন শংকা নেই। হাইজ্যাকারের পাল্লায় পড়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা অনেকটা গ্যারান্টিড, যেটা বাংলাদেশে চিন্তাও করা যায় না। ট্রাফিক রুল কঠোর ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। তবে ট্যাক্সি ভাড়া করার ব্যাপারে যে জিনিসটি দেখতে হবে তা হল এই যে, ড্রাইভার পথ-ঘাট চিনে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

মসজিদে হারামের গেইটে

প্রফেসর মূসা বলেছিলেন মসজিদে হারামের কিং ফাহাদ গেইটে পৌছার জন্যে। তিনি সেখান থেকে আমাদেরকে রিসিভ করবেন। তদনুসারে আমরা কিং ফাহাদ গেইটের নিকটস্থ বাসষ্ট্যান্ডে আমাদেরকে নামিয়ে দেয়ার জন্যে ড্রাইভারকে বললাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পর ট্যাক্সি থামল। ড্রাইভার বলল, আপনারা এসে গেছেন। এটা ছিল বাবে মালেক ফাহাদ গেইট, ১৫নং বাস স্ট্যান্ড। নেমেই আমরা উপস্থিত এক ব্যাক্তিকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে মসজিদে হারামের একটি অতি নিকটের গেইট আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন। সাথে কিছু রিয়াল ছিল। তা থেকে একশত রিয়াল ভাড়া চুকিয়ে আমরা লাগেজ সহ ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। কয়েক কদম পরেই মসজিদে হারামের বাইরের চত্তর। অগ্রসর হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, গেইটে লেখা আছে "বাবে মালিক ফাহাদ" মালিক অর্থ যে 'কিং' বা 'বাদশাহ্' তা স্মরণ ছিল না বলে সঙ্গীদেরকে লাগেজসহ গেইটের নিকটে অপেক্ষা করতে বলে আমি এদিক সেদিক হেঁটে ক'জনকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা পূর্বোক্ত গেইটের প্রতিই ইঙ্গিত করলেন। এ সময় স্মরণ হল যে, মালিক মানেইত 'কিং' বা 'বাদশাহ্'। কাজেই বুঝতে বাকি রইলনা যে, আমরা সঠিক জায়গায়ই পৌঁছেছি। মূসা সাহেবের অপেক্ষায় আমরা গেইটের বাইরে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাগরীবের সময় হয়ে এল। এখানেই আমরা মসজিদে হারামে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করে নিলাম। মূসা সাহেবের সাক্ষাৎ হচ্ছিল না। ভাবলাম, আমাদের গন্তব্য ঠিক আছে তো!

www.pathagar.com

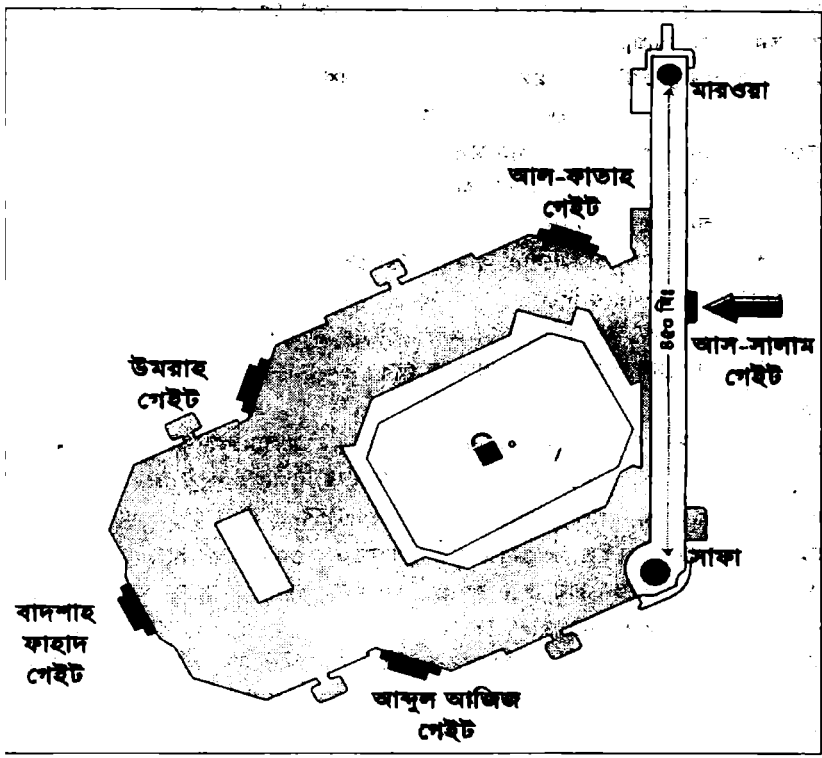

মসজিদে হারামের গেইট

এখানে মূসা সাহেবের পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি হলেন মক্কা ইউনিভার্সিটির (উম্মুল ক্বুরা ইউনিভার্সিটি) ইংরেজী বিভাগের একজন প্রফেসর। ঢাকায় বাড়ী রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের একজন সম্মানিত গ্রাহক। সে সুবাদেই তাঁর সাথে পরিচয়। ওমরা উপলক্ষে মক্কা-মদীনায় আমাদের সফরের কথা শুনে তিনি নানাভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং মক্কায় আমাদেরকে রিসিভ করা, হোটেলের সিট বুকিং করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন।

যাহোক,এ সময় ক্ষিধে বোধ করছিলাম। সাথীদের অপেক্ষা করতে বলে আমি মক্কা বিল্ডিং এর নীচের দোকান থেকে ৯ (নয়) রিয়াল দিয়ে তিন পিস দুম্বার গোস্তের সেন্ডুইস নিয়ে এলাম। আমরা সেন্ডুইস খাচ্ছি। এমন সময় আরবী জুব্বা পরা এক ব্যক্তি (দেখতে পাকিস্তানী গড়ন) আমাদের উদ্দেশ্য করে বাঙলা ভাষায় জানতে চান যে, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি কিনা। আমরা 'হ্যাঁ' বোধক উত্তর দিলে তিনি জানালেন যে, আপনারা নিশ্চয়ই প্রফেসর মূসা সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন। এরপর নিজের পরিচয় দিলেন যে, তাঁর নাম আব্দুল খালেক, বাড়ী ঢাকায়, মক্কাতে প্রায় ২০ বছর রয়েছেন, মূসা সাহেব তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। মূসা সাহেব পৌঁছা পর্যন্ত তাঁকে আমাদের সাথে থাকতে বলা হয়েছে বলে তিনি জানালেন।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে শহীদুল্যা সাহেব খানায়ে কা'বা এক নজর দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি কিছুক্ষণের জন্যে আসি। এ কথা বলে তিনি "মালিক ফাহাদ গেইট" দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দোয়া দরূদ পড়ার কথা স্মরণ করে দিলাম। আরো বললাম, ফিরতে পথ ভুল করে বসবেন না যেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মূসা সাহেব এসে পড়লেন। তিনি আমাদের সাথে সালাম বিনিময়ের পর মোসা-ফাহা করলেন এবং সফরে কোন অসুবিধা হল কিনা জানতে চাইলেন। এরপর নাস্তা করাতে চাইলেন। আমরা বিনীতভাবে নাস্তার ব্যাপারে 'না' করলাম। কেননা, ইতিমধ্যেই আমরা নাস্তা সেরে ফেলেছি। মূসা সাহেব এরপর আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আমাদের তখনকার প্রথম এবং প্রধান কাজ হল পবিত্র ওমরা সম্পাদন করা। এর পূর্বে অবশ্য থাকার জন্যে বাড়ী ভাড়া নিতে হবে এবং সে বাড়ীতে আমাদের লাগেজ রেখে আসতে হবে। তদনুসারে তিনি আমাদের নিয়ে উঠে পড়লেন।

মসজিদে হারামের চত্তর পার হওয়ার পর আমাদের মালামালগুলো একটি ট্রলিতে উঠানো হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মূসা সাহেবের নির্ধারিত বাড়ী ওয়ালী প্যালেস, আল-খলীল স্ট্রীট-এ এসে পড়লাম, ৫ তলা ভবনের তৃতীয় তলায় একটি রুমে আমাদের থাকতে দেয়া হল। রুমের আয়তন আনুমানিক ১২′ x ১৫′ হবে। ছোট একটি বাথ রুম এটাস্ড আছে। বাথ রুমে শীতল এবং গরম পানির সু-ব্যবস্থা রয়েছে। রুমে রয়েছে আমাদের তিনজনের জন্যে তিনটি খাট, ৩ আসনের একটি সোফা, একটি টী টেবিল ও একটি পড়ার টেবিল। আমাদের প্রতি দিনের নির্ধারিত সিটভাড়া ১০ রিয়াল করে। ম্যানেজার জনাব শাহ আলম জানালেন, হজ্ব/রমযান মওসুমে একইরুমে কমপক্ষে ১২টি সিট পাতান হয়, যার প্রতিটি ভাড়া ১০০০ রিয়াল এবং রুমের সর্বমোট ভাড়া হয় ১২০০০ রিয়াল। তখন কোন খাটের ব্যবস্থা থাকে না। মেঝেতে কেবলমাত্র বালিশ ও ফোমের তৈরী বিছানা পাতান হয়। যাহোক, আমরা তিনজন, মূসা সাহেব এবং তাঁর বন্ধুসহ আবার হারাম শরীফের দিকে রওয়ানা দিলাম। কিং ফাহাদ গেইট আমাদের বাসা বরাবর। সে কারণে আমরা সবাই এ গেইট দিয়েই প্রবেশ করলাম। বাবুস সালাস গেইট দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করাই সুন্নত। আমার ইচ্ছাও ছিল তাই। কিন্তু আমার ইচ্ছার কথাটি অপ্রকাশিত থেকে গেল। তখনও খানায়ে কা'বা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এ পর্যায়ে মূসা সাহেব তাঁর বন্ধু আব্দুল খালেক সহ আমাদের নিয়ে বসলেন এবং ওমরার নিয়ম বলে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ওমরার উদ্দেশ্যে সামনের দিকে অগ্রসর হতে বলে দিলেন।

ওমরা শুরু করলাম

বিসমিল্লাহ্ বলে পড়ে নিলাম - আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আব্ ওয়াবা রাহ্মাতিকা এরপর তাল্বিয়া পড়তে পড়তে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করতে থাকলাম, "হে আল্লাহ, এটি আপনার সুরক্ষিত মহান ঘর। এখানে যে-ই প্রবেশ করে সেই আপনার আইনে নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার রক্ত, আমার গোশ্ত, আমার অস্থি ও চর্মকে দোযখের আগুনের জন্যে হারাম করে দিন। খানায়ে কা'বা নজরে আসার সাথেই উচ্চারণ করতে থাকলাম লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক -

www.pathagar.com

---" আমি হাযির, হে আল্লাহ আমি হাযির, আপনার নিকট আমি হাযির------ এমন অনুভূতি হল যেন মহাপ্রভু বলেছেন- হে, বান্দা, কি চাই তোমার? কি দুঃখ তোমার? বলতে থাকলাম, চাই না বেহেশত, চাই না দোযখ, চাই আপনার নৈকট্য, চাই আপনার ক্ষমা, আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফু'বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'য়ফু আন্নি। মা'বুদ আপনার বন্ধু আপনার খলীল নবী ইবরাহীম (আঃ) আপনার আদেশে, এখানে এ পবিত্র অঙ্গনে আসার জন্যে আহ্বান করেছেন, আপনি সে আহবানে সাড়া দিতে মেহেরবানী করে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি হাযির ---------- লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক -------। আরও আরাধনা করতে থকলাম, আজ এ পবিত্র সন্ধিক্ষণে আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, আপনার রহমতের কোলে আশ্রয় দিন। মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আমার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখবেন না। আপনার সৃষ্টি আপনার বান্দাও কোন মেহমানকে বঞ্চিত করে না; মেহেরবান মনিব-মালিক আপনি আমার প্রতি রাজী খুশী হয়ে যান। আপনার সন্তুষ্টি আমার আজকের এ মুহূর্তের কামনার ধন, আমার প্রতি রহম করুন। বলতে থাকলাম, হে প্রভু, আপনার খাছ দরবারে বহন করে এনেছি অজস্র পাপরাশি, কোন হাদিয়া আনতে পারিনি। এ অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা করুন। এনেছি শুধু অশ্রুধারা যা আপনি পছন্দ করেন। এর উছিলায় আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। নিবেদন করলাম- হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করছি এবং দোজখ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

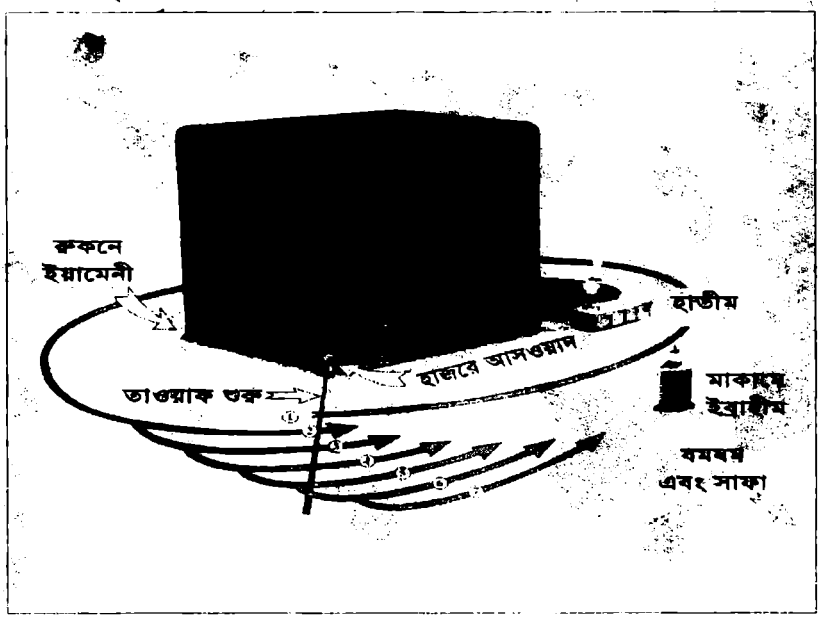

তওয়াফ শুরু করার স্থান

www.pathagar.com

হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু

এরই মধ্যে আমরা খানায়ে কা'বার চত্তরে এসে পড়লাম। সাথী দুজন সহ ডানদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদ রেখা / সবুজ বাতি বরাবর এসে পড়ে নিলাম - --- "বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।"

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রসূল।

উপরোক্ত দোয়া পড়ে আমরা দু'হাতের তালু দিয়ে হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করে দু'হাতে চুমু খেয়ে তওয়াফ শুরু করলাম।

কাল পাথর বা হাজরে আসওয়াদের বর্ণনায় আসা যাক

কাবা শরীফের পূর্ব কোণে হাজরে আসওয়াদ অবস্থিত। এই পাথর বহু মূল্যবান ও বরকতময়। এটি একটি বেহেশতী পাথর। নবী করিম (সঃ) এ পাথরটিকে চুমু দিয়েছেন। এতে চুমু দেয়ার ফজীলত অনেক বেশী। তাই হযরত ওমর (রাঃ) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ "আমি জানি তুমি একখানা পাথর, তোমার উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে তোমার গায়ে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি কখনও তোমাকে চুমু দিতাম না।"

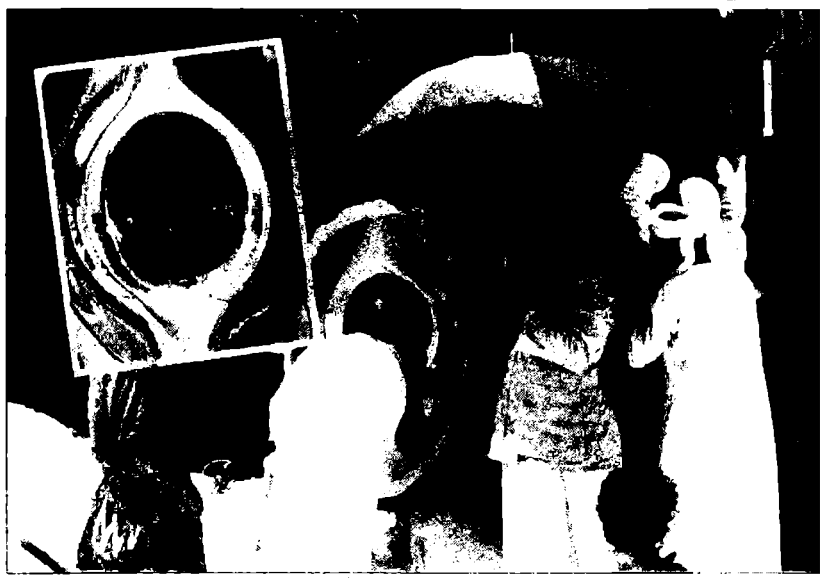

হাজরে আসওয়াদ

মূলতঃ এই পাথরকে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য করা। এই চুমু খাওয়া সুন্নত। তবে এটি ইসলামের বড় কোন খুঁটি নয়। তাই যারা হাজরে

www.pathagar.com

আসওয়াদের চুমুকে মূর্তি পূজার সাথে তুলনা করে তারা বিরাট ভুল করে। কেননা, মূর্তি পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে বিশেষ কোন লক্ষ্য হাসিল করা। দেবতার পূজায় সেজদা সহ আরো বহু অযৌক্তিক আচরণ প্রদর্শন করতে হয়। হাজরে আসওয়াদ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা এর পূজা করে না এবং এর কাছ থেকে দুনিয়ায় উপকার অপকার পাওয়ারও আশা করে না। মূর্তি পূজার মূল লক্ষ্য তাই। মুসলমানরা পাথরটিকে উপাস্য মনে করে এর পূজা করে না। পরকালের কিছু কল্যাণ লাভের জন্যে নবীর (সঃ) অনুসরনে, মুসলমানরা এতে চুমু খায়। হযরত ওমরের (রাঃ) উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে এটিই হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। হাজরে আসওয়াদের সম্মান এক জিনিস, আর এর পূজা ভিন্ন জিনিস।

কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই পাথরটি কাবার পূর্ব কোণে লাগান। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নবুওতের পূর্বে কোরাইশরা যখন কা'বা পূনঃ নির্মাণ করে, তখনও তিনি নিজ হাতে কা'বার দেয়ালে হাজরে আসওয়াদটি লাগিয়ে কোরাইশদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ আল-ফাকেহী তাঁর "আখবারে মক্কা" বইতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ দূর্বল। হাদীসটি হচ্ছেঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা ও নাপাকী এবং জালেম ও পাপিষ্ঠদের হাতের কালিমায় হাজরে আসওয়াদ কলুষিত না হত তাহলে এর মাধ্যমে সকল পঙ্গুত্বের চিকিৎসা হত এবং আল্লাহ প্রথম দিন একে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন হুবহু সেই আকৃতিতেই পাওয়া যেত। আল্লাহ এর রং পরিবর্তন করে এ জন্যেই কাল করে দিয়েছেন যে, দুনিয়াবাসী যেন বেহেশতের সৌন্দর্য (দুনিয়াতে বসেই) দেখতে না পায় এবং এটি যেন বেহেশতের মধ্যেই ফিরে আসে। এটি বেহেশতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি। হযরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তা কা'বা শরীফের স্থানে রেখে দিয়েছিলেন। তখন কা'বা ঘর ছিল না। তখন যমীন ছিল পবিত্র, এতে কোন গুনাহ সংঘটিত হত না।

এতে গুনাহ করার মত কোন অধিবাসী ছিল না। আল্লাহ হারাম সীমান্তের চারদিকে একদল ফেরেশতাকে সারি বেঁধে পাহারার কাজে নিয়োজিত করেন। তখন যমীনের অধিবাসী ছিল জ্বিন। এই পাথরের দিকে নজর করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। কেননা, এটি একটি বেহেশতী জিনিস, যে 'বেহেশতের দিকে নজর করবে সে তাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তির জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে তারই কেবল ঐ পাথরটি দেখা উচিত। ফেরেশতারা সবাইকে বিতাড়িত করতে থাকে এবং কাউকে তা দেখার অনুমতি দিচ্ছিল না।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় জিবরাঈল (আঃ) বেহেশত থেকে ঐ পাথরটি এনে দেন। তাই ঐ পাথরটি সাধারণ কোন পাথর নয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের শাসনামলে কা'বা শরীফে অগ্নিকান্ডের ফলে হাজরে আসওয়াদটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা ফেটে তিন টুকরো হয়ে যায়। এ জন্যে হযরত

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের পরে তাকে রূপা দিয়ে মুড়িয়ে দেন। এরপর হিজরী ৩১৭ সালের ৭ই জিলহজ্ব, হাজরে আসওয়াদ তার ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ক্রান্তি লগ্নে এসে পৌঁছে। ঐ সময় কারামতিয়া সম্প্রদায়ের জালেম শাসক আবু তাহের সোলায়মান বিন হাসান কারামতী হাজরে আসওয়াদকে খুলে নিয়ে যায় এবং কুফার জামে মসজিদের সাথে লাগিয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন হজ্বের জন্যে সেখানে যায়। দীর্ঘ বাইশ বছর পর আবুল কাসেম মুতিউ এবং কারুর মতে, আবুল আব্বাস ফজল বিন আল মোকতাদের ৩০ হাজার দীনারের বিনিময়ে তা পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনেন ও কা'বায় লাগিয়ে দেন।

হাদীস শরীফে হাজরে আসওয়াদকে 'বেহেশতী পাথর' বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'রোকনে আসওয়াদ' অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহীম বেহেশতের দুটো ইয়াকুত পাথর।'

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হাজরে আসওয়াদ হচ্ছে বেহেশতের পাথর।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'হাজরে আসওয়াদ বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছে।'

সহীহ ইবনে খোযায়মায় অন্য এক সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ শরীফেও পৃথক সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'হাজরে আসওয়াদ বেহেশতের পাথর।' ইমাম আহমদ, সাঈদ বিন মনসুর এবং হাকিমও এই হাদীসকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এটি সহীহ হাদীস। তাবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে এই হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে হযরত আনাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ ইবনে খোযায়মায় বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'হাজরে আসওয়াদ বেহেশতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি।' তিরমিজী শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'হাজরে আসওয়াদ বেহেশতের ইয়াকুত-পাথরের অন্যতম।'

উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, একাধিক হাদীস হাজরে আসওয়াদের বেহেশতী পাথর হওয়ার প্রমাণ বহন করে। হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব সমূহে এ সম্পর্কিত হাদীস গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনে খোযায়মা, সহীহ ইবনে হিব্বান, মোজাম আততাবরানী, সুনানে সাঈদ বিন মনসুর, আল্লামা আযরাকীর আখবারে মক্কা, আল্লামা ফাকেহীর আখবারে মক্কা ইত্যাদি। বিশেষ করে, তিরমিজী ইবনে হিব্বান, হাকেম ও ইবনে খোযায়মা বর্ণনাকারী হাফেজ হাদীসের সূত্রে, ঐ গুলোকে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। তাই সুন্নত ওয়াল জামাতের কেউ এসকল হাদীসের ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেন না। মতভেদ হচ্ছে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল নিয়ে। সেটি কি হযরত আদম (আঃ) এর সাথেই বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছিল, নাকি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কা'বা নির্মাণের সময়, এটাই হচ্ছে মতপার্থক্যের বিষয়।

তাবরানী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটির সনদ দূর্বল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ 'হযরত আদম (আঃ) এর নাযিল হওয়ার সময় হাজরে আসওয়াদও বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছিল।' হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর

www.pathagar.com

(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'হাজরে আসওয়াদ প্রথম আবু কোবাইস পাহাড়ে নাযিল হয়। সেখানে তা ৪০ বছর পর্যন্ত থাকে। তারপর তা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর লাগানো হয়' এই হাদীসটি মাওকুফ যা শুধুমাত্র সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। তবে এর সনদ সবল এবং রাবীরা বিশ্বস্ত।

ইবনে জহীরাহ আল মক্কী বলেছেন, যখন ইবরাহীম খলীল কাবা নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদের জায়গায় এসে পৌঁছেন তখন জিবরাঈল (আঃ) হাজরে আসওয়াদকে নিয়ে আসেন। কেউ বলেছেন, জিবরাঈল (আঃ) বেহেশত থেকে পাথরটি নিয়ে এসেছেন। কারুর কারুর মতে, জিবরাঈল (আঃ) আবু কোবাইস পাহাড় থেকে পাথরটি নিয়ে আসেন। কেননা, প্লাবনের সময় যখন সব কিছু ডুবে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ হাজরে আসওয়াদকে আবু কোবাইস পাহাড়ে আমানত রাখেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী শরহে বুখারীতে আবু জাহমের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আগেই হাজরে আসওয়াদ অবতীর্ণ হয়েছে। বন্যার সময় এটিকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তারপর ইবরাহীম (আঃ) এর কাবা শরীফ নির্মাণের সময় জিবরাঈল (আঃ) তা নিয়ে আসেন।'

উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ 'বেহেশত থেকে একজন ফেরেশতা হাজরে আসওয়াদটি অবতীর্ণ করেছেন। এ সকল হাদীসের মূল কথা হাজরে আসওয়াদ বেহেশতের একটি পাথর। কাজেই এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আলোচনা দ্বারা মূল বিষয়ে কোন অসুবিধে নেই।

হাজরে আসওয়াদ কাবা শরীফের পূর্ব কোণে মাতাফ থেকে দেড় মিটার উপরে অবস্থিত। আজকে আমরা যে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিচ্ছি কিংবা হাতে স্পর্শ করছি তা তার আগের আকৃতি ও অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। হাজরে আসওয়াদের বর্তমানে আটটি টুকরো দৃশ্যমান। বাকী অংশ গুলো দেখা যায় না। প্রতিটি টুকরো বিভিন্ন আকারের। বড় টুকরাটি খেজুরের সমান। হাজরে আসওয়াদের উপর পূর্বের জালেম শাসকদের আগ্রাসনের কারণে তা ভেঙ্গে গেছে। আগে তা একটি মাত্র পাথরই ছিল।

ঐতিহাসিক কুর্দী তাঁর আল কাওয়ীম গ্রন্থে লিখেছেন যে, হিজরী চৌদ্দ শতকের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের মোট ১৫টি টুকরা দৃশ্যমান ছিল। হাজরে আসওয়াদের ফ্রেম সংস্কারের সময় ভেতরের চূনার ভেতর এর কয়েকটি টুকরো ঢুকে গেছে। কেননা, ঐ চূনার মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদের টুকরোগুলোকে বসানো হয়েছে। সর্বদা এর উপর আতর ও অন্যান্য সুগন্ধি মাখার কারণে এ কাল রং আরো বেড়ে গেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই হাজরে আসওয়াদের অবশিষ্টাংশ কাবা শরীফের ভিত্তির ভেতরে ছিল। এর সামান্য কয়েকটি টুকরোই বর্তমানে গোচরীভূত হয়। সেই টুকরোগুলোও চূনার ভেতরে বসানো। সেই দৃশ্যমান টুকরোগুলো রূপার গোলাকার মোটা ফ্রেমের ভেতরে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পাথরে চুমু দিতে হয়।

বহু সংখ্যক হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস সমূহে হাজরে আসওয়াদের রং সাদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "হাজরে আসওয়াদ" শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কাল পাথর কিন্তু তা প্রথমে কাল ছিল না। পরে কাল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, মুসনাদে আহমদে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, 'পাথরটি বরফ থেকেও সাদা। আল্লামা আযরাকীর মতে, 'রূপার মত সাদা'। তিরমিজী শরীফে বলা হয়েছে, 'দুধের চেয়েও সাদা'। আল্লামা ফাকেহী বলেছেন, 'বরফের চেয়েও বেশী সাদা এবং ধবধবে।' পাথর যদি সাদা হয়ে থাকে তাহলে, তাকে 'হাজরে আবইয়াদ' না বলে 'হাজরে আসওয়াদ' বলা হয় কেন? আবইয়াদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাদা। এর জবাব স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই দিয়েছেন। তিরমিজী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ 'আদম সন্তানের গুণাহ্ই পাথরটিকে কাল করে দিয়েছে।'

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, এই হাদীসের সমর্থনে দ্বিতীয় কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। আল্লামা ফাকেহী ইবনে আব্বাসের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হাজরে আসওয়াদ বেহেশতের একটি পাথর। এটি বরফের চেয়েও সাদা ধবধবে ছিল। কিন্তু মোশরেকদের গুনাহ একে কাল করে দিয়েছে।' নাসাঈ এবং ইবনে খোযাইমাও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজী শরীফেও এটিকে বর্ণনা করে হাসান বলা হয়েছে। এই সাদা পাথরটির কাল হওয়া সম্পর্কে আরো অনেক বক্তব্য পেশ করা হয়। কিন্তু সহীহ হাদীসে এর যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তাই বেশী গ্রহণযোগ্য।

কিছু ঐতিহাসিক আগের কিছু সংখ্যক উলামার বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, তাঁরা নিজ চোখে হাজরে আসওয়াদের মধ্যে সাদা রং দেখেছেন। আল্লামা ইযযুদ্দিন বিন জামাআহ ৭০৮ হিজরীতে বলেছেন যে, আমি হাজরে আসওয়াদের মধ্যে একটি সাদা ফোটা দেখতে পেয়েছি এবং তা সকলেরই দেখার কথা। তারপর সেই সাদা ফোটাটি ক্রমান্বয়ে এবং পরিষ্কার ভাবে হ্রাস পেতে থাকে। আল্লামা ইবনে খলীল লিখেছেন যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের মাথার মধ্যে কাবার দরজা সংলগ্ন দিকে পরিষ্কার তিনটি সাদা জায়গা দেখেছেন। এর মধ্যে বড়টি হচ্ছে বড় ভূট্টার দানার মত। তিনি বলেন, তারপর আমি ঐ সাদা অংশগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং দেখি যে, সে গুলো সর্বদা হ্রাস পাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, পাথরের মাথা তথা এর উপরিভাগের রং টুকুই কাল। গোটা পাথরের ঐ মাথাটুকুই লোকদের জন্যে দৃশ্যমান। অবশিষ্টাংশ তো দেয়ালের ভেতরই ঢুকে আছে। কিন্তু সেই অংশটুকু যে সাদা সে ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবরণ রয়েছে। মুহাম্মদ বিন নাফে আল খোযায়ী' স্বচক্ষে হাজরে আসওয়াদকে দেয়াল থেকে খোলা অবস্থায় দেখেছেন। তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, এর উপরিভাগ তথা মাথাটুকুই কাল এবং বাকী অংশ সাদা।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাসান আবদুল্লাহ বাসালামাহ লিখেছেন যে, ১০৪০ হিজরীতে সুলতান মুরাদ খানের কা'বা সংস্কারের সময় আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন আলান আল মক্কী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নিজ চোখে খোলা হাজরে আসওয়াদকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদের যে অংশ দেয়ালের ভেতর রয়েছে তা সব টুকুই সাদা।

হাজরে আসওয়াদের রং সম্পর্কে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রথমে এর রং সম্পূর্ণ সাদা ছিল। ক্রমান্বয়ে এর মাথার রং টুকু কাল হয়ে গেছে। তাও হঠাৎ করে নয়। বরং

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে, দীর্ঘ দিন পর কাল হয়েছে। আদম সন্তানের গুনাহর কারণেই তা কাল হয়েছে। এর মাথার মধ্যেই চুমু দেয়া হয়। অবশিষ্টাংশ ভেতরে রয়েছে এবং সে অংশের রং এখন পর্যন্ত সাদাই রয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন, কতদিন পর্যন্ত ভেতরের অংশ টুকু সাদা থাকে।

হাজরে আসওয়াদের ১১টি বৈশিষ্ট্য ঃ

হাজরে আসওয়াদের বৈশিষ্ট্য ও মাহত্ব সম্পর্কে সহীহ হাদীস সমূহে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অনেক বক্তব্য এসেছে। তিনি হাজরে আসওয়াদের ফজীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন।

১। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) কে বলেছেন, হাজরে আসওয়াদে ৭০ জন ফেরেশতা আছে। তাঁরা হাত তুলে মুসলমান, মোমেন, রুকু-সেজদা দানকারী এবং তওয়াফকারীদের জন্যে গুনাহ মাফ চায়। হাদীসটির সনদ দূর্বল। (আলফাকেহী)।

২। হাজরে আসওয়াদকে মুখে চুমু দেয়া হয় কিংবা হাতে স্পর্শ করা হয়। বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) একে চুমু দিয়েছেন। বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে।

৩। হাজরে আসওয়াদটি বাইতুল্লাহ শরীফের সবচাইতে মর্যাদাবান জায়গায় তথা পূর্ব কোণে অবস্থিত। এটি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর তৈরি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪। এটি তওয়াফ শুরুর স্থানে অবস্থিত। প্রথমে এখান থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হয়।

৫। যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে যেন আল্লাহর হাতের সাথে হাত মিলায় এবং মোসাফাহা করে। এছাড়াও সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) কাছে বাইআত গ্রহণ করে। (ইবনে মাজাহ ও সাইদ বিন মনসুরের সুন্নাহ এবং আখবারে মক্কা-আযরাকী) 'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, যে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে, সে যেন আল্লাহর হাত স্পর্শ করল।

৬। প্রথমে হাজরে আসওয়াদের প্রকট আলো ছিল। পরে আল্লাহ ঐ আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। আহমদ, তিরমিজী, এবং ইবনে হিব্বান এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক হদীস উল্লেখ করেছেন।

৭। হাশরের দিন, হাজরে আসওয়াদ, তাকে চুমুদানকারী ব্যক্তিদের পক্ষে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে। তিরমিজী ও তাবরানীতে এ মর্মে হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

আলফাকেহী হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন এই পাথরটি এমনভাবে আসবে যে, সে তার দু'চোখে দেখবে, জিহ্বা দ্বারা কথা বলবে এবং যারা তাকে যথাযথভবে চুমু দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

৮। তাবরানী একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসের সনদটি দূর্বল। সেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, হাজরে আসওয়াদ সুপারিশ করবে এবং তাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।

৯। হাদীসে এসেছে ঃ 'হাজরে আসওয়াদ যমীনে আল্লাহর ডান হাত।' বিভিন্ন সনদে এ মর্মে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটিকে হাসান বলা হয়।

www.pathagar.com

১০। আল ফাকেহী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেছেনঃ 'কোন ব্যক্তি যদি ঘর থেকে ভাল করে অজু করে মসজিদে হারামে গিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয় তারপর তাকবীর, তাশাহুদ ও দরূদ পড়ে, মোমেন-মুসলমান নর-নারীর জন্যে দোয়া করে, আল্লাহর জেকের করে এবং দুনিয়ার কোন বিষয়ে স্মরণ না করে, তাহলে, আল্লাহ তাঁর প্রতি কদমের জন্যে ৭০ হাজার নেক লিখবেন, ৭০ হাজার গুনাহ মাফ করে দবেন এবং তাঁর মর্যাদা ৭০ হাজার গুণ বাড়িয়ে দেবেন। তারপর রোকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে পৌঁছলে, বেহেশতের বাগান সমূহের একটি বাগানের মধ্যে অবস্থান করবে এবং নিজ পরিবারের লোকদের জন্যে কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্যে তাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তারপর দু'রাকাত নামায পড়লে এবং ভাল করে রুকু সেজদা আদায় করলে, আল্লাহ্ তাঁর জন্যে আওলাদে ইসমাইলের ৬০টি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব দান করবেন।' এই বর্ণনাটির সনদ হাসান।

১১। আল্লাহ ঈমান ও ইসলামকে সব মুসলমানের কাছে আমানত রেখেছেন এবং এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে তাদের কাছ থেকে বাইআত নিয়েছেন। মানুষ এই নৈতিক অনুভূতির স্মারক কোন প্রতীকী জিনিস দেখতে চায়। আল্লাহ তাই এই পাথরটিকে বাইতুল্লাহ শরীফের কোণে প্রতীকী স্মারক হিসাবে স্থান দিলেন। এইটি দেখে এবং এতে চুমু দিয়ে মুসলমানরা অনুভব করবে যে, তারা আল্লাহর বাইআত গ্রহণ করছে এবং স্বীয় দায়িত্ব ও আমানত পালনের জন্যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছে।

অবশ্য এই হেকমতটি চিন্তা করলে বুঝা যায়। তবে এর মূল রহস্য হচ্ছে, জ্ঞান ও বিবেকের পরীক্ষা নেয়া; এর প্রতি মানব মনের সাড়ার প্রকৃতি জানা এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা অনুষ্ঠান। বান্দাহ, এর মূল কারণ জানুক বা না জানুক, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর ইবাদত ও হুকুম মানা জরুরী। তাই হাজরে আসওয়াদের অস্তিত্ব আল্লাহর সার্বিক আনুগত্য এবং এবাদতের অংশ বিশেষ।

হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া কঠিন কাজই বটে

হজ্বের মওসুমে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া একটি কঠিন কাজই বটে। তবে এ কাজ করতে গিয়ে কাউকে কোনভাবে কষ্ট দেয়া হলে সেটা হবে কবীরা গুণাহ। এক্ষেত্রে দূর থেকে ইশারায় হাজ্রে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং তার বিধানও রয়েছে। তবে ওমরার সময় জিয়ারতকারীর ভিড় কম থাকে বলে সহজেই হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ্, এবারের সফরে বলতে গেলে প্রতিদিনেই একাধিকবার হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

তওয়াফ ময়লা ও পাপমুক্ত করে

আমার অনুমান, মালিক তার বান্দাহকে ময়লা ও পাপমুক্ত করে নিজের নিকট টেনে আনার জন্যে, তাঁর দরবারে মেহমানের উপযুক্ত করে তোলার জন্যে এখানে অঝোর ধারায় ফজিলত ও বরকত নাযেল করেন। হাদীস শরীফে আছে, এখানে তওয়াফকারীদের জন্যে দিবা রাত্রি ৬০ টি রহমত নাযিল হয়। আমার মনে হয় হজ্ব ও

www.pathagar.com

ওমরার যত আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে তওয়াফ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলে পাক (সঃ) কে বলতে শুনেছি- 'যে ব্যক্তি হিসেব করে, এক সপ্তাহব্যাপী কা'বা শরীফ তওয়াফ করে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।' আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে আরো বলতে শুনেছি, "সেই ব্যক্তির প্রতি কদমে আল্লাহ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তার নেক লেখা হয়।" তিরমিজী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু হাতেম আরো একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেনঃ 'এর মাধ্যমে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।'

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলঃ 'আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে কাবার তওয়াফ করবে এবং দু'রাকাত নামায পড়বে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।' ইবনে হিব্বান ও আবু সাঈদ আল-জুনদী এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে জুনদী আরো একটু যোগ করেন, 'উত্তম গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।'

নাসাঈ শরীফে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলঃ 'যে সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করবে সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।' হাফেজ আবুল ফারাজ মুসীরুল গারামে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং এর সাথে অতিরিক্ত আরো যোগ করেছেন, 'এর পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ২ রাকাত নামায পড়ে, সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে মক্কায় আসার পর সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করা।' সম্ভবতঃ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সব কাজের আগে কাবা শরীফের তওয়াফ করতেন।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু' রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে। তার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।'

আমর তাঁর পিতা শোয়াইব থেকে এবং শোয়াইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি তওয়াফের নিয়তে ঘর থেকে বের হলে সে আল্লাহর রহমত পাওয়ার নিকটবর্তী হয়।

'সে যখন তওয়াফে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। তারপর প্রতি কদমের উঠা-নামার সাথে সাথে আল্লাহ তার পাঁচশ নেক লেখেন, পাঁচশ পাপ মোচন করেন এবং পাঁচশ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু' রাকাত নামায পড়লে সে সদ্য প্রসূত নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়, আওলাদে ইসমাইলের ১০টি গোলাম আযাদ করার বিনিময় পায় এবং হাজরে আসওয়াদের একজন ফেরেশতা তাকে স্বাগত জানায় এবং বলেঃ যেই কাজে তোমাকে

www.pathagar.com

স্বাগত জানানো হয়, সে কাজ পুনরায় কর। তবে যা করেছ তা অতীতের গুনাহ মাফের জন্যে যথেষ্ট এবং তার পরিবারের সত্তর জনের জন্যে সুপারিশ করা হবে।'

আমর তাঁর পিতা শোয়াইব থেকে এবং শোয়াইব নিজ পিতা আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেনঃ 'যে ভাল করে অজু করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্যে আসবে সে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করল। তারপর যখন চুমু দিল এবং নিম্মের দোয়াটি পড়ল তখন রহমত তাকে ঢেকে ফেলল। দোয়াটি হচ্ছেঃ 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

তার পর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করলে, তার প্রতি কদমে আল্লাহ সত্তর হাজার নেক লিখবেন, সত্তর হাজার গুনাহ মাফ করবেন, সত্তর হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার বংশের সত্তর হাজার লোকের জন্যে সুফারিশ করা হবে। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে দু'রাকাত নামায পড়লে আল্লাহ তার জন্যে আওলাদে ইসমাইলের ১৪জন গোলাম আযাদ করার সওয়াব লিখবেন এবং সে সদ্য প্রসূত নিষ্পাপ শিশুর মত গুনাহ মুক্ত হয়ে যাবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, একজন ফেরেশতা এসে বলবে, তোমার ভবিষ্যতের জন্যে আমল কর, যা করেছ তা অতীতের অপরাধের ক্ষমার জন্যে যথেষ্ট।'

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো, আমর তাঁর দাদার দিকে সম্মোধন করেছেন, সেগুলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেননি। আযরাকী উপরের ৪টি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। আবুল ফরজ তৃতীয় এবং চতুর্থটি এবং সাঈদ বিন মনসুর চতুর্থটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ ফেরেশতাদের নিকট তওয়াফকারীদের ব্যাপারে গর্ব করে থাকেন।' আবুজর এবং আবুল ফারাজ এটি মুসীরুল গারামে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ৫০ বার বাইতুল্লাহর তওয়াফ করে সে সদ্য ভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুর মত পাপমুক্ত হয়ে যায়। তিরমিজী এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "এটি গরীব হাদীস"।

ইমাম বুখারী বলেছেন, এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তবে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, এতে ৫০ সপ্তাহের কথা উল্লেখ আছে। কেননা, ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ বিন যোবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছেঃ 'যে বাইতুল্লাহর হজ্ব করে এবং ফিরে যাওয়ার আগে ৫০ সপ্তাহ তওয়াফ করে সে নিষ্পাপ শিশুর মত পাপমুক্ত হয়ে যায়।'

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, ৫০ সপ্তাহ একাধারে কিংবা পর্যায়ক্রমে তওয়াফ করতে হবে বরং এর অর্থ হল, তার গোটা জিন্দেগীর আমল নামায় মোট ৫০ সপ্তাহ তওয়াফের রেকর্ড থাকলেই চলবে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রতিদিন ও রাত, এই বাইতুল্লাহর প্রতি ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে ৬০টি হচ্ছে তওয়াফকারীদের জন্যে, ৪০টি হচ্ছে এই ঘরের নামাযীদের জন্যে এবং ২০টি হচ্ছে এই ঘরের প্রতি নজরকারীদের জন্যে।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) সাত সপ্তাহ রাতে এবং পাঁচ সপ্তাহ যাবত দিনে তওয়াফ করেছেন। তিনি তওয়াফের সময় এই দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে এই ঘরের আবাদকারী লোক তৈরী কর। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠান এবং বলেন, 'আমি তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে এই ঘরের আবাদকারী একজন নবী পাঠাবো; তাঁর নাম হবে ইবরাহীম। তাঁর হাতে আমি এই ঘর নির্মাণ করাবো, এর পানি পান করানোর সেবা আঞ্জাম দেব, তাঁকে এর হারাম ও হালাল এলাকা (হুদুদে হারাম) এবং এই ঘরের যথার্থ স্থান দেখাবো; তাঁকে এখানকার পবিত্র স্থানসমূহ এবং ইবাদতের বিধি বিধান শিখিয়ে দেবো।'

ফেরেশতারা বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, আমর বিন্ দিনার বলেছেন, আল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন কাজের জন্যে কোন ফেরেশতা পাঠাতে চাইলে, সেই ফেরেশতা আল্লাহর কাছে প্রথমে বাইতুল্লাহর তওয়াফের অনুমতি চায়। পরে সে ফেরেশতা আস্তে-ধীরে নেমে আসে। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ এই ঘর থেকে উপকৃত হও, এই ঘর দু'বার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তৃতীয়বারে তা তুলে নেয়া হবে।' (ইবনে হিব্বান)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এই ঘর উঠিয়ে নেয়ার আগে এবং এই ঘরের অবস্থান সম্পর্কে মানুষের ভুলে যাওয়ার পূর্বে, তোমরা এই ঘরের বেশী বেশী যিয়ারত কর; কোরআন উঠিয়ে নেয়ার আগে বেশী করে কোরআন তেলাওয়াত কর। তাঁকে লোকেরা প্রশ্ন করল, কাগজে লিখিত কুরআন তুলে নেয়া সম্ভব হলেও মানুষের মন থেকে কিভাবে তা তুলে নেয়া হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মানুষ রাতে অন্তরে কোরআন সহকারে থাকবে, সকাল বেলায় তাদের অন্তর থেকে কোরআন মুছে যাবে, এমনকি তারা তখন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এই কালেমাটিও ভুলে যাবে। তখন মানুষ আবার জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাবে এবং বিভিন্ন জাহেলী জিনিসের অনুসরণ করবে। (আযরাকী)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কা'বা শরীফ ও তোমাদের মাঝখানে বাধা সৃষ্টি হওয়ার আগে বেশী বেশী করে তওয়াফ কর। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন ইথিওপিয়ার ছোট কান বিশিষ্ট মাথায় টাকপড়া ও সরু পা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে কা'বার উপর বসে একে ধ্বংস করতে দেখতে পাচ্ছি।

ঈসা ইবনে মরিয়ম তওয়াফ করেছেন

ফাকেহী হযরত ওমর বিনখাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে তওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ করে তিনি থেমে গেলেন এবং মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ), আপনি থেমে গেলেন এবং মৃদু হাসলেন! তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার সাথে ঈসা বিন মরিয়মের দেখা হল, তিনি তওয়াফ করছেন এবং তাঁর সাথে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে। তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং আমি সালামের জবাব দিলাম।' এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কা'বার তওয়াফের জন্যে সবাই আগ্রহী।

তওয়াফ নামাযের সমতুল্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 'বাইতুল্লাহর তওয়াফ নামাযের সমতূল্য। সাবধান! তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে এই যে, এতে আল্লাহ কথা

www.pathagar.com

বলা জায়েয করেছেন, কেউ কথা বললে সে যেন ভাল কথা ছাড়া খারাপ কথা না বলে।'

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, হাজ্জাজ বিন আবি রোকাইয়া বলেন, আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলাম। তখন আমি ইবনে ওমর (রাঃ) কে দেখি। ইবনে ওমর বলেন, হে ইবনে আবি রোকাইয়া, বেশী বেশী তওয়াফ কর। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে এই ঘরের তওয়াফ করতে করতে পা ব্যথা করে ফেলেছে, বেহেশতে তার পা-কে আরাম দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।

ফাকেহী কাআ'ব থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনশত রসূল এই বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন, তাদের সর্বশেষ রসূল (সঃ)। এ ছাড়াও ১২ হাজার বুজূর্গ লোক এই ঘরের তওয়াফ করেছেন; তাঁদের কেউ তওয়াফে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোন কথা-বার্তা বলেননি। তাঁদের কেউ আসরের নামাযের পর এবং মাগরিবের আগে নামায পড়েননি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে হযরত আবু হুরাইরার প্রতি বলতে শুনেছি, হে আবু হুরাইরা! তুমি হয়তো তওয়াফে উদাসীন একটি দলকে দেখতে পাবে, তাদের সেই তওয়াফ কবুল হবে না এবং তাদের সেই আমলও উপরে যাবে না। হে আবু হুরাইরা! তুমি যদি তাদেরকে দলবদ্ধ দেখতে পাও, তাহলে, তাদের সেই দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিও এবং তাদেরকে বলে দিও এই তওয়াফ গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই আমল উপরে উঠবে না। (ফাকেহী)

মুসাফে' বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-হাজাবী বলেছেন, আমার ভাই বলেছেন যে, একবার আমি মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি একটি সোনার পাখী দেখলাম। পাখীটির মাথা সবুজ যমরুদ পাথরের তৈরি। সেটি যমযম কূপের বাতির উপর কা'বার দিকে মুখ করে বসেছে। সে বলল, হে আল্লাহর কা'বা! আমি তোমাকে কেন রাগান্বিত দেখতে পাচ্ছি? কা'বা উত্তর দিল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু আমি আমার চারপাশে যা দেখছি যদি নারী-পুরুষ তওয়াফকারী না থাকত তাহলে, আমি এমন জোরে নাড়া দিতাম যে আমার পাথরগুলো সংগৃহীত স্থানে পুনরায় ফিরে যেত। (ফাকেহী)

তওয়াফে ভাল কথা বলা এবং দোয়া করা কিংবা দোয়া শিখানো এগুলো জায়েয আছে। মুজাহিদ বলেন, আমি তওয়াফ করার সময়, ইবনে ওমর (রাঃ) আমার হাত ধরেন এবং আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেন।

ফাকেহী হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আসেন, কা'বা শরীফের ৭ চক্কর তওয়াফ করেন এবং পরে দু' রাকাত নামায পড়েন। এর ফলে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে তওয়াফ করা এবং দু'রাকা'ত নামায পড়ার সুন্নত চালু হয়।

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'আল্লাহর জিকির কায়েমের জন্যেই বাইতুল্লাহর তওয়াফের বিধান চালু করা হয়েছে। (ফাকেহী)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তওয়াফকারী মানুষের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে মানুষেরা! আল্লাহর হাম্‌দ ও তাকবীর বল। তওয়াফকারীরা ঐ কথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ-গান করলেন। (ফাকেহী)

www.pathagar.com

তওয়াকে কি পড়তে হবে

তওয়াফের সময় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেউ কেউ এটাকে তওয়াফের বেদআত বলেছেন। তবে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যায় নয়।

আ'তা বলেন, একবার হযরত আবদুর রহমান বিন আ'ওফ (রাঃ) তওয়াফ করেন এবং তওয়াফ থেকে অবসর নেয়ার আগ পর্যন্ত কারুর সাথে কোন কথা বলেননি। এক ব্যক্তি, তিনি তওয়াফে কি পড়েন তা জানার জন্যে, তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনি তওয়াফে শুধু এই দোয়াটি পড়েনঃ 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার' অনুসরণকারী ব্যক্তিটি বলল, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম। কিন্তু আপনি উপরোক্ত দোয়াটি ছাড়া তওয়াফে আর কিছুই পড়েননি। তখন তিনি উত্তর দিলেন, এই দোয়াটি কি সকল কল্যাণের উৎস নয়? (ফাকেহী)

তওয়াফের চক্করগুলো হিসাব রাখা দরকার। একবার হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে তওয়াফ করছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কত চক্কর হয়েছে? তার পর তিনি বললেন, আমি তোমাকে কেন সংখ্যা জিজ্ঞেস করেছি তা কি তুমি জান? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হল তুমি যেন তার হিসেব রাখ। (ফাকেহী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, কা'বা শরীফের ৭ চক্কর তওয়াফ করবে এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কু'য়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' এই দোয়াটি পড়া ছাড়া অন্য কোন কথা না বললে, তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, ১০টি নেক লেখা হবে এবং তার ১০টি মর্যাদা বাড়ানো হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তওয়াফ করার সময় কথা বলবে, সে ব্যক্তির উদাহরণ হল, সে রহমতকে পা দিয়ে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দেয় যেমন করে পা দিয়ে পানি ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়। (ফাকেহী)

ফাকেহী আবি ইয়াবিদ বিন আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম (আঃ) এর তওয়াফের সময় ফেরেশতারা এসে তাঁকে বলল, হে আদম! আমরা আপনার দু'হাজার বছর আগে এই ঘরের তওয়াফ করতাম। হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তওয়াফে কি পড়তেন? তাঁরা বললেন, আমরা তওয়াফে এই দোয়াটি পড়তামঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহু আকবর' তখন আদম (আঃ) বললেন, এর সাথে 'লা হাওলা ওয়ালা কু'য়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' এইটুকুও যোগ করুন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কা'বা নির্মাণের সময় ফেরেশতারা আসলেন এবং বললেন, হে ইবরাহীম! আমরা আপনার পিতা আদম (আঃ) কে বললাম যে, আমরা আপনার দু'হাজার বছর আগে কা'বার তওয়াফ করতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি দোয়া পড়তেন? আমরা উপরোক্ত দোয়ার কথা উল্লেখ করায় আরো কিছু যোগ করার কথা বলেন। ইবরাহীম (আঃ) আরো সামান্য যোগ করে বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইল আজিম।' এতটুকু পড়া দরকার। তখন থেকে তওয়াফে এই পূর্ণাঙ্গ দোয়াটি

www.pathagar.com

এই ভাবে পড়ার সুন্নত চালু হয়ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর লা হাওলা ওয়ালা কু'য়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইল আজিম।'

তওয়াফে আমি পড়েছি

সাত চক্করের জন্যে আলাদা আলাদা দোয়ার রেওয়াজ থাকলেও আমি পড়েছিঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কু'য়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আযিম, আস্‌সালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

লক্ষ্য করলাম, অধিকাংশ তওয়াফকারী উপরোক্ত দোয়াই পড়ছেন। কেউ কেউ মনে মনে,কেউবা শব্দ করে, কেউ একা, কেউবা দলে দলে। অনেকে আবার তওয়াফের নির্দিষ্ট দোয়া পড়ছেন, তাও আস্তে কিংবা জোরে জোরে। যারা গ্রুপে রয়েছেন, তাঁদের একজন প্রথমে বড় করে দোয়া পড়ছেন, দলের বাকীরা তাঁকে অনুসরণ করছেন।

এখানকার অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। সর্বাবস্থায় এবং সারাক্ষণই এখানে অবিরতভাবে পবিত্রতার ঝর্ণাধারা বইছে। আল্লাহপাকের ঘরকে কেন্দ্র করে উপস্থিত সবাই তওয়াফ করে চলেছেন। আল্লাহ পাকের মাগফিরাত এবং তার রাজী খুশীই সবার লক্ষ্য।

সবারই একই কামনা, একই বাসনা; সবারই মুখে আল্লাহর জেকের, রসূলে পাকের (সাঃ) উদ্দেশ্যে দরূদ ও সালাম, সবাই দু' হাতে ফায়েজ ও বরকত কামাই করছেন। কারও চোখে-মুখে কোন চিন্তা নেই, দুঃখ নেই, আতংক নেই। হিংসা বিদ্বেষ নেই। শুধু রয়েছে মাসুকের সাথে মিলনের উদ্গ্রীবতা। দুচোখ বেয়ে অনেকের দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। না, এ অশ্রু কোন শোক বা দুঃখের কারণে নয়-আনন্দাশ্রু, চরম চাওয়া পাওয়ার আনন্দ, মালিক মনিবের সাথে মিলনের আনন্দ, যা সকল মোমেনের প্রত্যাশার বস্তু। মালিক-মনিব তাকে আহ্বান করেছেন। সে আহ্বানে সে সাড়া দিয়ে এ পবিত্র অঙ্গনে হাজির। সে বলছে লাব্বায়েক ---------- আমি হাযির, মাওলা আমি হাযির ---------যেন বাক বিনিময় হচ্ছে বান্দাহ মনিবের মধ্যে। এহেন অনুভূতি এখানের আমন্ত্রিত এবং অংশগ্রহণকারীই কেবল উপলব্ধি করবেন।

জীবিত ও মৃতলোকের পক্ষ থেকে তওয়াফ করা যায়

আ'তা বিন আবি রেবাহ বলেছেন যে, জীবিত ও মৃত লোকের পক্ষ থেকে তওয়াফ করা যায়। আ'তা একটি গোলাম ক্রয় করেছিলেন। তিনি মসজিদে হারামে বসে থাকতেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে গোলামটিকে তওয়াফ করার নির্দেশ দিতেন।

হাম্মাদ বিন কিরাত বর্ণনা করেন যে, আমি ইবরাহীম বিন তোহমানকে সাত চক্কর তওয়াফ করতে দেখি। ইবরাহীম বলেন, এই তওয়াফ আমার বাপের জন্যে, পরে আরো সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করে বলেন, এটি আমার মায়ের জন্যে। (ফাকেহী)

হাম্মাদ বিন কিরাত বর্ণনা করেন যে, আমি ইব্‌রাহীম বিন তোহমানকে সাত চক্কর তওয়াফ করতে দেখি। ইব্‌রাহীম বলেন, এই তওয়াফ আমার বাপের জন্যে, পরে আরো সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করে বলেন, এটি আমার মায়ের জন্যে। (ফাকেহী)

আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে আমিও আমার জীবিত ও মৃত আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ কামনার্থে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তওয়াফ করেছি।

www.pathagar.com

রোকনে ইয়ামানীতে

ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তওয়াফের প্রতি চক্করে রোকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে পড়তে হয়, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকিনা আজাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা-আল আবরার। ইয়া আজিজু, ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

খানায়ে কাবার উপরোক্ত অংশ বড়ই মোবারক ও দোয়া কবুলের জায়গা। রোকনে ইয়ামানী কা'বার অত্যন্ত ফজিলত, বরকতময় ও সম্মানিত কোণ। বিষয়টি আমার বুঝতে বিলম্ব হয়েছে। অনেককে দেখেছি এখানে এসে হাজরে আসওয়াদের কোণের মতই হাত তুলে চুমু খেয়ে থাকেন, তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছি পরে।

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক তওয়াফে রোকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ত্যাগ করতেন না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও তাই করতেন।'

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে হাজরে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্যকিছুকে স্পর্শ কিংবা চুমু দিতে দেখিনি।'

উমাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে ওমরকে (রাঃ) বললাম, আপনি হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা কিংবা চুমু দেয়ার জন্যে কেন ভিড় করেন? আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবীদের মধ্যে কাউকে, ভিড়ের মধ্যে, এদুটোতে গিয়ে চুমু কিংবা স্পর্শ করতে দেখিনি। ইবনে ওমর (রাঃ) উত্তর দেন যে, আমি তা এ জন্যে করি যে, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ এ দুটোকে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়া হলে গুনাহ মাফ হয়।' উমাইরের (রাঃ) অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ভিড়ের মধ্যে নিজের চেহারাকে রক্তাক্ত করে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি উপরোক্ত জবাব দেন।

এ সব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করেছেন এবং এটাই সহীহ সুন্নত। তবে মতভেদ হচ্ছে একে চুমু দেয়ার ব্যাপারে এবং একে চুমু দেয়াটা মশহুর রেওয়ায়েতের খেলাফ। তবে ইবনে হাজার বুখারী শরীফের শরহ-ফতহুল বারীতে উল্লেখ করছেন যে, কারুর কারুর মতে, এতে চুমু দেয়া মোস্তাহাব।

ইবনে জহীরাই উল্লেখ করেছেন যে, কারমানী ইমাম আহমদের মত উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি এতে চুমু দিতেন।

এ ব্যাপারে কিছু সহায়ক হাদীস আছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতেন, তখন তিনি এতে চুমু দিতেন।"

ইবনুল কাইয়ুম হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছেঃ "রসূলুল্লাহ (সঃ) রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দিতেন এবং এর উপর নিজের গাল রাখতেন।"

www.pathagar.com

হাকেম তাঁর মোসতাদরাতে এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এখানে 'রোকনে ইয়ামানী' অর্থ হচ্ছে, 'হাজরে আসওয়াদ।' কেননা, হাদীসের পরিভাষায় উভয় রোকনকে এক সাথে বলা হয় "দুই রোকনে ইয়ামানী"। অথচ রোকনে ইয়ামানী দুটো নয়, একটি। অপরটি হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ। হযরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) শুধুমাত্র হাজরে আসওয়াদকেই চুমু দিয়েছেন। এই হাদীসের কারণেই এই ব্যাখ্যা করা হল।

আল্লামা ফাসী শেফাউল পারামে লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেয়ার বিষয়টি সহীহভাবে প্রমাণিত নয়।

রোকনে ইয়ামানীতে ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন

রোকনে ইয়ামানীর অনেক ফজীলত আছে। এর প্রথম ফজীলত হচ্ছে, এটি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর যথার্থভাবে মওজুদ আছে। রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকী হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর নেই। সে অংশে কাবাকে সংকুচিত করে তৈরি করা হয়েছে।

ফাকেহী হযরত আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলেন 'হে আবু হুরায়রা, আল্লাহ যেদিন থেকে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন সেই দিন থেকে যে দিন এই ঘরকে উঠিয়ে নেবেন, সেই দিন পর্যন্ত রোকনে ইয়ামানীতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে এবং থাকবে। যে ব্যক্তি এই পাথর স্পর্শ করবে কিংবা এর প্রতি হাত দিয়ে ইশারা করবে এবং বলবে ঃ "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকিনা আজাবান্নার" সেই ফেরেশতাটি আমীন বলবে। ফেরেশতার দোয়া কবুল হয়।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রোকনে ইয়ামানীতে ৭০ জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। যে এই দোয়াটি পড়বেঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা আফু ওয়াল আফিয়াতি ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ্ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্কিনা আজাবান্নার"। 'ফেরেশতারা আমীন বলবে।'

রোকনে ইয়ামানীতে দোয়া কবুল হয়

ইবনে আবিদ দুনিয়া শাবী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাবী বলেছেন, একদিন আমি, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, মোসআব বিন যোবায়ের এবং আবদুল মালেক বিন মারওয়ান কাবা শরীফের পাশে বসা ছিলাম। আলোচনা শেষে সবাই বলল যে, এখন একজন একজন করে সবাই রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে দোয়া করবে। আল্লাহ নিজের কুদরত থেকে দান করেন। বলা হল, হে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের। প্রথমে, আপনি উঠুন। আপনি হিজরতের পর প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তান। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আপনি মহান, মহান কিছুই আপনার কাছে চাওয়া হয়, আমি আপনার চেহারা, আরশ এবং কা'বার সম্মানের উছিলায় প্রার্থণা করছি, আমাকে হেজাযের ক্ষমতা এবং খেলাফত না দিয়ে মৃত্যু দেবেন না। তিনি এসে বসলেন। তারপর লোকেরা বলল, হে মোস'আব বিন যোবায়ের! এবার আপনি উঠুন। তিনি

www.pathagar.com

উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী ধরে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ সব কিছুর প্রতিপালক! সব কিছু আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী, সব কিছুর উপর আপনার বিদ্যমান কুদরতের দোহাই দিয়ে প্রার্থণা জানাই, আমাকে ইরাকের ক্ষমতা দান এবং সোকাইনা বিনত হোসাইনকে বিয়ের আগ পর্যন্ত মৃত্যু দেবেন না। তিনি এসে বসলেন। তারপর লোকেরা বলল, হে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান, এবার আপনি যান। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ, আপনি সাত আসমান ও যমিনের প্রতিপালক, আপনার আদেশের অনুগত লোকেরা যা দোয়া করে আমিও তাই চাচ্ছি, আমি আপনার চেহারার সম্মান, সমস্ত সৃষ্টির উপর আপনার অধিকার এবং বাইতুল্লাহর তওয়াফকারীদের অধিকারের দোহাই দিয়ে প্রার্থণা করি আমাকে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের ক্ষমতাদানের আগে মৃত্যু দেবেন না। কেউ এর বিরোধিতা করলে শিরচ্ছেদের পর তার মাথা যেন আমার কাছে হাজির করা হয়। তিনি আসলেন এবং বসলেন। লোকেরা বলল, হে আবদুল্লাহ বিন ওমর, আপনি উঠুন। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ আপনি মেহেরবান, দয়ালু। আমি আপনার গযবের উপর বিজয়ী রহমত কামনা করি; সমস্ত সৃষ্টির উপর আপনার অধিকারের দোহাই দিয়ে প্রার্থণা করি, বেহেশত ওয়াজিব করার আগে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবেন না। শা'বী বলেছেন, আমি দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আগে দেখেছি, উপরোক্ত ব্যক্তিরা যে যা চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন। এমন কি, আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে বেহেশতও দেখানো হয়েছে। শা'বী বলেছেন, এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা।

আযরাকী তাঁর 'আখবারে মক্কা' বইতে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) যখনই রোকনে ইয়ামানীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছেন, তখনই একজন ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বলেছেঃ 'হে মুহাম্মদ, স্পর্শ কর।' হাদীসটির সনদ দূর্বল। আযরাকী বলেছেন যে, হোসাইন মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি রোকনে ইয়ামানীতে হাত রেখে দোয়া করে তার দোয়া কবুল হয়। হোসাইন প্রস্তাব করল, হে আবুল হাজ্জাজ (মুজাহিদ), আমাদেরকে নিয়ে সেখানে দোয়া করুন; পরে আমরা সকলে দোয়া করলাম।' মুজাহিদ ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী' এবং সুযোগ্য জ্ঞানী, আল্লাহ ও মর্যাদার অধিকারী। এই একই সনদে মুজাহিদের আরেকটি বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, রোকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে ৭০ হাজার ফেরেশতা মওজুদ রয়েছে। কা'বা শরীফ সৃষ্টির পর থেকে এযাবত ঐ ফেরেশতারা কখনও ঐ জায়গা ত্যাগ করে না।' এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের আগে বর্ণিত হাদীসটিও সহায়ক।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ 'রোকনে ইয়ামানীতে দু'জন ফেরেশতা আছেন। তাঁরা দোয়াকারীদের জন্য আমীন বলেন এবং হাজরে আসওয়াদে আছে অগণিত ফেরেশতা।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দু' রোকন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানীর মাঝখানে একটি কূপ আছে এবং এর উপর ৭০ হাজার ফেরেশতা

www.pathagar.com

আছে। দোয়াকারীদের জন্যে তারা আমীন বলে। কেউ দোয়া করতে ভুলে গেলে তারা বলে, 'হে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে মাফ কর।'

উপরোক্ত হাদীসগুলোর সনদ দূর্বল হলেও সেগুলো মিথ্যা হাদীস নয়। মোট কথা, অনেকগুলো সহীহ ও দূর্বল হাদীস দ্বারা বর্ণিত রোকনে ইয়ামানীর ফজীলত এবং মর্যাদার প্রমাণ। তবে এই সকল হাদীসে যে সব বৈপরীত্য আছে সেগুলো অনুধাবন করা দরকার। একবার এক ফেরেশতা, একবার ২ ফেরেশতা, একবার ৭০ ফেরেশতা, আরেকবার ৭০ হাজার ফেরেশতা মওজুদের বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। বহু আলেম ঐ বৈপরীত্য দূর করার চেষ্টা করে গেছেন।

রোকনে ইয়ামানীর আরেকটা বিশেষ ফজীলত আছে। তবে এটি বেশী মশহুর নয়। সেটি হচ্ছে, রোকনে ইয়ামানী কিয়ামতের দিন, তাকে যারা স্পর্শ করেছে তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। কিছু সংখ্যক বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানীকে দুই চোখ, দুই জিহ্বা ও দুই ঠোঁট সহকারে উঠাবেন। তারা তাদের গায়ে চুমুদানকারী ও স্পর্শকারীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন রোকনে ইয়ামানী আবু কোবাইস পাহাড়ের চেয়েও আরো বড় আকৃতিতে উপস্থিত হবে; এর দু'টো জিহ্বা ও ঠোঁট থাকবে।'

ইবনে জহীরা শা'বী থেকে উপরে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, তাঁর ভাই মোসআব, আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এর কা'বার পাশে বসা সংক্রান্ত ঘটনাটি সামান্য পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি সবশেষে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের বেহেশতের সুসংবাদের প্রশ্নের ব্যাপারে সুন্দর ২টি জবাব দিয়েছেন। ১ম জবাবটি হচ্ছেঃ তিনি বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, ইবনে ওমর শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অপরদিকে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এইটা দ্বারা পরীক্ষিত লোকেরা জান্নাতে যাবে।"

২য় জবাবটি হচ্ছেঃ বাকী তিনজনের দোয়া যখন কবুল হয়েছে তখন আবদুল্লাহ বিন ওমরের দোয়া কবুল হওয়া আরো বেশী প্রণিধানযোগ্য। কেননা, তিনি আল্লাহর দান ও রহমত পাওয়ার বেশী যোগ্য ছিলেন। তিনি আমল ও তাকওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ লাভের ব্যাপারে এ দু'টো প্রমাণই যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকীকে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ঐ দু'টো রোকনকেও স্পর্শ করতেন। বুখারী শরীফে এসেছে যে, হযরত মুয়াওয়িয়া (রাঃ) রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকীকে স্পর্শ করতেন। ফাকেহী আবুত্ তোফায়েল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত মুয়াওয়িয়া (রাঃ) কে সব রোকন বা কোণ স্পর্শ করতে দেখেছেন।

আবি শা'বা বর্ণনা করেছেন যে, আমি হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ) কে কাবা শরীফের সকল কোণ চুমু দিতে বা স্পর্শ করতে দেখেছি। হযরত আবদুর রহমান বিন

www.pathagar.com

আউফ (রাঃ) তওয়াফের সময় সকল কোণ স্পর্শ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ও সকল কোণ স্পর্শ করতেন।

তবে রসূলুল্লাহ (সঃ) রোকনে শামী এবং রোকনে ইরাকীকে স্পর্শ করেননি কিংবা চুমুও দেননি। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই কোণ দু'টি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোরাইশরা ঐ অংশে কাবা শরীফকে সংকুচিত করে তৈরি করেছে। এ ছাড়াও সে কোণগুলোর কোন ফজীলত পৃথকভাবে বর্ণিত হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঠিক আনুগত্য ও অনুসরণ করার কারণেই এ কোণ দু'টি স্পর্শ করা কিংবা চুমু দেয়া ঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়ালী বিন উমাইয়া তাঁর বাপের এক ঘটনা উল্লেখ করেন। উমাইয়া বলেন, আমি হযরত ওমর বিন খাত্তাবের সাথে তওয়াফ করেছি। তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেন। তারপর তওয়াফের সময় রোকনে ইরাকীর কাছে গেলে আমি একে স্পর্শ করতে চাইলাম তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি করতে চাও?

আমি জবাব দিলাম, আপনি কি একে স্পর্শ করবেন না? তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে তওয়াফ করনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি ঐ কোণ্ দু'টিকে স্পর্শ করেছেন কিংবা চুমু দিয়েছেন? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহর জীবনে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত নেই? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেই আদর্শকেই বাস্তবায়ন কর।

হযরত ইবনে ওমর রোকনে শামীকে স্পর্শ করেছেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে সে প্রসঙ্গে নাফে'কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আমরা তাঁকে মাত্র ১ বারই দেখেছি যে তিনি একে স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরে আবার হাত গুটিয়ে আনেন। তারপর বলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি ভুল করেছি। (ফাকেহী)

আবুত তোফায়েল বলেন যে, একবার আমি ইবনে আব্বাস এবং মুয়াওয়িয়া (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। মুয়াওয়িয়া (রাঃ) তওয়াফের সময় যখনই কোন কোণে যেতেন তখনই সেটাকে স্পর্শ করতেন। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রোকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত আর কোন রোকনকে স্পর্শ করেননি কিংবা চুমুও দেননি।

তখন মুয়াওয়িয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর ঘরের কোন অংশই পরিত্যাজ্য নয়।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস এক ব্যক্তিকে রোকনে শামী এবং ইরাকীকে স্পর্শ করতে দেখে বলেন, তুমি কেন এই রোকন দু'টিকে স্পর্শ করছ? সেই ব্যক্তি জবাবে বলল, আল্লাহর ঘরের কোন অংশ পরিত্যাজ্য নয়। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ। রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও ঐ রোকন দু'টোকে স্পর্শ করেননি। তখন ঐ ব্যক্তি ঐ রোকন দু'টি স্পর্শ করা থেকে বিরত হল।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) 'আল্লাহর ঘরের কোন অংশ পরিত্যাজ্য নয়'-এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা আল্লাহর ঘরকে পরিত্যজ্য করার উদ্দেশ্যে ঐ রোকন দু'টো স্পর্শ থেকে বিরত হইনি। আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করলে কোন অংশকে ত্যাগ করা হয় না এবং তা পরিত্যাজ্যও হয় না। আমরা সুন্নাহ্র অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই ঐ দু'টো রোকনের স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকি। যদি ঐ

www.pathagar.com

দু'টো রোকনকে স্পর্শ না করার নাম পরিত্যাগ হয়, তাহলে দুই রোকনের মধ্যবর্তী স্থানগুলোও কি পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে? কেননা, সেগুলোও তো স্পর্শ করা হয় না। অথচ এটা কারুর প্রশ্ন বা বক্তব্য নয়।

মাকামে ইবরাহীমে

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে দু'রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়ে নিলাম। এ সময় মনে পড়ছিল ইবরাহীম (আঃ) এর নজীর বিহীন আত্মত্যাগ এবং অবিস্মরণীয় মোজেজাসমূহের কাহিনী।

মাকামে ইবরাহীমের উপর ইবরাহীম (আঃ) এর দুটি পায়ের দাগ এখনো সুস্পষ্ট। বর্তমানে তামার তৈরী একটি গম্বুজাকৃতি বেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত। অনেক হাজী ফজিলত ও বরকতের জন্যে বেষ্টনীটি স্পর্শ করে গায়ে হাত লাগান। ডিউটিরত পুলিশের বাধা তাঁদেরকে এ কাজে বিরত রাখতে পারেনা। কাজটি যে অত্যন্ত গর্হিত তা তাঁরা ভেবে দেখেন না। "মাকামে ইবরাহীম আল্লাহপাকের বিশেষ নিদর্শন এবং ইবরাহীম (আঃ) এর একটি মোজেজা।"

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন ঃ 'স্মরণ কর, আমরা যখন বাইতুল্লাহকে লোকদের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে তৈরি করেছি; এবং নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়।'

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উপরোক্ত আয়াতে মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন; এর ফলে, মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা অনেক বেশী।

হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে ইসলামিয়ার জন্যে দুটো অতি প্রাচীন নিদর্শন। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া এ জাতীয় প্রাচীন নিদর্শন অন্য কোন জাতির নেই। এর একটিকে তওয়াফ শুরুর জায়গায় এবং অপরটির কাছে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে এগুলোকে চিরস্মরণীয় করে দেয়া হয়েছে। তিরমিজী শরীফে আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয়ই হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের দুটো ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ এই দুটো পাথরের নূর মিটিয়ে দিয়েছেন। নূর না মিটালে, এগুলোর আলোতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ভূখন্ড আলোকোজ্জল হয়ে যেত।'

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন, জিবরাঈল (আঃ) মাকামে ইবরাহীমকে নিয়ে এসে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের নীচে রেখে দেন।

মাকামে ইবরাহীম বলতে কি বুঝায়

মাকামে ইবরাহীম বলতে কি বুঝায় তা নিয়ে উলামায়ে কেরাম এবং মুফাসসেরীনদের মধ্যে মতভেদ আছে। বেশী নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে, কোরআনে মাকামে ইবরাহীম বলতে সেই ঐতিহাসিক পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। তিনি যখন উপরে উঠতেন, পাথরটিও আল্লাহর কুদরতে উপরে উঠত। কেননা, দেয়ালের উঁচু অংশ তৈরির সময় তাকে উপরে উঠতে হয়েছিল। হযরত ইসমাইল (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) এর পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আঃ) নিজ হাতে সেই পাথর দেয়ালের উপর বসিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচু দেয়াল তৈরি করেন। একদিক শেষ হলে, অন্যদিকে যেতেন এবং বাকী দিকগুলোর দেয়াল

www.pathagar.com

নির্মাণ করার আগ পর্যন্ত পাথরটি ইবরাহীম (আঃ) কে নিয়ে কাবার চারপাশে চক্কর লাগাত। এটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রকাশ্য মোজেযা। এই পাথরটি যেখানে রাখা হয়েছে তার কাছে নামায পড়ার জন্যে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে জারীর তাবারী মুজাহিদ থেকে তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনে বর্ণিত 'মাকামে ইবরাহীম' বলতে 'গোটা হারাম এলাকাকে বুঝায়। তাবারী ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা বিন আবি রেবাহ এবং শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের মতে এর অর্থ হচ্ছে 'হজ্বের স্থান সমূহ।' হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ), জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাসের অন্য এক রেওয়ায়েতে, কাতাদাহ ও সুদ্দীর মতে এই আয়াতে বর্ণিত মাকামে ইবরাহীম বলতে, কাবা নির্মাণের সময় ব্যবহৃত পাথরটিকেই বুঝানো হয়েছে।

এই কথার সমর্থনে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হজ্বের ব্যাপারে জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ বহন করে। হাদীসটির অর্থ হচ্ছে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাওয়াফ শেষ করেন, তখন ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, এটা কি আমাদের পিতার (ইবরাহীমের) মাকাম? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। তারপর ওমর (রাঃ) আবারও জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি এখানে নামায পড়বো না? তখন কোরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মাকামে ইবরাহীম বলতে, সেই ঐতিহাসিক পাথরটিকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, এটা কি আমাদের পিতা ইবরাহীমের মাকাম নয়? তিনি উত্তরে বলেন; হ্যাঁ। ওমর আবারও প্রশ্ন করেন, আমরা কি এখানে নামায পড়বো না? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাকে কোন আদেশ দেয়া হয় নি। কিন্তু সূর্যাস্তের আগেই তখন উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন। তারপর তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন এবং অবশিষ্ট ৪ চক্করে স্বাভাবিকভাবে চললেন। পরে মাকামে ইবরাহীমের কাছে এসে পড়লেন ঃ ওয়াত্তাখেজু মিন্ মাকামি ইবরাহীমু মুচাল্লা। তারপর তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও কাবার মাঝখানে রেখে দু'রাকাত নামায পড়লেন।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তিন বিষয়ে আমার রবের সাথে কিংবা আমার রব তিন বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ। আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়তেন! তখন ঐ আয়াতটি নাযিল হয় যে, তোমরা মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়। এইটি একটা লম্বা হাদীসের অংশ বিশেষ।

উপরোক্ত ৪টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাকামে ইবরাহীম বলতে সেই ঐতিহাসিক পাথরটিকেই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও ৫ম প্রমাণ হচ্ছে, আইয়ামে জাহেলিয়াত থেকে ইসলামী যুগ পর্যন্ত এবং আজ পর্যন্তও মাকামে ইবরাহীম বলতে মক্কার লোকেরা ঐ

www.pathagar.com

পাথরটিকেই বুঝে থাকেন। ৬ষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের সাথে গোটা হারাম এলাকায় নামায পড়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ৭ম প্রমাণ হচ্ছে, তখনকার এই নরম পাথরটিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের ছাপ লেগেছে। এ জন্যে এই পাথরটিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দিকে সম্বোধন করে মাকামে ইবরাহীম বলাটা বেশী যুক্তিযুক্ত। ৮ম প্রমাণ হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উপর দাঁড়িয়ে গোসল করেছেন বলে এক হাদীসে এসেছে। তাই এটিকে ইবরাহীম (আঃ) এর দাঁড়াবার স্থান বা মাকাম বলা হয়। কেননা, মাকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে দাঁড়াবার স্থান।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই পাথরকে কি কাজে ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তিনি এর উপর নিজ মাথা ধুয়েছেন। কারুর মতে, তিনি এর উপর নিজ পা ধুয়েছেন। এই সব তথ্যের ভিত্তিতেও একে মাকামে ইবরাহীম বলা যায়। তবে তিনি এর উপর দাঁড়িয়ে যে কাবা নির্মাণ করেছেন এটিই বেশী নির্ভরযোগ্য। মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যে তাওয়াফ শেষে দু' রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়তে হবে। সুন্নত হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম ও কা'বা শরীফকে সামনে রেখে নামায পড়তে হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই ভাবেই মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়েছেন। তবে হুবহু মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রাখতে হবে কিংবা সেই সোজা বরাবর পেছনে দাঁড়াতে হবে এটা জরুরি নয়। কেননা, মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি এত ছোট যে, একজন মুসল্লীও এর পেছনে হুবহু দাঁড়াতে পারেনা। তাই এর নিকটবর্তী জায়গায় তওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায পড়লেই চলে। ৫ ওয়াক্ত নামাযের জামাতের সময় ইমাম সাহেবের মাকামে ইবরাহীমের পেছনেই দাঁড়ানো উত্তম। অবশ্য প্রয়োজনে, যেমন ভিড়ের কারণে, নামাযের জায়গা বৃদ্ধির জন্যে মাকামে ইবরাহীমের সামনে অর্থাৎ কাবার দেয়ালের সাথে লেগে দাঁড়ালেও কোন আপত্তি নেই।

মাকামে ইবরাহীমে- ইবরাহীমের (আঃ) পায়ের দাগ বসে আছে

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মো'জেযার কারণে, তাঁর পায়ের নীচের পাথরটি ভিজে এতে তাঁর পায়ের দাগ বসে যায়। কা'বা তৈরির পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর পায়ের ছাপ এতে লেগে আছে। যদিও মানুষের মসেহ অর্থাৎ হাতের স্পর্শে যুগ যুগ ধরে এর আসল রূপ বা ছাপ অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ ৪ হাজার বছর পর্যন্ত কোন জিনিসকে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাতে স্পর্শ করলে, সেই জিনিসটি তার আসল রূপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকা মুশকিল। তামা ও আয়নার তৈরি বাক্সে রাখার আগ পর্যন্ত, মানুষ তা হাতে ধরে দেখত এবং তাতে হাত মুছে বরকত হাসিল করার চেষ্টা করত। যদিও এতে মসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং আদেশ দেয়া হয়েছিল এর পাশে বা পেছনে নামায পড়ার জন্যে।

পূর্বের সকল দর্শকরাই এই পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের দাগ বা চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। আবদুল্লাহ বিন ওহাব হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস বলেন, আমি মাকামে ইবরাহীমে ইবরাহীম (আঃ) এর আঙ্গুল

www.pathagar.com

ও তাঁর পায়ের পাতার মধ্যবর্তী অংশের দাগ দেখেছি। কিন্তু মানুষের হাতের স্পর্শে ক্রমান্বয়ে তার চিহ্ন লোপ পেতে থাকে।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের মূর্তি ও পাথর পূজার সময়ে লোকেরা হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের পূজা করেনি। হারাম সীমানার ভেতরের পাথরের মর্যাদা তাদের কাছে অনেক বেশী ছিল। তারপরও তারা এই দুটো পাথরের পূজা না করায় বুঝা যায় যে, এগুলোর শাশ্বত ও চিরন্তন মর্যাদা অক্ষুণ্ন আছে এবং পাথর ও মূর্তি পূজার প্রভাব থেকে এ দুটো পাথর সম্পূর্ণ মুক্ত আছে। তাই, যারা অভিযোগ করে যে, এই দুটো পাথরের মর্যাদা দিয়ে ইসলাম পাথর ও মূর্তিপূজার সাথে কিছুটা আপোস করেছে, তাদের ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, স্বয়ং মূর্তি পূজার সময়ও এগুলোর পূজা না করে, প্রাচীন কাল থেকেই যখন এ গুলোকে সম্মান করে আসা হচ্ছে, তখন ইসলাম তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মূর্তি পূজার সাথে তার আপোস করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইবরাহীম (আঃ) হজ্বের জন্যে ডাক দিয়েছেন

হাজীরা মায়ের পেট থেকে সাড়া দিয়েছেন

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) কে মাকামে ইবরাহীমের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন, মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি বর্তমানে যা আছে তাই ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে বিশেষ নিদর্শন বানাতে চেয়েছেন। আল্লাহ যখন ইবরাহীম (আঃ) কে লোকদের প্রতি হজ্বের আহবান জানানোর নির্দেশ দেন তখন তিনি এই পাথরের উপর দাঁড়ান। পাথরটি তাকে নিয়ে সর্বোচ্চ পাহাড়ের সমান উঁচুতে উঠে। তিনি বলেন, হে লোকেরা, তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও। লোকেরা সাড়া দিয়ে বলল ঃ 'আমরা হাজির। হে আল্লাহ! আমরা হাজির। তখন পাথরটির উপর তাঁর পায়ের দাগ পড়ে যায়। তিনি ঐ কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর পাথরটিকে তাঁর সামনে রাখার জন্যে নির্দেশ দেন এবং পাথরটিকে সামনে রেখে তিনি বাবুল কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়েন।

ইবনে জরীর হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ শেষ করার পর আল্লাহ তাঁকে মানুষের প্রতি হজ্বে আসার আহবান জানানোর নির্দেশ দেন। তখন তিনি উচুঁতে উঠেন এবং বলেন, হে লোকেরা। তোমাদের রব তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরি করেছেন, তোমরা সেই ঘরের হজ্ব কর এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও। মানুষ তখন বাপের পৃষ্ঠদেশ এবং মায়ের পেট থেকে সাড়া দিয়ে বলেছে, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিলাম। হে আল্লাহ, আমরা হাজির। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আজ যারা হজ্ব করে তারা সবাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ডাকে কম বেশী সাড়া প্রদানকারী।

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, বোরাইদা বলেন, তিনি একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর ৪২ জন সাহাবীর সাথে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায পড়ছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। নামায শেষে তিনি নিজের ও কাবার মাঝে অবস্থিত স্থান থেকে কিছু একটা ধরার উদ্দেশ্যে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে আসলেন। তাঁরা সবাই উঠে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে হাতের ইশারায় বললেন, তোমরা সবাই বস। তাঁরা সবাই বসলেন। নবী করিম (সঃ) প্রশ্ন করেন, আমি নামায শেষে আমার ও কাবার মাঝখানের স্থান থেকে কিছু একটা ধরার জন্যে ঝুঁকেছিলাম, তা কি তোমরা দেখেছ? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমার সামনে বেহেশত পেশ করা হয়েছিল। আমি এতে এমন কল্যাণ, সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্যজনক জিনিস সমূহ দেখেছি, যা আর কোথাও দেখিনি। আমার পাশ দিয়ে এমন একটি সুন্দর আঙ্গুরের ছড়া অতিক্রম করেছে যা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি তা ধরার জন্যে চেষ্টা করি, কিন্তু তা আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল। যদি আমি তা ধরতে পারতাম তাহলে তোমাদের সামনে আমি তা মাটিতে পুঁতে চাষ করতাম এবং তোমরা বেহেশতের ফল খেতে পারতে।

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা ও গুরুত্ব কত বেশী তা ফুটে উঠেছে।

মাকামে ইবরাহীমের পাথর দেখতে কেমন

মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি নরম এবং জলীয় পদার্থপূর্ণ পাথরশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তা কঠিন পাথরশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নয়, যাতে লোহা দিয়ে আঘাত দিলে আগুন বের হয়। পাথরটি বর্গাকৃতির এবং এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় একহাত।

মক্কার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হোসাইন বা সালামাহ বলেন, 'আমি ১৩৩২ হিজরীতে কা'বা শরীফের চাবি রক্ষক মুহাম্মাদ সালেহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মাদ শায়বীর বিশেষ অনুমতিক্রমে তাঁর সাথে মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি দেখি। সেটি রূপার তৈরী বিশেষ কেসের মধ্যে রাখা হয়েছে। পাথরটি বর্গাকৃতির। এর রং সাদা-কাল ও হলুদ মিশ্রিত। আমি এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের চিহ্নও দেখতে পাই।'

পাথরের মাঝখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দুই পায়ের চিহ্ন রয়েছে। এতে ডিম্বাকৃতির গর্ত আছে। মানুষের হাতের স্পর্শে এবং যমযমের পানি দিয়ে ধোয়াতে ঐ গর্তটি সৃষ্টি হয়। অধিক পরিমাণে মানুষের হাতের স্পর্শে পায়ের চিহ্নের জায়গাটি গর্তে রূপান্তরিত হয়।

মক্কার আরেকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শেখ তাহের কুর্দী সর্বশেষ নিজ চোখে ঐ পাথরটি দেখেন। তাঁর উদ্দেশ্যে মাকামে ইবরাহীমের কেস খোলা হয়। তিনি ভেতরে যা দেখতে পান তা হচ্ছে এইঃ মাকামে ইবরাহীমের পাথরটিকে মার্বেল পাথরের তৈরি একটি ছোট পাকা ভিত্তির উপর রাখা হয়েছে। মার্বেল নির্মিত পাকা ভিত্তিটির আয়তন, পাথরের আয়তনের সমান। এর উচ্চতা হচ্ছে ১৩ সেন্টিমিটার। পাথরটিকে রূপা দিয়ে পাকা ভিত্তির সাথে মজবুত করে বসানো হয়েছে।

ছোট পাকা মজবুত ভিত্তিটুকু আবার চতুর্দিকে মার্বেল পাথর নির্মিত বড় পাকা ভিত্তির মাঝে অবস্থিত। বড় ভিত্তিটির চারদিকের দৈর্ঘ্য এক মিটার। যমীন থেকে এর উচ্চতা হচ্ছে ৩৬ সেন্টিমিটার এবং মার্বেল পাথর দু'টোর রং হচ্ছে সাদা। ঐ বড় ভিত্তিটির চতুর্দিকে, মাথা সমান উঁচু কাঠের তৈরি চার কোণ বিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির একটি কাঠের বাক্স ছিল। কোন জানালা ছিল না। তবে এর রং হলুদ ও লালের মাঝামাঝি এবং কিছুটা সাদা রং মুখী।

www.pathagar.com

মাকামে ইবরাহীমের পাথরের আকৃতি ঘনত্বপূর্ণ। এর উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার। উপরের দিক থেকে তিন বাহুর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৬ সেন্টিমিটার এবং ৪র্থ বাহুটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৮ সেন্টিমিটার। উপরের দিক থেকে এর আয়তন ১৪৬ সেন্টিমিটার এবং নীচের দিকটা উপরের দিকের চাইতে কিছুটা চেপ্টা। ফলে, নীচের দিকের আয়তন হচ্ছে ১৫০ সেন্টিমিটার। এটি শক্ত পাথর নয়। যে কোন দূর্বল লোকও পাথরটি বহন করতে পারবে।

পাথরটিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের দাগের গভীরতা, পাথরটির উচ্চতার অর্ধেক পরিমাণ। একটিতে পায়ের গভীরতা হচ্ছে ৯ সেন্টিমিটার। আমরা এতে আঙ্গুলের চিহ্ন দেখিনি। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ায় এবং এর উপর মানুষের হাতের স্পর্শে পায়ের আঙ্গুলের চিহ্নগুলো মুছে গেছে। পায়ের গোড়ালীর চিহ্ন তেমন একটা বুঝা যায় না। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে তা বুঝা যায়।

পাথর ও রূপার উপর দিয়ে প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৭ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১৪ সেন্টিমিটার। পাথরের নীচের অংশে রূপা সহ প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১১ সেন্টিমিটার।

দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে প্রায় এক সেন্টিমিটার। বরকতের উদ্দেশ্যে লোকদের হাতের অধিক স্পর্শে ঐ ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। হাতের স্পর্শের কারণে উপর থেকে পায়ের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দীর্ঘায়িত হয়েছে। দীর্ঘ ৪ হাজার বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মাকামে ইবরাহীমে এখন পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন অপরিবর্তিত রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা, আল্লাহ একে স্থায়ী নিদর্শন হিসেবে কোরআনে উল্লেখ করেছেন। সেই আয়াতটি হচ্ছেঃ 'এতে মাকামে ইবরাহীমের সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।'

মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি রূপা দ্বারা মোড়ানো। প্রকৃত পাথরটির সব অংশ দেখা যায় না। শুধু ভেতরে পায়ের গর্ত এবং দুই পায়ের পাশ দেখা যায়। তবে দুই পায়ের নীচ সমতল নয়। এতে কিছু ছোট ছোট উচুঁ অংশ আছে।

এই পাথরটি তামার তৈরি একটি বর্গাকৃতির বেষ্টনীর মধ্যে, ৪ খুঁটির উপর নির্মিত একটি গম্বুজের নীচে ছিল। ঐটির আয়তন ছিল ৩ x ৬ মিটার।'

তাহের কুর্দীর ঐ বর্ণনা বেশ দীর্ঘ। ৫৭৮ হিজরীতে স্পেনের ইবনে যোবায়ের মক্কায় হজ্জ করতে এসে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মাকামে ইবরাহীমের পাথরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আঙ্গুল ও পায়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি আরো বলেন, পাথরটি রূপা দ্বারা মোড়ানো এবং পাথরের উপরের অংশ নীচের অংশের চেয়ে চওড়া।

১৬০ হিজরীতে, খলীফা মুহাম্মাদ মাহদী হজ্বে আসেন। তিনি যখন দারুন নাদওয়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর কাছে দুপুরে নিরিবিলি সময়ে ওবায়দুল্লাহ বিন ইবরাহীম হাজাবী উপস্থিত হন এবং তাঁকে মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি দেখান। মাহদী এতে খুশী হন। তিনি এতে চুমু দেন, মসেহ করেন, পানি ঢালেন, সেই পানি পান করেন, নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে দিয়েও তা স্পর্শ করান এবং সবাই ঐ পানি পান করে। তারপর সেই পাথরটি পুনরায় মাকামে ইবরাহীমের স্থানে ফেরত পাঠান। মাহদী

www.pathagar.com

ওবায়দুল্লাহকে বিরাট পুরস্কার এবং নাখলা উপত্যকায় অনেক যমীন দেন। পরে ঐ যমীন বিক্রী করে তিনি ৭ হাজার দীনার লাভ করেন।

মাকামে ইবরাহীমের সংরক্ষণ যুগে যুগে

১৬১ হজিরীতে কাবার খাদেম খলীফা মাহদীকে লেখেন যে, আমরা মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি ভেঙ্গে গিয়ে নষ্ট হওয়ার আশংকা করছি। তখন খলীফা মাহদী ১ হাজার দীনার পাঠান তখন পাথরটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত, রূপা দিয়ে মজবুত করে মোড়ানো হয়। খলীফা মাহদীই সর্বপ্রথম মাকামে ইবরাহীমের পাথরটিকে রূপা দিয়ে মজবুত করে মুড়িয়ে দেন। এর আগে পাথরটি প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হত।

খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে, ১৭৯ হিজরীতে দেখা গেল যে, মাকামে ইবরাহীমের পাথরে বাঁধানো রূপা নড়বড়ে হয়ে গেছে। তখন পুনরায় মজবুত করে রূপা দিয়ে পাথরটি মোড়ানো হয়। তারপর ২৩৬ হিজরীতে, খলীফা মোতাওয়াক্কেল আব্বাসী রূপার উপর পুনরায় ৮ হাজার মেসকাল সোনা এবং রূপার ৭০ হাজার দিরহাম দিয়ে তা মোড়ান ও মজবুত করে বসিয়ে দেন। তারপর, মক্কার গভর্ণর জাফর বিন ফদল এবং মুহাম্মাদ বিন হাতেম, মোতাওয়াক্কেলের মোড়ানো ও লাগানো সোনা-রূপাগুলো ২৫১ হিজরীতে খুলে মক্কায় ফেতনা সৃষ্টিকারী ইসমাঈল বিন ইউসুফ আলাওয়ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করে। ২৫৬ হিজরী পর্যন্ত খলীফা মাহদী কর্তৃক মোড়ানো রূপা দ্বারা মাকামে ইবরাহীম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২৫৬ হিজরীতে, কাবার সেবক মক্কার গভর্ণর আলী বিন হাসান আব্বাসীকে বলেন, মাকামে ইবরাহীমের অবস্থানের মজবুতি দূর্বল হয়ে পড়েছে এবং পাথরটি নষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই একে মজবুত করে মুড়িয়ে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। গভর্ণর ঐ আহবানে সাড়া দেন এবং ১৯৯২ মেসকাল সোনা দিয়ে একটি বেষ্টনী ও আরেকটি রূপার বেষ্টনী তৈরী করেন তারপর পাথরটিকে মজবুত করে লাগান ও মাকামে ইবরাহীমে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফাসী বলেন, এখন মাকামে ইবরাহীম পাথর খোদাইকৃত সরু ৪ খুঁটির উপর নির্মিত কাঠের তৈরি উঁচু একটি গম্বুজের নীচে অবস্থিত। এতে লোহার তৈরী ৪টি জানালা ছিল। প্রতি দুটো খুঁটির মাঝে একটি করে জানালা অবস্থিত। পূর্বদিকে ছিল ভেতরে প্রবেশ করার দরজা। গম্বুজটির ভেতরে সোনা এবং উপরে অন্যান্য কারুকার্য ছিল। আর উপরে ছিল সাদা রং এর প্রলেপ।

৮১০ হিজরীতে, মিসরের বাদশাহ নাসের ফারাজ মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, নামাযের স্থানে, একটি চার পা বিশিষ্ট ছায়াদার গম্বুজ তৈরি করেন। এর নীচে সোনা এবং উপরে সাদা প্রলেপ দেন। মাকামে ইবরাহীমের জন্যে দুটো গম্বুজ ছিল। একটি কাঠের এবং অন্যটি লোহার তৈরি। 'হজ্বের ভিড়ের সময় লোহার তৈরি গম্বুজটি ব্যবহার করা হত। কেননা, ভিড়ের সময় লোহার তৈরি গম্বুজটি, মাকামে ইবরাহীমের হেফাজতের জন্যে বেশী উপযোগী।

৫৭৯ হিজরীতে, স্পেনের ইবনে যোবায়ের মক্কায় হজ্ব শেষে তাঁর বইতে লেখেন যে, মাকামে ইবরাহীম সর্বদা তার নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না। এক সময় মাকামে ইবরাহীম তার সুনির্দিষ্ট স্থানে থাকে, অন্য সময় কাবার ভেতরে ছাদে উঠার সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে রাখা

www.pathagar.com

হয়। আজকাল, এর উপর কাঠের তৈরি একটি গম্বুজ আছে। হজ্ব মওসুমে কাঠের গম্বুজটি খুলে ফেলা হয় এবং লোহার গম্বুজটি লাগানো হয়। ফাসী বলেন, কখন মাকামে ইবরাহীমকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসানো হয় তা জানা যায় না।

৯০০ হিজরী এবং ৯১৫ হিজরীতে, খাজা মুহাম্মাদ বিন এবাদুল্লাহ রূমী, মাকামে ইবরাহীমের গম্বুজ পূনঃ নির্মাণ করেন এবং গম্বুজে অনেক সোনা লাগান। এছাড়াও গম্বুজের খুঁটি এবং কাঠের মধ্যেও সোনা লাগান।

হিজরী ১০০০ সালে শরীফ সুলতানের নির্দেশক্রমে, শেখ আলী-আল-খালাওতী মাকামে ইবরাহীমের ছাদ নষ্ট হতে দেখে ১০০১ হিজরীতে ছাদের সকল কাঠ পরিবর্তন করে এর সংস্কার করেন।

সানজারী উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান মুরাদ বিন আহমদ খানের নির্দেশক্রমে, ১০৪৯ হিজরীতে মাকামে ইবরাহীম পূনঃ নির্মাণ করা হয়, এতে সোনার নকশা এবং বিভিন্ন প্রকার রং এর প্রলেপ দেয়া হয়। মক্কা ও জেদ্দার গভর্ণর সোলায়মান বেগ, আগা মুহাম্মদ কুযলারের খরচে ঐটি নির্মাণ করেন।

১০৭২ হিজরীতে, সুলতান মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম খানের নির্দেশক্রমে, মাকামে ইবরাহীম পুনরায় সংস্কার করা হয়। ১০৯৯ হিজরীতে, মুহাম্মাদ বেগ মাকামে ইবরাহীমের উপরিভাগ সংস্কার করেন। ১১১২ হিজরীতে, ইবরাহীম বেগ মাকামে ইবরাহীমের সকল নির্মাণ কাজ ভেঙ্গে ফেলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের স্থানটি মার্বেল পাথর দ্বারা তৈরী করেন। তিনি রূপা ও পাথরের মাঝখানে সীসা ঢেলে, রূপাকে আরো মজবুত করেন, রূপা সরিয়ে ফেলেন এবং সোনালী পাত ও রং দিয়ে তা পূনঃ নির্মাণ করেন।

১১৩৩ হিজরীতে, মুহাম্মাদ আফেন্দী, মাকামে ইবরাহীমের পাথরের বাক্সটি নতুন কাঠ দিয়ে তৈরি করেন এবং পুরাতন রূপা সরিয়ে নতুন রূপা দিয়ে তা মুড়িয়ে দেন।

মাকামে ইবরাহীম

উল্লেখিত আছে যে, সুলতান আবদুল আযীয উসমানী মাকামে ইবরাহীমের গম্বুজ দেড় হাত উঁচু করেন।

উসমানী শাসকদের আমলে কা'বায় গেলাফ লাগানোর সময়, তারা মাকামে ইবরাহীমেও কাল গেলাফ লাগায়। কাবায় গেলাফের অনুসরণে, এতে দরজার গেলাফ এবং বেষ্টনী দেয়। গেলাফে সোনালী মিশ্রণযুক্ত রূপার তার দেয় এবং তা কাঠের বাক্সের উপর পরায়। বাক্সটি লোহার জানালার ভেতর পাথরের উপর অবস্থিত।

মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে
ক্রিষ্টাল পাথরের একটি বাক্সে

মাকামে ইবরাহীমের উপর যে সকল গম্বুজ ও ঘেরাও ছিল, সেগুলো হাজী ও তওয়াফকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাতাফে সংকীর্ণতা সৃষ্টির কারণ

www.pathagar.com

হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। পরে ১৩৮৪ হিজরীতে, রাবেতা আলমে ইসলামীর এক প্রস্তাব মোতাবেক, মাকামে ইবরাহীমের বর্তমান সকল অতিরিক্ত জিনিস ও নির্মাণকাজ সরিয়ে, তার পরিবর্তে সেখানে পরিমাণমত মোটা ও শক্তিশালী ক্রিষ্টাল গ্লাসের একটি বাক্স তওয়াফকারীদের গায়ে ধাক্কা না লাগে এবং দেখতেও সুন্দর দেখা যায়, নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযীয উৎকৃষ্ট ক্রিষ্টাল পাথরের বাক্স তৈরি এবং তা চতুর্দিক থেকে লোহা দ্বারা বেষ্টন করার নির্দেশ দেন। ভেতরে, মার্বেল পাথরের একটি ভিত্তি তৈরি করে তার উপর পাথরটি রাখা হয়। ভিত্তিটির আয়তন ১৮০x১৩০, এর উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটারের বেশী নয়। হিজরী ১৩৮৭ সালে তা সম্পন্ন হয়। এর ফলে, মাতাফের প্রশস্ততা বৃদ্ধিপায় এবং তওয়াফকারীরা আরামের সাথে তওয়াফ করতে সক্ষম হন।

মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান - সেদিনে আর এদিনে

কা'বা শরীফ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে আযরাকী সহ আরো অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব হচ্ছে; ২৯ হাত ৯ আঙ্গুল। কা'বা শরীফের ভিত্তি (প্লিনথ লেবেল) থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব হচ্ছে সাড়ে ২৬ হাত। রোকনে শামী থেকে মাকামের দূরত্ব হল, ২৮ হাত ১৭ আঙ্গুল। যমযমের পাশ থেকে মাকামের দূরত্ব হচ্ছে ২৪ হাত ২০ আঙ্গুল।
ইবনে আবদুর রব আন্দুলুসী তাঁর 'আলআকাদিল ফারিদ' বইতে লিখেছেন, মাকামে ইবরাহীম কা'বা শরীফের পূর্বদিকে ২৭ হাত দূরে। মুসল্লীরা এর পেছনে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে কিবলামূখী হয়ে নামায পড়ে। তখন তার ডানে থাকে রোকনে ইরাকী এবং বামে থাকে রোকনে হাজরে আসওয়াদ। মাকামে ইবরাহীমের পাথরটিকে একটি মিম্বারের উপর তুলে রাখা হয়েছে, যেন বন্যার পানি এর উপর দিয়ে গড়াতে না পারে। হজ্বের সময় এটিকে একটি লোহার সিন্দুকে রাখা হয় যেন মানুষ হাত দিয়ে তা স্পর্শ করতে না পারে।

আযরাকী বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর সময় মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে যে জায়গায় অবস্থান করছে, সেখানেই ছিল। তবে হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় বন্যায় পাথরটি মক্কার নিম্নাঞ্চলে ভেসে যাওয়ায় তাকে এনে পুনরায় কাবার গেলাফের সাথে বেঁধে রাখা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) খবর পেয়ে মদীনা থেকে ছুটে আসেন, মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে রাখেন এবং মাকামে ইবরাহীমের চারদিকে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন যেন পানি একে ভাসিয়ে নিতে না পারে। তাছাড়াও তিনি মক্কায় উঁচু অংশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময়েও মাকামে ইবরাহীম বর্তমান স্থানে অবস্থিত ছিল। বন্যার পর হযরত ওমর (রাঃ) একে শুধু সাবেক স্থানে পূনর্বহাল করেন।

www.pathagar.com

আল্লামা মুহিব আত্ তাবারী ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন, মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে যে জায়গায় আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময়ও একই জায়গায় ছিল। কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে, লোকেরা বন্যার ভয়ে ঐটিকে কাবা শরীফের সাথে লাগিয়ে রাখে। ফলে তা রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সময়ও কাবা শরীফের সাথেই লাগা ছিল।

ইমাম বায়হাকী হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) এর সময় মাকামে ইবরাহীম কাবা শরীফের সাথে লাগানো ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) একে দূরে সরিয়ে বর্তমান স্থানে বসিয়েছেন।

আযরাকী ইবনে আবি মোলায়কা থেকে বর্ণনা করেন, মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে যে জায়গায় আছে, জাহেলিয়াতের সময়ও একই জায়গায় ছিল এবং তা রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত আবু বকরের সময়ও সাবেক স্থানেই অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু হযরত ওমরের (রাঃ) সময় বন্যায় তা স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) তা সাবেক জায়গায় পূনর্বহাল করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে লিখেছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় মাকামে ইবরাহীম কা'বার সাথে লাগানো ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) একে পিছিয়ে দিয়েছেন।

হাফেজ এমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, মাকামে ইবরাহীম আগে কা'বা শরীফের দেয়ালের সাথে লাগানো ছিল। সেই জায়গাটি আজও পরিচিত। সেটি হচ্ছে, কাবার দরজা থেকে বের হওয়ার সময় ডানে হাজরে আসওয়াদের দিকে, কাবার দরজা সংলগ্ন একটি পৃথক জায়গায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ শেষে ঐ পাথরটি সেখানে কাবার দেয়ালের সাথে রেখে দেন কিংবা পাথরটি সেখানেই থেমে যায় এবং তিনি সেটাকে সেখানেই রেখে দেন। তওয়াফ শেষে, সেখানেই নামায পড়ার জন্যে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন। যুক্তির দাবীও তাই যে, যেখানে কাবার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে, মাকামে ইবরাহীম সেখানেই থাকবে। হযরত ওমর (রাঃ) একে সেখান থেকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ২য় খলীফা ছিলেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কোরআন নাযিল হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরামের কেউ তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করেননি।

আল্লামা ইবনুল জাযারী আশ-শাফেঈ (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমের ব্যাপারে ৫টি মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) হযরত ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করার আদেশ দেন। (২) হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীম বর্তমান স্থানেই আছে। কিন্তু জাহেলিয়াতের সময় এটাকে কাবার সাথে লাগানো হয় যা রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত আবু বকরের (রাঃ) সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সেটিকে সাবেক স্থানেই পূনর্বহাল করেন। (৩) রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই বাইতুল্লাহর কাছ থেকে এটিকে বর্তমান জায়গায় স্থানান্তর করেন। (৪) হযরত ওমর (রাঃ) নিজেই সর্বপ্রথম ঐ পাথরটি বর্তমান স্থানে সরিয়ে আনেন। বন্যার পরে লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি তা সাবেক জায়গায় পূনর্বহাল করেন।

www.pathagar.com

(৫) হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর যুগ থেকেই পাথরটি বর্তমান জায়গায় ছিল। উম্মে নহশল বন্যার সময় তিনি এটাকে সাবেক জায়গায় পূনর্বহাল করেন মাত্র।

ইবনে সোরাকা বলেন, কাবার দরজা এবং মোসাল্লা আদম এর মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ৯ হাতের একটু বেশী। হযরত আদম (আঃ) তওয়াফ শেষে সেখানে নামায পড়েন এবং আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন। সেখানেই মাকামে ইবরাহীম অবস্থিত। তওয়াফ শেষে রসূলুলাহ (সঃ) সেখানে দু'রাকাত নামায পড়েন এবং সেখানেই তাঁর উপর এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

"ওয়াত্তাখিদু মিম্মাকামি ইব্রাহীমা মুচাল্লা।"

তারপর রসূলুলাহ (সঃ) সেটিকে এর বর্তমান স্থানে সরিয়ে আনেন এবং বর্তমান স্থানটি কাবা শরীফ থেকে ২০ হাত দূরে অবস্থিত, যাতে করে তওয়াফকারীদের তওয়াফে কোন অসুবিধা না হয়। বন্যার পর হযরত ওমর (রাঃ) সেটিকে এর সাবেক স্থানেই বহাল করেন মাত্র।

উম্মে নহশল নামক বন্যার ব্যাপারে মুহিব আত-তাবারী সাহাবী আবদুল মুত্তালিব বিন আবুওয়াদাআ কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করেছেন, আবদুল মোত্তালিব মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছেন। তিনি বলেন, মসজিদে হারামের বড় দরজা বাবে বনি শায়বা দিয়ে ভেতরে বন্যার পানি প্রবেশ করে। হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় (হিজরী ১৭ সালে), উম্মে নহশল নামক বন্যার পানিতে মাকামে ইবরাহীম ভেসে যায় এবং তা মক্কার নিম্নাঞ্চলে নিয়ে যায়। সেটিকে লোকেরা কুড়িয়ে এনে কাবার দরজার সামনে গেলাফে কাবার সাথে বেঁধে রাখে। এই ঘটনা ওমরকে (রাঃ) জানানোর পর তিনি, রমযানে মদীনা থেকে ওমরাহর ইহরাম পরে মক্কায় রওনা হন। বন্যার পানিতে মাকামে ইবরাহীমের নির্দিষ্ট স্থানের চিহ্ন মুছে যায়। ফলে, তিনি লোকদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কে মাকামে ইবরাহীমের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল আছে? তখন আবদুল মোত্তালিব বিন আবু ওয়াদাআ বলেন, আমি ঐ সম্পর্কে জানি। আমি অনুরূপ আশংকার ভিত্তিতে, হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইবরাহীম, বাবে কাবা থেকে মাকামে ইবরাহীম এবং যমযম থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব মেপে রাখি। আমি একটি পাকানো মজবুত রশি দিয়ে তা মাপি ও রশিটি ঘরে রেখে দেই। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আপনি আমার কাছে বসুন এবং একজন লোককে তা আনার জন্যে পাঠিয়ে দিন। একজন লোক পাঠিয়ে রশিটি আনা হল। রশি দিয়ে মেপে দেখা হল, বর্তমান স্থানটিই এর যথার্থ সাবেক স্থান। তিনি অন্যান্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের পরামর্শ নেন। সবাই এই জায়গার ব্যাপারেই রায় প্রকাশ করেন। হযরত ওমরের (রাঃ) কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর তিনি বর্তমান স্থানে, মাকামে ইবরাহীমের (রাঃ) নীচে ও চতুষ্পার্শ্বে মজবুত ভিত্তি তৈরি করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীম ঐ জায়গাতেই বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমের চতুর্দিকে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করেন।

যে সকল বর্ণনায় এসেছে যে মাকামে ইবরাহীম, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় থেকেই কাবা সংলগ্ন ছিল এবং হযরত ওমর (রাঃ) তাকে পিছিয়ে এনে বর্তমান স্থানে বসান, এই সকল বর্ণনা বেশী যুক্তিযুক্ত নয়। বরং তা প্রথম থেকেই বর্তমান স্থানে ছিল

www.pathagar.com

এবং বন্যার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাকে সাবেক স্থানে বহাল করেন মাত্র। এই কথার পক্ষেই বেশী বর্ণনা রয়েছে এবং এই মতটিই বেশী জোরদার। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক গুলো যুক্তি রয়েছে। আমরা এখন সেগুলো আলোচনা করবো।

হযরত ওমর (রাঃ) কখনও কোন ব্যাপারে নিজে একাকী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। বরং সব ব্যাপারে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অনুসরণ করতেন এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সাথে তিনি পরামর্শ করাকে জরুরী মনে করতেন। তারীখুল কাবা বইতে উল্লেখ আছে যে, খলীফা হওয়ার পর একবার তিনি কা'বায় ঢুকলেন এবং কা'বার অর্থ ভান্ডারের সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা দেয়া কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন কা'বার সেবক শায়াবা বিন উসমান হাজাবী তাঁকে বললেন, আপনার দুই সাথী রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) তো তা নেননি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তো তাঁদেরই অনুসরণ করি। তারপর তিনি ঐসম্পদ নেয়া ছেড়ে দিলেন। এই ঘটনা সামনে রেখে কিভাবে চিন্তা করা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময় মাকামে ইবরাহীম যেখানে ছিল, সেখান থেকে তিনি তা পিছিয়ে দিয়েছেন? অথচ সেখানেই নামায পড়ার জন্যে কোরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে। তদুপরি হযরত ওমরের (রাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ীই আল্লাহ সেখানে নামায পড়ারও আদেশ দিয়েছেন। তাহলে, ওমর (রাঃ) কি করে সেই পবিত্র জায়গাটি পরিবর্তন করতে পারেন? সেখান থেকে পাথর সরানোর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা যেখানে তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐ আয়াত নাযিলের পর স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সেখানে নামায পড়েন। ওমর তা পরিবর্তন করে থাকলে কোরআন ও নবীর বিরোধিতা করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ!) তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে থেকে সব কিছু নিজ চোখে দেখেছেন। তারপরও, অধিকতর নিশ্চয়তা হাসিলের জন্যে সাহাবায়ে কেরামকে মাকামে ইবরাহীমের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তখন, মক্কায় বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউ হযরত ওমরের (রাঃ) এই কাজের বিরোধিতা করেননি। ওমর (রাঃ) অন্যায় করলে, অবশ্যই সাহাবায়ে কেরাম চুপ করে না থেকে এর বিরোধিতা করতেন। তাঁর খেলাফতের সময় যখন একজন সাহাবী তলোয়ার দেখিয়ে বলেছিলেন, তুমি ভুল পথে চললে, এই তলোয়ার দিয়ে তোমাকে সোজা করে দেব। সেখানে এত বেশী সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম কি করে চুপ করে থাকতে পারেন? এছাড়াও হযরত ওমর (রাঃ) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে মাকামে ইবরাহীমের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পেছনে তাঁর যে আগ্রহ ছিল, সেটি হচ্ছে, যে স্থানটি সম্পর্কে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন তা ভাল করে জানা। ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে এই মতটিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোই সহীহ। আযরাকীও সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত আবু বকরের যুগে মাকামে ইবরাহীম বর্তমান জায়গাতেই বিদ্যমান ছিল।

www.pathagar.com

যমযম কূপের পাদদেশে

আমরা মাকামে ইবরাহীমে নামাজ শেষে ইবরাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ) এবং তাঁদের উত্তর সূরী নবী পাক মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি সালাম পেশ করে প্রাণভরে দোয়া করলাম। অতঃপর যমযমের কূপে গিয়ে পানি পান করে নিলাম। এখানে দেখলাম, কয়েকজন হাজী নফল নামাজ পড়ছেন। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম। এ জায়গাটি অত্যন্ত মোবারক। যমযম পানির মো'জেজা ছাড়াও এটা সেই মহান পবিত্র স্থান যেখানে ফেরেশতাকুল শিরমণি জিবরাঈল (আঃ) এর পবিত্র কদম মোবারকের আঘাতে মরুভূমির মধ্যে পানির প্রবাহ শুরু হয়েছে যা কেয়ামত পর্যন্ত বইতে থাকবে। অনেকে মনে করেন যে, শিশু ইসমাইলের (আঃ) পদাঘাতে পানি বেরিয়েছে, কথাটি সঠিক নহে। যমযমও আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নিদর্শন যার কিঞ্চিত ইতিহাস ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত হাজার এবং শিশু পুত্র ইসমাইলকে কা'বার পার্শ্বে অবস্থিত একটি বড় ছায়াদার গাছের নীচে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে চলে গেলেন। তখন কা'বা শরীফের স্থানটি একটি উঁচু টিলার মত ছিল।

পানি শেষ হয়ে গেলে হযরত হাজার সাফা-মারওয়ায় ৭ বার পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন আওয়াযকারীর আওয়ায শুনতে পান। তারপর কাবার পাশে এসে দেখেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতার পায়ের আঘাতে যমযমের কূপের পানি উথলে উঠছে। তখন তিনি কূপের মধ্যে বালির বাঁধ দেন এবং মশক ভর্তি করে পানি রাখেন।

যমযম কূপ হলেও তা একটি নদীর সমান। নদীর অসীম পানির মতই যমযমের পানি গোটা দুনিয়ায় পান করা হচ্ছে এবং হাজীরা দূর থেকে দূরান্তরে সাথে করে এই পবিত্র পানি নিয়ে যাচ্ছে। হজ্ব মওসুমে বর্তমানে প্রতিদিন ১৯ লাখ লিটার পানি সেবন করা হয়। দুনিয়ার অন্য যে কোন কূপ থেকে এর উৎপাদন ও সরবরাহ অনেক বেশী।

ফাকেহী উল্লেখ করেন যে, যমযম কূপ আবিষ্কারের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তা খনন করে একে কূপে রূপ দান করেন। তখন তাঁর সাথে জুল কারনাইনের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। জুল কারনাইন কূপটির দখল নিয়ে নেয়। এর পর ঘটনার বর্ণনাকারী উসমান বলেন, সম্ভবতঃ জুল কারনাইন ইবরাহীম (আঃ) এর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। ইবরাহীম (আঃ) বলেন, এটা কিভাবে হয়? তোমরা আমার কূপটি নষ্ট করেছ। জুল কারনাইন বলেন, সেটা আমার হুকুমে হয়নি এবং ঐটি যে ইবরাহীমের কূপ এ ব্যাপারে জুল কারনাইন কাউকে খবরও দেয়নি। তারপর দু'জনের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইবরাহীম (আঃ) জুল কারনাইনকে ৭টি ভেড়া সহ কয়েকটি উট উপহার দেন। জুল কারনাইন জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহীম! ভেড়া গুলো কেন উপহার দিচ্ছেন? তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) জবাব দেন, এগুলো কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে যে এটি হচ্ছে ইবরাহীম কূপ।

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) খৃঃ পূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই ইবরাহীম (আঃ) ইসমাইল (আঃ) এবং হাজারকে মক্কায় নির্বাসনে

www.pathagar.com

রেখে যান। সেই বছরেই যমযম কূপের আবির্ভাব ঘটে। এই হিসেব অনুযায়ী এখন থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে এই যমযম কূপের উৎপত্তি হয়। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যমযম কূপের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে এবং যমযমের পানি সরবরাহের ব্যাপারে বহু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছে। আমরা এ সকল বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এক সময় যমযম কূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়

মক্কায় যমযম কূপের অস্তিত্বের কারনে ইয়েমেনের জোরহাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক হযরত হাজরার অনুমতিক্রমে এবং যমযম কূপের উপর তাঁর মালিকানা সত্বের স্বীকৃতির শর্তে মক্কায় বসবাস শুরু করে। পরে ইসমাইল (আঃ) বড় হন এবং জোরহাম গোত্রে বিয়ে করেন। তারপর থেকে জোরহাম গোত্র 'যমযম' কূপ সহ মক্কার শাসনভার পরিচালনা করে। দীর্ঘ দিন যাবত তথা যমযম কূপের সূচনা লগ্ন থেকেই তারা যমযম কূপের পানি পান করতে থাকে।

এক পর্যায়ে যমযম কূপ শুকিয়ে যায় ও মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং এর সকল চিহ্ন বা নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যায়। যমযমের বিলুপ্তি সম্পর্কে ইয়াকুত আলহামাওয়ী বলেছেন, বৃষ্টির অভাবে যমযম শুকিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এটা ভৌগোলিক কিংবা প্রাকৃতিক কারণে চাপা পড়েনি। বরং জোরহাম গোত্র পবিত্র হামামের অসম্মান করে এবং এর প্রতি প্রদত্ত উপহার সামগ্রী প্রকাশ্যে ও গোপনে চুরি ও আত্মসাৎ করে। তাদের এই বিরাট পাপের কারণে যমযম কূপ শুকিয়ে যায় এবং এর সকল চিহ্ন মিটে যায়।

বর্ণিত আছে যে, আমর বিন হারেস বিন মুদাদ বিন আমর জোরহোমী তাঁর গোত্রের লোকদেরকে এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাতে সাড়া না দেয়ায় তিনি কাবার ধণভান্ডারে রক্ষিত দুটো সোনার হরিণের প্রতিকৃতি এবং তলোয়ার যমযম কূপে গোপনে রেখে দেন। তিনি অন্যদের ভয়ে গোপনে কূপটি ভরাট করেন। কেননা, তারা টের পেলে তাকে কিছুতেই ঐ কাজ করতে দিত না।

তারপর আল্লাহ এই পাপী জাতির উপর খোযায়া গোত্রকে বিজয়ী করেন এবং জোরহাম গোত্র মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়। এই ভাবে যমযম কূপের আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুদাদ বিন আমর জোরহোমী তার শত্রুদের সাথে লড়াইতে পরাজিত হন। তার আশংকা হল যে, শত্রুবাহিনী তাকে মক্কায় থাকতে দেবে না। তাই তিনি তাদেরকেও যমযম কূপের পানি থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে নিজের কিছু মূল্যবান সম্পদ এবং সোনা দিয়ে কূপটি ঢেকে ফেলেন। ফলে, কূপের চিহ্ন মুছে যায়। তার পর মরুভূমির ধূলা বালুতে তা ভর্তি হয়ে যায়। পরে কারুর পক্ষে কূপটি আর আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। তারপর মুদাদ ইয়েমেনে ভেগে যায়।

মক্কায় যেহেতু নদী-নালা নেই, তাই মক্কা বাসীরা মক্কার বাইরে কূপ খনন করে পানির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। কোরাইশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুসাই বিন কিলাব চামড়ার মশকে করে মক্কার বাইরে থেকে পানি সংগ্রহ করে হাজীদেরকে পান করাতেন। পরে

www.pathagar.com

কুসাই উম্মে হানী বিনতে আবি তালেবের ঘরের স্থলে আল-আজুল নামক একটি কূপ খনন করে হাজীদেরকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেন। ইতিহাসে এটিই হচ্ছে মক্কার ভেতরের প্রথম কূপ। মক্কাবাসী এবং বহিরাগত হাজীরা কুসাইর এ মহতী কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন। কুসাইর মৃত্যুর পরেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কূপটি অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরে এতে বনি জোয়াইল গোত্রের এক ব্যক্তি পড়ে মারা যাওয়ায় তা ভরাট করে দেয়া হয় এবং এর পর প্রত্যেক গোত্র কূপ খনন করে নিজেদের পানির ব্যবস্থা করে। বনু তামীম বিন মাররাহ 'আল-জোফের' কূপ, আবদ শামস বিন আবদ মন্নাফ 'তা ওয়া' কূপ এবং হাশেম গোত্র 'সিজলাহ' নামক কূপ নির্মাণ করে। এই ভাবে মক্কায় পানি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলে।

আব্দুল মোত্তালিব যমযম কূপ আবিষ্কার করেন

কোরাইশ গোত্রের মধ্যে ১৫টি দায়িত্বপূর্ণ পদ ছিল। ঐ সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোরাইশরা নিজেদের এবং হাজীদের সেবা করত। এর মধ্যে 'কাবার সেবক' এই পদটি সবচাইতে বেশী সম্মানিত ছিল। কাবার সেবকের কাছে কাবার দরজার চাবি থাকতো। তিনি লোকদের জন্যে কাবার দরজা খুলতেন এবং বন্ধ করতেন। ২য় গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল পান করানোর। হাজীদেরকে পানি পান করানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কেননা, মক্কায় পানির স্বল্পতার কারণে, এই দায়িত্ব পালনকারী বিন হাসেম বিন আবদে মন্নাফ গোত্রকে কাবার পার্শ্বে চামড়ার মশকে পানি জমা করতে হত এবং ঐ সকল পানি মক্কার বাইরে থেকে উটের পিঠে করে বহণ করে আনা হত। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল হাজীদেরকে খাওয়ানোর। কোরাইশরা তাদের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে গরীব হাজীদের খানা খাওয়ানোর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করত এবং ঐ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির হাতে তা অর্পণ করত।

কুসাই বিন কিলাব নিজে ঐ তিনটি দায়িত্ব সহ দারুন নাদওয়াহ এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে আবদুদদার এবং আবদে মন্নাফের মধ্যে ঝগড়া সংঘর্ষের পর তা বন্টন করা হয়। ঐ বন্টন অনুযায়ী বনি আবদে মন্নাফ পানি পান করানোর এবং হাজীদেরকে খানা খাওয়ানোর দায়িত্ব পায়। অপর দিকে, কাবার সেবা এবং দারুন নাদওয়াহর দায়িত্ব অর্পিত হয় বনি আবদুদ দারের উপর। পরে হাশেম বিন আবদ মন্নাফের কাছ থেকে তাঁর ভাই মোত্তালিবের উপর ঐ দায়িত্ব অর্পিত হয়। তার পর আব্দুল মোত্তালিব বড় হলে তিনি ঐ পদটি লাভের জন্যে নিজ চাচার সাথে ঝগড়া করেন এবং পদটি লাভ করেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এতবেশী যোগ্যতার সাথে পালন করেন যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এর ফলে তাঁর সম্মান ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তখন পর্যন্ত যমযম কূপ অনাবিষ্কৃত থাকে। কিন্তু পরে তিনি স্বপ্নে যমযমের অবস্থান সংক্রান্ত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে তা খোঁড়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এতে করে তাঁর সুনাম ও যোগ্যতা আরো অনেক বৃদ্ধি পায়। আজরাকী আব্দুল মোত্তালিবের যমযম কূপ সংক্রান্ত স্বপ্নটি বর্ণনা করে বলেন, আব্দুল মোত্তালিবের বড় ছেলে হারেস বড় হওয়ার পর এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে কেউ তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, কাবার সামনে অবস্থিত মূর্তি বরাবর পিঁপড়ার বসতিতে ময়লা ও রক্তের মাঝে কাকের ঠোঁকরে সৃষ্ট

www.pathagar.com

ছিদ্রের মধ্যে খনন করে যমযম কূপ আবিষ্কার কর। তিনি মসজিদে হারামে যান এবং স্বপ্নের লক্ষণগুলো দেখার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করেন। তখন মসজিদে হারামের বাইরে হাযওয়ারা নামক স্থানে একটি গাভী জবেহ করা হয়। গাভীটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে কসাইর কাছ থেকে ভেগে যমযমের স্থানে এসে পড়তে সক্ষম হয়। পরে কসাই গাভীটির জবেহ কাজ সমাপ্ত করে গোশত বহন করে নিয়ে যায়। তখন একটি কাক এসে গাভীর ময়লার উপর বসে এবং পিঁপড়ার বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

আব্দুল মোত্তালিব পুত্র কোরবানীর মানত করেন

সকল লক্ষণ দেখার পর আব্দুল মোত্তালিব যমযম কূপ খনন শুরু করেন। খনন কাজ দেখে কোরাইশরা আব্দুল মোত্তালিবের কাছে ছুটে আসে এবং বলে, আমরা তো আপনাকে মূর্খ মনে করি নাই; কিন্তু আপনি কি আমাদের মসজিদে হারামের কাছে খনন কাজ করে মসজিদটিকে নষ্ট করছেন? আব্দুল মোত্তালিব জবাব দেন আমি এ কাজ অব্যাহত রাখবো এবং কেউ আমাকে বাধা দিলে তার মুকাবিলা করবো। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে হারেসকে নিয়ে খনন কাজ অব্যাহত রাখায় কোরাইশরা তাঁর সাথে ঝগড়া শুরু করে। কিছু সংখ্যক কোরাইশ তাঁর যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও বংশের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে বিরোধীদেরকে বিরত রাখে। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপটি খনন করতে সক্ষম হন। কূপটি খনন করার সময়কার বাধাবিপত্তিতে কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেন যে, যদি তার ১০টি ছেলে সন্তান হয় তাহলে তিনি একটিকে আল্লাহর নামে কোরবান করবেন।

কূপ খননের এক স্তরে তিনি কাবার দাফনকৃত তলোয়ারগুলো দেখতে পান। কোরাইশরা তলোয়ার দেখে তাতে নিজেদের অংশ দাবী করে। আব্দুল মোত্তালিব বলেন, এতে তোমাদের কোন অংশ নেই। এগুলো আল্লাহর ঘরের তলোয়ার। তিনি পানির স্তর পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি কূপকে আরো একটু প্রশস্ত করেন যাতে করে এতে পর্যাপ্ত পানি থাকে এবং না শুকায়।

আব্দুল মোত্তালিব কূপের পাশে পানি সংরক্ষণের জন্যে একটি হাউজ নির্মাণ করেন এবং পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে সেই হাউজটি পানি তুলে ভর্তি করে রাখতেন। হাজীরা সেই হাউজ থেকে পানি পান করত। কিন্তু কোরাইশদের মধ্যে তাঁর প্রতি হিংসাপোষণকারী লোকেরা রাতে এসে হাউজটি ভেঙ্গে যেত এবং তিনি প্রতি দিন ভোরে তা পুনঃনির্মাণ করতেন। কোরাইশদের উৎপাত বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। ফলে, তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমি এর পানি গোসলের জন্যে নিষিদ্ধ করছি এবং শুধু পিপাসা নিবারণের জন্যে পান করাকে বৈধ ঘোষণা করছি। আব্দুল মোত্তালিব মসজিদে হারামে যান এবং উপস্থিত কোরাইশদেরকে স্বপ্নের কথা শুনান। এর পর থেকে তাঁর তৈরী হাউজ কেউই নষ্ট করতে আসলে শরীরে বিভিন্ন রোগ দেখা দিত। ফলে, তারা তাঁর হাউজ এবং সেখান থেকে পানি পান করা ত্যাগ করে। এর পর আব্দুল মোত্তালিব কয়েকটি বিয়ে করেন এবং ১০টি ছেলে-সন্তান লাভ করেন। তিনি আল্লাহর কাছে বলেন, হে আল্লাহ "আমি আমার এক সন্তানকে তোমার উদ্দেশ্যে কোরবানী করার মানত করেছিলাম। এখন আমি তাদের মধ্যে লটারী দিয়ে ঠিক করবো যে কাকে কোরবান করবো। তুমি তোমার

www.pathagar.com

পছন্দ অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রহণ কর। লটারীতে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সন্তান আব্দুল্লাহর নাম উঠে। তারপর আব্দুল মোত্তালিব বলেন, হে আল্লাহ্। তুমি আব্দুল্লাহ এবং একশত উটের মধ্যে যেটাকে পছন্দ কর সেটাকে গ্রহণ কর। তারপর এই দুটোর মধ্যে লটারীতে একশত উট উঠায় আব্দুল মোত্তালিব ১০০ উট কোরবান করেন।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে, তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের যমযম কূপ পূনরাবিষ্কার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল মোত্তালিব হিজরে ইসমাইলে শুয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্নে তিনবার কূপ খননের দৃশ্য দেখতে পান। তারপর তিনি নিজের একমাত্র ছেলে হারেসকে নিয়ে কূপ খনন করা শুরু করেন এবং কূপে পানির সন্ধান পেয়ে তাকবীর দেন। কোরাইশরা আব্দুল মোত্তালিবের সাথে যমযমের কূপের মালিকানা দাবি করে। আব্দুল মোত্তালিব নিজ মালিকানার সাথে অন্যদেরকে অংশ দিতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সাদ বিন হোযাইম গোত্রের একজন মহিলা গণককে সালিশি মানার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই গণক সিরিয়ার নিকট বাস করত। তারা গণকের কাছে রওনা দেয় এবং হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি এলাকায় পৌছার পর আব্দুল মোত্তালিবের দলের পানি ফুরিয়ে যায়। ফলে, তারা কঠিন পিপাসার্ত হয়ে পড়ে অন্য কোরাইশ দল আব্দুল মোত্তালিবের দলকে সম্ভাব্য পিপাসার আশংকায় পানি সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। পরে দলটি পানিহীন সফরের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে দলনেতা আব্দুল মোত্তালিবের পরামর্শ কামনা করে। আব্দুল মোত্তালিব বলেন, পানি ছাড়া আমরা যেহেতু নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি তাই শক্তি থাকতে আমাদের সবাইকে এখন নিজের কবর খুঁড়ে এতে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা উচিত। সেই অনুযায়ী তাঁর দলের সবাই কবর খুড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু পরে আব্দুল মুত্তালিব বললেন এভাবে কবরে পিপাসায় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা কঠিন ব্যাপার, চল আমরা রওনা দেই। হয়ত আল্লাহ আমাদের বাঁচার কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অন্য কোরাইশ দলটি নির্দয় ভাবে আব্দুল মোত্তালিবের এই প্রস্তাব দৃশ্য অবলোকন করে। ঠিক যে মুহূর্তে তিনি তাঁর উটকে রওয়ানা করাবেন ঠিক সেই মুহূর্তেই উটের পায়ের নীচে থেকে মিষ্টি পানির একটি ফোয়ারা ফুটে উঠে। তারপর আব্দুল মোত্তালিব দল খুশীতে তাকবীর ধ্বনী দেয় এবং সওয়ারী থেকে নেমে পানি পান করে ও মশকে পানি ভর্তি করে নেয়। তিনি অন্য কোরাইশ দলটিকেও পানি পান করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রহমতের করুণা থেকে পানি দিয়েছেন। তাই তোমরাও পানি পান কর। তারাও পানি পান করে এবং সাথে পানি নিয়ে নেয়। পরে প্রতিদ্বন্দ্বী কোরাইশ দলটি বলেঃ হে আব্দুল মোত্তালিব, আল্লাহর কসম, আমরা আর তোমার সাথে যমযমের বিষয়ে ঝগড়া করবোনা। আল্লাহ এ ব্যাপারে তোমার পক্ষে ফয়সলা জানিয়ে দিয়েছেন; চল, আমরা ফিরে যাই। এর পর তারা মক্কায় ফিরে এসে এবং গণকের কাছে যাওয়া বন্ধ করে।

ইবনে ইসহাক যমযম কূপ পূনরাবিষ্কার সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেই বর্ণনায় অতিরিক্ত যে তথ্য যোগ হয়েছে তা হচ্ছে, কূপ খনন করতে গিয়ে আব্দুল মোত্তালিব এতে দাফনকৃত দুটো সোনার হরিণ এবং অস্ত্র শস্ত্র লাভ করেন। কোরাইশরা এই সকল প্রাপ্ত জিনিসে নিজেদের হিস্সা দাবী করে। পরে আব্দুল

www.pathagar.com

মোত্তালিব বলেন, আসো, আমরা এ ব্যাপারে একটি ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এজন্যে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে লটারী অনুষ্ঠিত হবে। এতে কা'বার জন্য দুটো তীর, আমার জন্যে দুটো এবং কোরাইশদের জন্যে দুটো করে তীর থাকবে। কোরাইশরা এই প্রস্তাব মেনে নেয়। তিনি কা'বার জন্যে দুটো হলুদ তীর, নিজের জন্যে দুটো কাল তীর এবং কোরাইশদের জন্যে দুটো সাদা তীর নির্বাচন করেন এবং কিছু শ্লোক পাঠ করেন। এরপর লটারী অনুষ্ঠিত হয়। হোবল দেবতার সামনে অনুষ্ঠিত ঐ লটারীতে কা'বার হলুদ তীর দুটো হরিণ, আব্দুল মোত্তালিবের কাল তীরগুলো তলোয়ার এবং শিল্ড লাভ করল এবং কোরাইশদের তীর কোন কিছু পেতে ব্যর্থ হল। পরে আব্দুল মোত্তালিব তলোয়ার দিয়ে কা'বার দরজায় আওয়ায দেন এবং এতে একটি সোনারহরিণ ঝুলিয়ে রাখেন। কা'বার ইতিহাসে এই প্রথম সোনার মাধ্যমে কা'বা শরীফ সাজানো হল। তিনি অন্য সোনার হরিণটিকে কাবার অর্থভান্ডারে রেখে দেন।

আল্লামা ফাসী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্মের পূর্বে যখন আব্দুল মোত্তালিব যমযম কূপ খনন করেন তখন হারেস ব্যতীত তাঁর কোন ছেলে ছিল না। কিন্তু আযরাকী যোহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্মের পর আব্দুল মোত্তালিব যমযম কূপ খনন করেন। তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু তালেব যমযম কূপ পূনঃনির্মাণ করেন এবং বালক মুহাম্মদ পাথর যোগান দেন। শেষের বর্ণনাটি দূর্বল এবং আগেরটিই বেশী সহীহ। কেননা, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হারেস ব্যতীত আব্দুল মোত্তালিবের অন্য কোন সন্তানাদি ছিল না। আবু তালিব রসূলুল্লাহকে (সঃ) নিয়ে পরবর্তীতে যমযম কূপের সংস্কার করেছিলেন। এর সাথে আব্দুল মোত্তালিবের যমযম কূপ খনন করার কোন সম্পর্ক নেই।

আব্দুল মোত্তালিব তাঁর যমযম খনন করা সংক্রান্ত স্বপ্নকে প্রথমে ভেবে ছিলেন যে, এটি হয়তো কোন অশুভ মূর্দার আত্মা কিংবা জ্বিন ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে পারে। তিনি এজন্যে তা পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই নিজ ছেলে হারেসকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে কূপ খনন করতে থাকেন। যদি ঐটি শয়তানের স্বপ্ন হয়ে থাকে তাহলে অন্যরা জানলে তা লজ্জার বিষয় হবে। নচেৎ মক্কার সর্দার হিসেবে যমযম কূপের মত এত মহান কূপের খনন কাজে মক্কার অন্যান্য লোকজনের সহযোগিতার কোন অভাব হওয়ার কথা ছিল না ।

আল্লাহ্‌পাক মুহাম্মদের (সঃ) জন্মদাতাকে হেফাজত করেন

এক বর্ণনায় এসেছে যে, আব্দুল মোত্তালিব কর্তৃক যমযম কূপ সফল ভাবে খনন সম্পন্ন হলে এবং ১০ জন পুত্র সন্তান লাভ করলে একজনকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মানত করেন। পরবর্তীতে তাঁর ১০ জন পুত্র সন্তান হয়। তাদের নাম হচ্ছেঃ ১. হারেস, ২. আব্দুল্লাহ, ৩. যোবায়ের, ৪. আব্বাস, ৫. দারার, ৬. আবু লাহাব, ৭. গীদাক, ৮. হামযা, ৯. মোকাওয়াস এবং ১০. আবু তালিব। তিনি তাঁর ১০ ছেলের মধ্যে যে লটারী দেন তাতে সর্বাধিক প্রিয় ছেলে আব্দুল্লাহর নাম উঠে। তিনি হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পিতা। আব্দুল মোত্তালিব তাঁকে জবেহ করার জন্য রওয়ানা হলে আব্দুল্লাহর মামা বনু মাকযুম এবং কোরাইশ গোত্রের সর্দার,

www.pathagar.com

জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বর্গ তাতে বাধা দেয় এবং বলে, তুমি তাকে জবেহ করলে আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে তা একটি প্রথার রূপ নেবে এবং গোটা আরবে তা একটি পদ্ধতি হিসাবে চালু হবে। তারা পরামর্শ দিল যে, মদীনায় তেখাইবার নামক একজন মহিলা ভবিষ্যদ্বাণী করে। তার কাছে গিয়ে এ সমস্যার একটি সমাধান যেন নিয়ে আসা হয়। পরামর্শ অনুযায়ী আব্দুল মোত্তালিব মদীনায় যান এবং ঐ মহিলার কাছে গিয়ে গোটা ঘটনা বর্ণনা করেন। মহিলাটি বলে, আজ যাও এবং আগামীকাল আমার চাকরেরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরের দিন তারা তার কাছে পৌঁছার পর সে জানায় যে, হ্যাঁ, আমার কাছে খবর এসে গেছে। তবে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, তোমাদের দিয়াহ বা রক্তপণের পরিমাণ কত? তারা বলল, ১০টি উট। সে বলে তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও বরং ১০টি উট ও লোকটির মধ্যে লটারী দাও। লটারীতে উট উঠলে সে উটগুলো জবেহ কর। আর যদি লোকটি উঠে তাহলে এর সাথে আরোও ১০টি করে উট যোগ করে লটারী দিতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমাদের রব তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়। আব্দুল মোত্তালিব মক্কায় ফিরে আসার পর ৯বার লটারী দেয় এবং প্রতিবারই আব্দুল্লাহর নাম উঠে। দশমবারে উটের পরিমাণ যখন একশতে দাঁড়ায় তখন উটের নাম উঠে। আব্দুল মোত্তালিব বলেন, আমি তিন বার লটারী না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ইনসাফ করছি বলে মনে হচ্ছে না। কোরাইশগণ বলেছে, আব্দুল মোত্তালিব তুমি একশত উট জবেহ দাও। তোমার রব সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু আব্দুল মোত্তালিব তিনবার একশত উট এবং আব্দুল্লাহর মাঝে লটারী দেওয়ার পর প্রত্যেকবারই ১০০ উট উঠাতে প্রশান্ত হন। তিনি উপত্যকা, গিরিপথ এবং পাহাড়ের চূড়ায় ঐ সকল উট জবেহ করেন এবং কোন মানুষ, হিংস্র প্রাণী ও পাখীকে গোস্ত খাওয়া থেকে বাধা দেয়া হয়নি তবে তাঁর সন্তানেরা কেউ ঐ গোশত খায়নি, ফলে বহু বেদুইন মক্কায় এসে জড় হয় এবং বহু নেকড়ে বাঘ ঐ সকল উটের গোশত খেতে আসে। উটের মাধ্যমে এটাই হচ্ছে প্রথম দিয়াহ বা রক্তপণ। পরবর্তীতে ইসলামে এই রকম পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এই ভাবে আল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্মদাতা পিতাকে হেফাজত করেন এবং তার ঔরসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্মকে সুনিশ্চিত করেন।

সেই দিনই আব্দুল মোত্তালিব ঘরে ফেরার পথে ওহাব বিন আবদে মন্নাফ বিন কিলাবকে মসজিদে হারামে বসা দেখতে পান। তিনি মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি নিজ কন্যা আমিনাকে আব্দুল্লাহর সাথে বিবাহ দেন। রসূলুল্লাহর (সঃ) এর নানার বাড়ী হচ্ছে মক্কায়, মদীনায় নয়। তার মা বাপ দুজনই কোরেশী ছিলেন। ফাসী বলেন, আব্দুল মোত্তালিবের অনেক উট ছিল। হজ্ব মওসুমে তিনি সকল উটকে জড় করে দুধ দোহন করে তাতে মধু মিশিয়ে যমযমের পাশে চামড়ার বড় মশকে হাজীদের পান করার উদ্দেশ্যে রেখে দিতেন। এ ছাড়াও তিনি কিসমিস খরিদ করে তা যমযমের পানিতে ভিজিয়ে মদ তৈরি করতেন। কেননা, তখন যমযমের পানি ভারী ও লবণাক্ত ছিল। আমৃত্যু তিনি ঐ কাজ অব্যাহত রাখেন এবং হাজীদেরকে পানি পান করান।

www.pathagar.com

যমযমের পানি নেক্কারদের পানীয়, ক্ষুধা নিবৃত্তিকারক ও রোগের ঔষধ

আযরাকী লিখেছেন, ওহাব বিন মোনাব্বেহ যমযম সম্পর্কে বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, এটি আল্লাহ্‌র কিতাবে উত্তম, কল্যাণকর, নেক্‌কারদের পানীয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিখিত আছে।

আযরাকী যানজী থেকে এবং তিনি ইবনে খায়সম থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার ওহাব বিন মোনাব্বেহ আমাদের কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিল কিছু যমযমের পানি। আমরা বললাম, আপনি কিছু মিষ্টি পানি (স্বাভাবিক পানি) কেন পান করছেন না? যমযমের পানি তো যথেষ্ট লবণাক্ত। তখন তিনি জবাব দেন, আমার অসুখ ভাল হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কোন পানি পান করবো না। যার হাতে ওহাবের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র কিতাবে এটি যমযম হিসেবে লিখিত; এটি কখনও শুকাবে না এবং ক্ষতিকর হবে না; এটি আল্লাহর কিতাবে উপকারী এবং নেককার লোকদের পানীয় হিসেবে লিখিত আছে; এটি আল্লাহ্‌র কিতাবে উত্তম বলে বিবেচিত; এটি আল্লাহ্‌র কিতাবে ক্ষুধা নিবারণ এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। ওহাবের প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, কেউ যদি পেট ভর্তি করে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ত করে তা পান করে অবশ্যই তার রোগের চিকিৎসা হবে এবং সে রোগমুক্ত হবে।

মুজাহিদ বলেনঃ যমযমের পানি যে যে নিয়তে পান করবে তার সেই নিয়ত পূরণ হবে; তুমি যদি রোগ মুক্তির জন্যে তা পান কর তাহলে, আল্লাহ্‌ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। যদি তুমি পিপাসা মিটানোর জন্যে পান কর, তাহলে, আল্লাহ তোমার পিপাসা নিবারন করবেন। যদি তুমি ক্ষুধা দূর করার উদ্দেশ্যে তা পান কর তাহলে, আল্লাহ্‌ তোমার ক্ষুধা দূর করে তৃপ্তি দান করবেন। এটি জিবরাঈলের (আঃ) পায়ের গোড়ালীর আঘাতে হযরত ইসমাইল (আঃ) এর পানীয় হিসেবে তৈরি হয়েছে।
সুফিয়ান ইবরাহীম থেকে এবং তিনি ইবনে আবি হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সোহাইল বিন আমরের কাছে যমযমের পানি উপহার পাঠিয়েছিলেন। (আযরাকী)

একরামা বিন খালেদ বলেন, একদিন গভীর রাতে আমি যমযমের পাশে বসা ছিলাম। তখন একদল সাদা কাপড় পরিহিত লোক কা'বার তওয়াফ করছিলেন। এমন ধবধবে সাদা কাপড় আমি আর কখনও দেখিনি। তওয়াফ শেষে তাঁরা আমার কাছে নামায পড়লেন এবং একজন তাঁর অন্য সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, চল আমরা নেক লোকদের পানীয় পান করি। তাঁরা যমযমে প্রবেশ করলেন। আমি ভাবলাম, আমি তো তাঁদেরকে তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। তারপর আমি তাঁদের কাছে গেলাম, দেখলাম সেখানে কোন মানুষের নাম-গন্ধও নেই। (আযরাকী)
হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের সময় লোকেরা একবার ভীষণ অভাবের সম্মুখীন হয়। ফলে খাবার সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন লোকেরা যমযমের পানির জন্যে ছুটে আসে, পরিবার সমূহ

www.pathagar.com

শিশুদেরকে নিয়ে ভোরে যমযমে হাজির হত। তখন শিশুদের বাঁচানোর জন্যে যমযমকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হত।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'যমযমের পানি যে যে নিয়তে পান করবে তার সেই নিয়ত পূরণ হবে।' (ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ যমযমের পানি যে যে মকসুদে পান করবে, তার সেই মকসুদ পূরণ হবে; যদি তুমি এই পানি রোগ মুক্তির জন্যে পান কর তাহলে, আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন; যদি তুমি পিপাসা মিটানোর জন্যে এই পানি পান কর তাহলে, আল্লাহ্ তোমার পিপাসা দূর করবেন। এটি জিবরাঈলের পায়ের আঘাতে ইসমাইলের পানীয় হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করা মুনাফেকী থেকে মুক্তির কারণ।'

সাঈদ উসমান থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে, তিনি একজন আনসার থেকে এবং ঐ আনসার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ আমাদের সাথে মোনাফেকদের পার্থক্য হচ্ছে, তারা পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তোমরা নেক লোকদের মোসল্লায় নামায আদায় কর এবং দ্বীনদার লোকদের পানীয় পান কর। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নেককারদের মোসল্লা এবং দ্বীনদারের পানীয় বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দেন, নেককারদের মোসল্লা হচ্ছে মীযাবের নীচে নামায পড়া এবং দ্বীনদারের পানীয় হচ্ছে যমযমের পানি।

হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নবুওতের খবর জানতে পেরে তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে নিজ গোত্র থেকে মক্কায় রওনা হন। মক্কায় এসে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে কাফেররা তাঁকে পাথর মেরে বেহুশ করে ফেলে এবং তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি যমযমের কাছে গিয়ে পানি দিয়ে রক্ত ধুয়ে ফেললাম এবং যমযমের পানি পান করলাম। হে ভাতিজা (আবদুল্লাহ বিন সামেত)! শোন, আমি সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর অপেক্ষায় ৩০ দিন বা রাত (অন্য রেওয়াতের ১৪ দিন) অবস্থান করি। কিন্তু সেখানে যমযম ছাড়া আমার আর অন্য কোন খাবার ছিল না। অথচ, আমি মোটা সোটা হয়ে গেলাম এবং পেটের উপর চামড়ার ভাঁজ পড়ে গেল। এমনকি আমি পেটে সামান্য ক্ষুধাও অনুভব করলাম না। দীর্ঘ একমাস কা'বার পাশে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে বুঝতে পেরে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে নিয়ে যান। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতদিন এখানে কি খেয়ে ছিলে? তিনি জবাব দিলেন, আমি যমযমের পানি ছাড়া আর কিছুই খাইনি। এতে আমি মোটা হয়ে গেছি এবং আমার পেটের চামড়ার উপর ভাঁজ পড়ে গেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, এটি ক্ষুধার সময় খাবারের কাজ করে।

সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ 'যমীনের উপর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি।'

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বুক চিরে হৃদয় বের করে আনেন এবং সোনার প্লেটে রাখেন।

www.pathagar.com

সেখান থেকে একটি রক্তের চাকা ফেলে দিয়ে বলেন, এটি তোমার মধ্যে শয়তানের একটি অংশ ছিল। তারপর যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে তিনি তা যথাস্থানে রেখে দেন। ঐ সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মাঠে তাঁর অন্য খেলার সাথীদের সাথে খেলা ধূলা করছিলেন। হাফেজ ইরাকী বলেছেন, যমযমের পানি দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বক্ষদেশ ধোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি যেন আসমান-যমীন এবং বেহেশত-দোযখ দেখার মত শক্তি লাভ করেন। কেননা, যমযমের পানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং ভয় দূর করে।

যমযমের পানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নির্দেশে যমযমের পানি দ্বারা জ্বর দূর হয়েছে। নাসাঈ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দাহ্হাক বিন মোযাহেম বলেন, মাথা-ব্যথার সময় যমযমের পানি পান করলে মাথা-ব্যথা দূর হয়।

ইমাম বদরুদ্দিন বিন সাহেব মিসরী বলেছেন, চিকিৎসার দৃষ্টিতে যমযমের পানি পৃথিবীর অন্য যে কোন পানির চাইতে উত্তম। তিনি বলেন, আমি যমযমের পানি এবং মক্কার অন্য কূপের সমপরিমাণ পানি ওজন করে দেখেছি, যমযমের পানির ওজন এক চতুর্থাংশ বেশী। কথিত আছে যে, শাবান মাসের রাত্রে যমযমের পানি মিষ্টি হয়ে যায় এবং তা নেককার লোক ছাড়া অন্য কেউ টের পায় না। শেখ আবুল হাসান কারবাজ একবার তা দেখতে পেয়েছেন।

ফাকেহী রসূলুল্লাহ্ (সঃ) থেকে এক মোরসাল রেওয়াতে (মোরসাল হচ্ছে তাবেঈ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করা) বলেন, মাকহুল বলেছেন, 'যমযমের প্রতি নজর করা এবাদত। কেননা, এর ফলে গুণাহ মাফ হয়।'

সাঈদ বিন সালেম উসমান বিন সাজ থেকে তিনি মোকাতেল থেকে, তিনি দাহ্হাক থেকে এবং তিনি মোযাহেম থেকে বর্ণনা করেন, এমন একদিন আসবে যখন যমযমের পানি নীলনদ এবং ফোরাত নদীর পানি থেকেও অধিকতর মিষ্টি হবে।

আল-জামে আল-লতীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে হযরত জাবের থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযম কূপের পানি পান করবে, তাঁর গুণাহ যত বেশীই হউকনা কেন তা মাফ হয়ে যাবে।

জামে সগীরে আল্লামা মানাওয়ী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যমযমের উৎপত্তি হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ছেলে ইসমাইলের সাহায্যের জন্যে। আজও যদি কেউ ইখলাসের সাথে সেই পানি ব্যবহার করে তাহলে সেও আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করবে।

হাকীম তিরমিজী বলেন, যমযমের পানি থেকে উপকার পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে নিয়তের গভীরতা ও পরিপক্কতার উপর। খালেস নিয়তে ঐ পানি ব্যবহার করলে তার উপকার অবশ্যম্ভাবী।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যমযমের পানি পান করেন

আম্বরাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তওয়াফে এফাদা শেষে এক বালতি যমযমের পানি তোলার জন্যে বলেন। তিনি সেই

www.pathagar.com

পানি দিয়ে অজু করেন এবং বলেন, হে বনি আবদুল মোত্তালিব, তোমরা পানি তোল, তোমরা পানি না উঠালে অন্যরা তোমাদেরকে ঐ কাজ থেকে বঞ্চিত করবে।

আতাবিন আবি রেবাহ বলেন, তওয়াফে এফাদার পর যমযমের পানি পান করতে আমার কখনও ভুল হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর এই সুন্নত অনুসরণের উদ্দেশ্যে আগে আমি অন্য লোকদের সাথে মিলে পানি তুলে পান করতাম। কিন্তু পরে যখন আমি বুড়ো হয়ে গেলাম তখন অন্য লোকরা পানি তুলে দিত এবং আমি তা পান করতাম। পিপাসা না থাকলেও শুধু সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যেই আমি তা করতাম। কোন কোন সময় আমি খেজুর মিশ্রিত মিষ্টিপানি (নাবীজ) পান করতাম এবং কোন সময় করতাম না। যমযমের পানি পান করা যে সুন্নত এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

যমযমের পানি কিভাবে পান করতে হয়

আযরাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সঃ) এর জন্যে এক বালতি যমযমের পানি তুলতে দেখি এবং তাঁকে তা দাঁড়িয়ে পান করতে দেখি। হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বিসমিল্লাহ্ বলে বালতি ধরেন এবং অনেকক্ষণ যাবত পানি পান করেন। তারপর মাথা উপরের দিকে তুলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এইভাবে তিনি তিনবার পানি পান করেন। দ্বিতীয় বার আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময় এবং তৃতীয় বার আরো কম সময় ধরে তিনি পানি পান করেন।

ইমাম তকী ফাসী বলেন, যমযমের পানি পান করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছেঃ পানি পানকারী কেবলামুখী হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনবার শ্বাস নেবে, পেট ভরে পানি পান করবে, পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে এবং পানি পান করার সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যে দোয়া পড়েছিলেন সে দোয়া পড়বে। ইবনে আব্বাস যমযমের পানি পান করার সময় নিম্মোক্ত দোয়া পড়তেনঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফি'য়ান ওয়া রিযক্কান ওয়াসিয়ান ওয়া শিফায়ান মিন্ কুল্লি দায়ীন" এই দোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং অন্যান্য কল্যাণকর দোয়াও পড়া ভাল।

উলামায়ে কেরামের মতে, ডান হাতে গ্লাস নিয়ে কিবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ বলে দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করতে হবে। তিন শ্বাসে পানি পান করবে। পান শেষে আল্লাহ্র হামদ প্রকাশ করবে এবং পেট ভরে পানি পান করবে।

হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব বনি আব্বাসের

আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের উপর পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়। তায়েফে তার আঙ্গুর বাগান ছিল। তিনি সেই বাগান থেকে কিসমিস সংগ্রহ করতেন এবং তায়েফবাসীদের কাছ থেকে আরো অতিরিক্ত কিসমিস কিনে তা দিয়ে মদ তৈরি করে হাজীদেরকে পান করাতেন। এই অবস্থা আইয়ামে জাহেলিয়াত এবং ইসলামের ১ম যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তারপর মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আব্বাস থেকে পানি পান করানোর দায়িত্ব এবং উসমান বিন তালহা থেকে কা'বার সেবার দায়িত্ব ও চাবি নিজ হাতে নেন। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ), রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে গিয়ে হাত পাতেন এবং বলেন, ইয়া

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ, আপনার জন্যে আমার মা-বাপ কোরবান হউক। আমাকে কা'বার সেবা, চাবি ও পানি পান করানোর দায়িত্ব দিন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, জাহেলিয়াতের খুন, সম্পদ ও প্রতিশোধ সহ সব কিছু আমার দুই পায়ের নীচে। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের সকল পদ্ধতি ও সেবা বাতিল। শুধু কা'বার সেবা এবং হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব অপরিবর্তিত থাকবে। এ গুলো জাহেলিয়াতের সময় যে রকম ছিল সে রকমই অব্যাহত থাকবে। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) পানি পান করানোর দায়িত্ব পুনরায় পান।

বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) যমযম কূপের কাছে যান এবং যমযম কূপ থেকে বড় এক বালতি পানি ভর্তি করার আহ্বান জানান। পানি পান করানোর অধিকার হচ্ছে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর। তাই তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি নিজ হাতে পানি না উঠিয়ে তাদেরকেই পানি উঠাতে বলেন। তিনি বলেন, হে আবদুল মোত্তালিবের সন্তানেরা। পানি উঠাও। নচেৎ অন্যরা তোমাদেরকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। তিনি নিজে আব্দুল মোত্তালিবের সন্তান হওয়া সত্বেও নিজ হাতে এজন্য পানি উঠাননি যাতে করে পরবর্তীতে অন্যরা তার অনুসরণে পানি না উঠায়। কেননা, এতে বনি আব্বাস ঐ কাজ থেকে বঞ্চিত হবে।

আমরা পেট ভরে যমযমের পানি পান করেছি

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তওয়াফ শেষে যমযমের পানি পান করা সুন্নত। বর্তমানে যমযমের কূপ-কূপ আকারে নেই। কূপের তলায় পাকা জায়গায় সারিবদ্ধ ভাবে পানির ট্যাপ স্থাপন করা আছে। এখানেই ট্যাপ থেকে হাজীগণ / ওমরাকারীগণ পানি পান করে থাকেন। কূপের এক পাশে সংরক্ষিত একটি স্থান রয়েছে যেখান থেকে মোটা ব্যাসের পাইপের সাহায্যে যমযম কূপের পানি যথাস্থানে / বিভিন্ন স্থানে অনবরত সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপ ছাড়াও মাতাফের বিভিন্ন স্থানে এবং মসজিদে হারামের বাইরের চত্বরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পানির ট্যাপ রয়েছে। অধিকন্তু, মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে কিছুদূর পর পর শীতল ও নর্মাল যমযমের পানির ড্রাম রয়েছে। যমযমের কূপে ভিড় হলে সে সব ট্যাপ থেকেও অনায়াসে পানি পান ও সংগ্রহ করা যায়। আমরা প্রত্যেহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে পেট ভরে যমযমের পানি পান করেছি এবং প্রস্থানের সময় বোতল ভর্তি করে বাসায় বহন করে নিয়েছি। অনেকেই এমনটি করে থাকেন।

যমযমের ঠান্ডা পানি পান না করাই শ্রেয়। কারণ, সেক্ষেত্রে কাশির আশংকা রয়েছে যা সহজে নিরাময় হয় না। ড্রামের গায়ে সবুজ কালিতে লিখা যমযমের 'নর্মাল' পানি বেছে নিতে হবে।

সাফা মারওয়ার পাদদেশে

যমযমের পানি পান ও যমযমের কুয়ার পাশে নামাজ সমাপনান্তে আমরা সায়ীর উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে সিড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলাম। দ্বিতলে হাজীদের তেমন ভিড় নেই। আমরা সাফা বরাবর এসে খানায়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট দোয়াটি পড়ে সায়ী শুরু করলাম।

www.pathagar.com

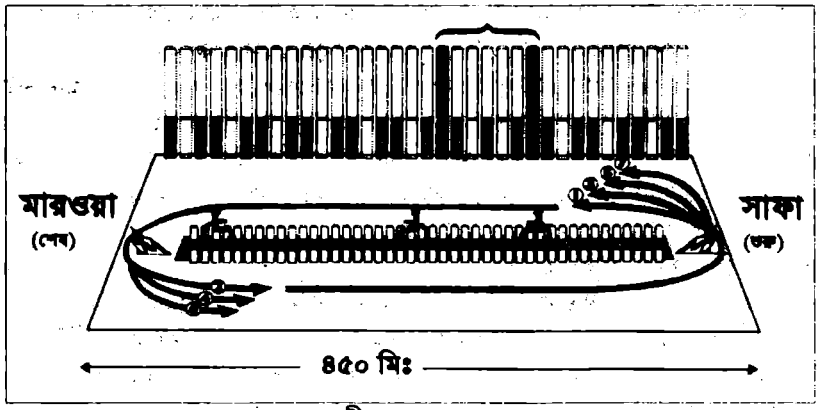

সায়ী শুরু করার স্থান

সায়ীর স্থানটি বড়ই বরকতময়। হাজার (আঃ) এ জায়গাতেই শিশু ইসমাইলের (আঃ) জন্যে পানির খোঁজে একবার সাফা একবার মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করেছেন। ঘটনাটির বিস্তারিত ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হাজারের স্মরণে কেয়ামত পর্যন্ত হাজী সাহেবগণ সাফা মারওয়া দৌড়াবেন। কতবড় ভাগ্যবতী সেই মহিলা! কোটি কোটি হাজী তাঁর আত্মত্যাগ স্মরণ করছেন। অথচ মহিলারা নাকি অবহেলিত!

সা'য়ীর অর্থ হচ্ছে, সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া। সাফা থেকে মারওয়ায় গেলে ১ম সায়ী এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসলে ২য় সায়ী সমাপ্ত হয়। এভাবে, ৭ বার সায়ী করতে হয়। ওমরাহ এবং হজ্জের জন্যে এই সায়ী জরুরী।

হযরত হাজারের অনুসরণে সাফা মাওয়ায় ৭ বার সায়ী করার আদেশের পেছনে যে হেকমত রয়েছে তা হচ্ছে, এর মধ্যে যে শিক্ষা, আনুগত্য, নবীদের সুন্নতকে জীবিত করণ এবং আল্লাহর পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়সমূহ রয়েছে সেগুলোকে আত্মস্থ করা, অনুশীলন করা এবং বাস্তব জীবনকে সেই আলোকে গড়ে তোলা। এ মর্মে হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ, সাফা মারওয়ায় সায়ী এবং শয়তানকে কংকর মারার মধ্যে আল্লাহর জেকর ও স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য।" তবে সায়ীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জোরে হাঁটতে হয়। তওয়াফের ১ম তিন চক্করেও জোরে হাঁটতে হয়। এই জোরে হাঁটা অর্থাৎ রমল করা এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দূর্বল হয়ে পড়েন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে মক্কায় ওমরা করতে আসেন। তখন মক্কার মোশরেকরা বলল, মুসলমানরা মদীনার জ্বরে দূর্বল হয়ে পড়েছে। তারা এখন তোমাদের কাছে মক্কায় আসছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই ঘটনা শুনে নির্দেশ দেন, সাহাবায়ে কেরাম যেন তওয়াফের প্রথম চক্করে রমল করে অর্থাৎ জোরে হাঁটে। মোশরেকরা হাজরে আসওয়াদ বরাবর, একটু দূরে বসে সব লক্ষ্য করছে। এবার তারা বলাবলি শুরু করেছে যে, যাদেরকে তোমরা জ্বরাক্রান্ত দূর্বল লোক বলে মন্তব্য

www.pathagar.com

করেছিলে, আজকে তারা আমাদের চাইতেও বেশী শক্তিশালী মনে হচ্ছে। ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক চক্করেই রমল করার নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু পরে তা স্থায়ী হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি ঐ নির্দেশ থেকে বিরত থাকেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী)।

পবিত্র স্থানসমূহের যে সকল জায়গায় দোয়া কবুল হয়, সাফা-মারওয়া তার অন্যতম। এই জন্যে এই দুই স্থানে দোয়া করা উচিত। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ের উপর উঠেন এবং বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া করেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাফা পাহাড়ের কাছে এসে এই আয়াতটি পড়লেন- 'ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়ায়িরিল্লাহ্' তারপর বললেন, আল্লাহ যে ভাবে আয়াতে শুরু করেছেন আমিও সেই ভাবেই শুরু করবো। তারপর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন। বাইতুল্লাহ দেখে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে এই দোয়াটি পড়লেন।

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী ও প্রশংসা শুধু তাঁরই, তিনি সকল জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দল ও গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছেন।" এ দোয়াটি তিনি তিনবার পড়েন এবং আরো দোয়া করেন। তারপর তিনি মারওয়ায় আসেন এবং সাফা পাহাড়ের অনুরূপ করেন।

সাফা মারওয়া আল্লাহ্‌পাকের একটি অন্যতম নিদর্শন। এর ইতিহাস কখনো বিস্মৃত হবার নয়। পরিপূর্ণ ফায়েজ ও বরকতের জন্যে সাফা ও মারওয়া পাহাড় সম্পর্কে হাজীদের সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরী।

সাফা-মারওয়া

www.pathagar.com

সাফা পাহাড় অপেক্ষাকৃত কম উঁচু জাবালে আবু কোবায়েসের একটি অংশ। সেটি বর্তমানে, বাবুস সাফা সংলগ্ন। এটি মসজিদে হারামের দক্ষিণে অবস্থিত।
অপরদিকে, মারওয়া হচ্ছে মসজিদে হারামের পূর্ব-উত্তরে কুআইকাআন পাহাড়ের একটি অংশ। মারওয়া পাহাড়ও অপেক্ষাকৃত নীচু। এটি বাবুল মারওয়া সংলগ্ন।
সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটিকে মাসআ বলা হয়। এ রাস্তা দিয়েই দুই পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করতে হয়। রাস্তাটির (মাসআ) দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০৫ মিটার। সাধারণতঃ এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় পর্যন্ত একবার সায়ী করতে ৬/৭ মিনিট এবং মোট ৭ বার সায়ী করতে ৪০/৫০ মিনিট সময় লাগে। ভিড়ের সময় এবং বয়স্ক লোকদের সায়ীতে আরো বেশী সময় লাগে।

জাহেলিয়াতের যুগে সাফা পাহাড়ে আসাফ নামক একটি মূর্তি এবং মারওয়ার উপর নায়েলা নামক অন্য আরেকটি মূর্তি ছিল। লোকেরা তখন বাইতুল্লাহর তওয়াফ শেষে ঐ মূর্তি দুটো মসেহ করত। মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানরা সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে ইতস্তত বোধ করে। কেননা, এর সাথে জাহেলিয়াতের কর্মকান্ডের যদি সামঞ্জস্য হয়ে যায়। এ জন্যে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে মুসলমানদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করেন। আল্লাহ বলেন, 'সাফা এবং মারওয়া নিশ্চয়ই আল্লাহর নিদর্শন গুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি হজ্ব কিংবা ওমরা করে, তার জন্যে এই পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করা গুনাহর বিষয় নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা ও উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং এর মূল্য দান করবেন।
রসূলুল্লাহ (সঃ) সাফা ও মারওয়ায় সায়ীর ব্যাপারে বলেন, প্রথমে সাফা থেকে সায়ী শুরু কর। কেননা, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজেও প্রথমে সাফার কথা উল্লেখ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের উপর সায়ী করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা সায়ী কর।

ইমাম আহমদ সফিয়া বিনতে শায়বা থেকে এবং তিনি হাবীবা বিনতে আবি তাজরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হাবীবা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে দেখেছি। তিনি পেছনে এবং লোকেরা তাঁর সামনে ছিল। বেশী করে সায়ী করার সময় তাঁর ইযার সরে যাওয়ায় আমি তাঁর হাঁটু মোবারক দেখি। তিনি বলেন,তোমরা সায়ী কর। আল্লাহ সায়ীকে তোমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লামা উমরী লিখেছেন, সাফা পাহাড় নীল পাথর বিশিষ্ট এবং জাবালে আবু কোবায়েসের মূল থেকে উৎসারিত। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূঁড়ায় উঠার জন্য পাথর কেটে ১২টি সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সায়ীকারীরা ইচ্ছা করলে, সর্বোচ্চ চূঁড়ায় উঠতে পারতেন। মারওয়া কুয়াইকাআন পাহাড়ের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। দুটোর মধ্যে একটু খালি জায়গা আছে। এখানেও পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠার জন্যে অনেকগুলো সিঁড়ি আছে। রাদি বিন খলীল আল মালেকী বলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠার জন্যে ১২টি সিঁড়ি এবং মারওয়ায় উঠার জন্য ১৫টি সিঁড়ি আছে।
ইবনে বতুতা তাঁর সফর অভিজ্ঞতায় লিখেন, সাফা পাহাড়ে উঠার জন্য ১৪টি সিঁড়ি এবং মারওয়া পাহাড়ে উঠার জন্য ১৫টি সিঁড়ি আছে।

www.pathagar.com

আযরাকী উল্লেখ করেছেন, আব্বাসী খলিফা আবু মনসুরের সময় মক্কার গভর্ণর আবদুস সামাদ বিন আলী সাফা পাহাড়ে ১২টি এবং মারওয়ায় ১৫টি সিঁড়ি নির্মাণ করেন। তারপর খলিফা মামুনের সময় সেগুলোতে সাদা চুনার প্রলেপ দেয়া হয়। লোকেরা ইচ্ছামত উপর পর্যন্ত উঠানামা করতে পারত। কিন্তু বিগত ১৩০০ বছর পর্যন্ত কোন শাসক কিংবা ধনী ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাসআকে পাকা করা কিংবা রোদের তাপ থেকে সায়ীকারীদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কোন ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেননি এবং এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। শুধু সাফা মারওয়ার সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাই দুটো পাহাড়ে উকুদ বা সৌন্দর্যের প্রতীক ছোট মিনারার মত তৈরি করা হয়েছে।

১৩৩৯ হিজরীতে, বাদশাহ শরীফ হোসাইন বিন আলীই সর্বপ্রথম মাসআয় ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেন। এতে নীচে লোহার খুঁটি দিয়ে উপরে কাঠের ছাদ তৈরি করা হয়। ১৩৪৫ হিজরীতে, বাদশাহ আবদুল আযীযের নির্দেশক্রমে মাসআ'কে পাকা করা হয়। এতে সায়ীকারীদের সায়ী করতে যথেষ্ট আরাম হয়। হজ্ব ফরজ হওয়ার পর থেকে প্রথম এই রাস্তা বা মাসআ পাকা করা হল। এতে, মূল্যবান মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে।

সৌদী শাসনামলে, ১৩৭৫ হিজরীতে, যখন মসজিদে হারামের বৃহত্তর সম্প্রসারণ করা হয় এবং তিন তলা বিশিষ্ট মসজিদে হারাম নির্মাণ করা হয়, তখন সাফা-মারওয়ার উপর দোতলা বিল্ডিং তৈরি করা হয়। ফলে, নীচতলা এবং দোতলার উপর দিয়ে মাসআয় সায়ী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। হজ্বের মওসুমে, ভিড়ের সময় এই দোতলা-মাসআর কারণে সায়ীকারীদের খুব বেশী উপকার হয়।

মাসআর নীচতলার দেয়ালে, ২৮টি এয়ার কুলার বসানো হয়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে গরমের সময় আবহাওয়া ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও মাসআর উপর দিয়ে ৬টি ওভারব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ভিড়ের সময় লোকেরা ওভার ব্রীজ দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করে এবং ঐদিকে পারাপারকারী লোকদের কারণে, সায়ী কারীদের সায়ীতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। ওভার ব্রীজ নির্মাণের পূর্বে ঐ দিকের মুসল্লীরা, সায়ীকারীদের সায়ীতে বাধা সৃষ্টি করে মসজিদে যাতায়াত করত।

সৌদী আমলে, সাফা-মারওয়ার মাঝের যে অংশ একটু জোরে হাঁটতে হয় বা দৌড়তে হয় সেই অংশটুকুর দুই প্রান্ত সীমানায় সবুজ বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছে। এগুলো ২৪ ঘন্টা আলো দিচ্ছে। সায়ীকারীরা সেই আলোর কাছে এসে দৌড় শুরু করে এবং অন্য বাতিটির কাছে গিয়ে দৌড় বন্ধ করে।

মাসআর রাস্তার মাঝখানে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ ও বয়স্ক লোকদের হুইল গাড়ীতে বসে সায়ী করার জন্যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক দেড়হাত উঁচু তিনটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং এগুলোতে মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে। অসুস্থ ও বয়স্ক লোকেরা পয়সার বিনিময়ে ঐ সব গাড়ীতে করে সায়ী করে। আবার নিজের সাহায্যকারী লোক থাকলে বিনা পয়সায় হুইল গাড়ী এনে সায়ী করা যায়। হারামাইন প্রশাসনের পক্ষ থেকে, লোক মারফত সায়ী করলে তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত করে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে এবং যারা হুইল গাড়ী বিনা পয়সায় নিতে চায় তাদেরকে তা সরবরাহ করা হয়।

সাফা মারওয়াকে আজকাল মসজিদে হারামের বিল্ডিং এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে, ভিতরে না আসলে এটি যে মসজিদে হারাম থেকে ভিন্ন জিনিস তা বুঝা যায় না। তবে মসজিদে হারামের ঐ অংশের দৈর্ঘ্য সাফা-মারওয়ার দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম।

নবীর (সঃ) যামানায় সাফা-মারওয়া

নবী পাকের (সঃ) যামানায় সাফা-মারওয়ার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন সাফা পাহাড়ের উপর উঠে আওয়ায দিলেন যে, ইয়া সাবাহাহ্ অর্থাৎ হায় সকাল। এই আওয়ায শুনে কোরায়েশ গোত্রসমূহ তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের তাওহীদ, তাঁর রেসালত এবং রোয কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিলেন। এ ঘটনার একটি অংশ সহীহ বোখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

'হে নবী! তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করো।' কোরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে আওয়ায দিলেন, হে বনি ফিহর, হে বনি আদী! এই আওয়ায শুনে কোরায়েশদের সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হলো। যিনি যেতে পারেননি তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, কি ব্যাপার সেটা জানার জন্যে । কোরায়েশরা এসে হাযির হল, আবু লাহাবও তাদের সঙ্গে ছিল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা বলো যদি আমি তোমাদের বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড় সওয়ার আত্মগোপন করে আছে, ওরা তোমাদের উপর হামলা করতে চায়, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব, কারণ আপনাকে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শোনো, আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি। আবু লাহাব বলল, তুমি ধ্বংস হও। তুমি আমাদেরকে এ কথা বলার জন্যে এখানে ডেকেছ?

আবু লাহাবের এ উক্তি করার পর আল্লাহ পাক সূরা লাহাব নাযিল করেন। এতে বলা হয় আবু লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

এই ঘটনার আরেক অংশ ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'নিকটাত্মীয়দের আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করো।' এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওয়ায দিলেন। সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে। তিনি বললেন, 'হে কোরায়েশ দল, তোমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে বনি কা'ব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। যেহেতু তোমাদের সাথে

www.pathagar.com

আমার আত্মীয়তা রয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে যথাসম্ভব সজাগ করবো।'

এখানে সাফা পাহাড়ের কাছেই ছিল দারে আরকাম যা ছিল ইসলামের প্রথম তবলীগ ও প্রচার কেন্দ্র। ইবনে ইসহাক বলেন যে, একদিন মুসলমানগণ মক্কার এক প্রান্তরে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় একদল মুশরিক তাঁদেরকে দেখে ফেলে এবং ধর্মাদ্রোহী বলা শুরু করে। কথায় কথায় লড়াইয়ের উপক্রম হয় এবং হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস (রাঃ) একজনের প্রতি একটা উটের হাড় ছুঁড়ে মারেন এবং তার মাথা ফেটে যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে হিশাম এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু হাকেম উমারী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির মাথা ফেটে যায় সে ছিল বনী তাইমের আবদুল্লাহ বিন খাতাল। তারপর নবী (সঃ) অবিলম্বে সাফার নিকটবর্তী হযরত আরকাম বিন আবি আরকামের গৃহকে বৈঠকাদি এবং দাওয়াত ও তাবলিগের কেন্দ্রে পরিণত করেন। এতে করে লোক এখানে একত্র হয়ে নামাযও পড়তে পারবে এবং যারা গোপনে মুসলমান হতে থাকবে তারা এখানে আসতেও থাকবে। ইসলামের ইতিহাসে এ দারে আরকাম চিরন্তন খ্যাতি লাভ করে। তিন বছরের গোপন দাওয়াতের কাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ্যে জন সাধারণের মধ্যে দাওয়াত শুরু হওয়ার পরও এটি মুসলমানদের কেন্দ্র হয়ে যায়। হুযুর (সঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানে এসে মুসলমানগণ তাঁর সাথে মিলিত হতেন। শিয়াবে আবিতালিবে বন্দী থাকার পূর্ব পর্যন্ত এ ছিল ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র। দারে আরকাম ইতিহাস খ্যাত আরেকটা ঘটনার জন্যে বিখ্যাত। তা হল হযরত ওমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণ। এখানেই তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নবীপাককে (সঃ) কতল করার জন্যে এসে আল্লাহর কুদরতের শা'নে নবী পাকের (সঃ) পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন এবং সেই নাঙা তলোয়ার হাতে ইসলামের ঝান্ডা উচ্চকিত করার স্বার্থে বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণ করেন।

বলা বাহুল্য, হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা দিয়ে তিনি নিজেই বলেনঃ "মহানবীর (সঃ) শত্রুতায় আমি তখন সবার শীর্ষে। উন্মুক্ত তরবারি হাতে একদিন মক্কার পথে ঘুরছি। জনৈক কোরাইশী আমাকে জিজ্ঞেস করলঃ হে ইবনে খাত্তাব! কোথায় যাচ্ছ? বললাম, উদ্দেশ্য তো সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ))! সে বললঃ তুমি বলছ সে ব্যক্তি, তোমার বোনই তো তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছে। সেখান থেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়ে আমি বোনের বাড়ীর দরজার কড়া নাড়লাম। আওয়াজ আসল - কে? বললাম-ওমর। তারা তখন হাতে নিয়ে কোরআন পাঠ করছিল। আমার আওয়াজ শুনা মাত্রই কোরআন রেখে সবাই আত্মগোপন করে। আমার বোন দরজা খোলা মাত্রই তাকে বললাম -হে আপন জানের দুশমন তুই কি বিধর্মী হয়ে গেলি? (১) তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, সজোরে মাথায় আঘাত করলে সে ক্রন্দন করে বলল ঃ হে ইবনে খাত্তাব! যা ইচ্ছা তাই কর, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতঃপর আমি যেয়ে চৌকিতে বসলাম, দেখি সেই কিতাব (কোরআন) পড়ে রয়েছে। আমি বললাম-এটা কি কিতাব? বোন উত্তর দিলঃ রাখ এটা, তুমিতো নাপাক, অপবিত্র। আর পবিত্র লোক ব্যতীত এটি ছোঁয়া নিষেধ।" যাই হোক

www.pathagar.com

বিধিমত তৈরী হলে কিতাব সে আমাকে দিল। লক্ষ্য করলাম তাতে রয়েছেঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

'আররাহমানির রাহীম' পাঠ করতেই আমার মনের চিন্তা হল- কোন ধাতু থেকে শব্দ দুটি নির্গত? অতঃপর আপন মনেই পড়তে শুরু করলামঃ " আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে, তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি যুগপৎ গুপ্ত ও ব্যক্ত আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনিই ছয় দিনে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন, যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু ভূমি থেকে নির্গত হয় আর আকাশ থেকে যা কিছু বর্ষিত হয় এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন, তোমরা যা-ই কিছু কর না কেন আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করছেন। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল বিষয়ের মীমাংসা তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তিত। তিনিই রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে, তিনি অন্তর্যামী। আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার। (সুরা হাদীদ, আয়াত-১-৭)

এপর্যন্ত পড়তেই আমি ঘোষণা করলামঃ "আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্"। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।" পর্দার আড়ালে আত্মগোপনকারীগণ এতক্ষণে সবাই উল্লসিত হয়ে বজ্রকণ্ঠে 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি দিতে দিতে অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বললেনঃ হে ইবনে খাত্তাব! সুসংবাদ গ্রহণ কর, নবী করীম (সাঃ) গত সোমবার দোয়া করেছেন এই বলেঃ

"হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব ও আবু জাহল ইবনে হিশামের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ তার দ্বারা তুমি দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি কর।" আমাদের বিশ্বাস, তুমিই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দোয়ার সুফল। আমি বললামঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় আছেন, আমাকে বলে দাও। আমার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর তাঁরা তাঁর ঠিকানা নির্দেশ করল। অতঃপর যথাস্থানে পৌছে আমি দরজার কড়া নাড়লাম। জিজ্ঞেস করল কে? উত্তর দিলাম-ওমর। তাঁর সম্পর্কে আমার কঠোরতা তাদের জানা ছিল, কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তখনো তারা পায়নি। তাই কেউ দরজা খোলার সাহস পাচ্ছে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ খুলে দাও, আল্লাহ ভাল চান তো তাকে হেদায়েত দান করবেন। সুতরাং দরজা খুলে দেয়া হল। আর দু ব্যক্তি আমার বাহু ধরে রাখল, এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট পৌছে গেলাম। তাদেরকে তিনি আমাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁর সামনে আমি বসে পড়লে-আমার জামার সম্মুখ চেপে ধরে বললেনঃ হে ইবনে খাত্তাব! ইসলাম গ্রহণ কর, হে আল্লাহ্ তাকে হেদায়েত দান কর।

www.pathagar.com

আমি উচ্চারণ করলামঃ "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্নাকা রসূলাল্লাহ।" "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।" শুনা মাত্র মুসলমানগণ বজ্রনিনাদে আওয়াজ তুললেন, আল্লাহু আকবার। এ আওয়াজে মক্কার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে, এমন কি মক্কার পথে-ঘাটে পর্যন্ত ধ্বনিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তখন সত্তর জন। তখনকার অবস্থা ছিল এই- কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে লোকেরা জানতে পারলে সবই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, সেও তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। অতঃপর একজনের বাড়ি এসে আমি দরজায় আওয়াজ দিতেই সে বেরিয়ে আসল। আমি বললাম তুমি জান কি, আমি যে ধর্মত্যাগী হয়েছি? "এমনটি করবে না" বলেই দরজা বন্ধ করে সে ভিতরে চলে গেল। এরপর অন্য এক জনের কাছে যেয়ে একই কথা বললাম। সেও প্রথম জনের ন্যায় মন্তব্য করে দরজা আটকিয়ে দিল। আমি বললাম-না এতে তো কিছুই হল না। তখন জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল-তুমি কি চাও যে, তোমার মুসলমান হওয়ার কথা প্রচার হোক? বললামঃ হাঁ। সে বললঃ তাহলে মানুষ যখন জমায়েত হয়, তখন অমুকের নিকট যেয়ে বল যে, "তুমি কি জান আমি যে বিধর্মী হয়ে গেছি? কেননা তার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না। আমি তাই করলাম। আর কি, শুনা মাত্র সে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলঃ হে লোক সকল! সাবধান! ওমর ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। আর যায় কোথায়! অমনি আমার উপর মানুষ ছুটে পড়ল, শুরু হয়ে গেল আমার সাথে সংঘর্ষ। তারাও মারে আমিও পিটাই। মারা মারির এক পর্যায়ে আমার মামা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাকে বলা হল যে, ওমর ধর্মত্যাগ করেছে। সাথে সাথে শিলাখন্ডের উপর দাড়িঁয়ে তিনি জোর গলায় আওয়াজ দিলেনঃ সাবধান! আমার ভাগিনাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। জনতা সরে গেল। বস্তুতঃ আমি চাইতাম, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মার খাওয়া ব্যক্তিটা আমিই যেন হই। তাই বললাম, এতে তো কিছুই হল না, অন্যেরা মার খাবে আর আমি নিরাপদে থাকবো? এটা হতে পারে না; সুতরাং জনতা স্বস্থানে ফিরে গেলে মামার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললামঃ আপনার দেয়া নিরাপত্তা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। তিনি বললেনঃ না এরূপ করো না। কিন্তু তার কথা আমি অস্বীকার করি। অতঃপর এমনিতর মারামারি আর সংঘর্ষ একাধারে চলতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহ্‌ ইসলামের বিজয় দান করেন।

হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ, তাঁর আকস্মিক পরিবর্তন এবং পরবর্তীকালে তাঁর বিপ্লবাত্মক জীবন ধারার প্রতি তাকিয়ে এটাকে স্থায়ী মু'জিযা মনে করা অতিশয়োক্তি হবার কথা নয়। এটি এমনি এক অলৌকিক বিষয় যে, মানুষের পক্ষে যার তুলনা পেশ করা অসম্ভব। উপরন্তু এটাকে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার নিদর্শন, মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালত ও খতমে নবুওতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বিবেক বুদ্ধি একথা স্বীকার করতে বাধ্য। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালত ও নবুওত যেমন আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ, তদ্রুপ হযরত ওমর (রাঃ) কেও তিনি ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। কেননা, কোরআনে কতিপয় আয়াতের প্রারম্ভিক দর্শনেই তাঁর হেদায়েতের পথ খুলে যায়, অথচ ঘর থেকে তিনি বের হয়ে এসে ছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পূর্ণ মন নিয়ে। মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব এ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ওমরের ন্যায়

www.pathagar.com

জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, কঠোর প্রাণের এক ব্যক্তি যিনি কোন শক্তির নিকট মাথা নত করতে নারাজ, মুহূর্তের ব্যবধান কোরআনের একটি মাত্র দর্শনে তাঁকে ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ ওমরে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। খোদার রাহে ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে এবং ধৈর্যের উপমা স্থাপনে যারা নিবেদিত-অন্তর তাদের বেলায় পার্থিব লাভ ক্ষতির প্রশ্নই অবান্তর।

যুগ যুগ ধরে লক্ষ কোটি টাকা, অঢেল সম্পদ ব্যয় করে খৃষ্টান মিশনারীগুলো যেখানে মানুষকে খৃষ্টাব্দ তথা ত্রিত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ, সে ক্ষেত্রে কোরআনিক আয়াত পানে হযরত ওমরের একটি মাত্র পলকে তাঁকে পূর্ব পুরুষের ধর্ম, আকিদা, বিশ্বাস ও মূর্তি পূজা থেকে বৈরী করে সমাজ স্বজনের বিপক্ষে রণক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দেয়, সে কোন অদৃশ্য শক্তি ছিল যা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে স্বেচ্ছায় নিজেকে মহানবীর (সঃ) একান্ত বাধ্যগত বানিয়ে দেয় এবং প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে নবীর দুশমনের বিরুদ্ধে সীসা গড়া প্রাচীরবৎ দাঁড় করিয়ে দেয়?

অন্য কথায় বলা যায়, একমাত্র কোরআনের ঐশী প্রভাব এবং রব্বানী শক্তির বিপ্লবী আকর্ষণই তাঁকে জাহেলিয়াতের অন্ধ মরু থেকে ছিনিয়ে এনে সভ্যতা ও মানবতার শৈল চূড়ায় দাঁড় করায়। ফলে তিনি আজ বিশ্ব মানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা, শিষ্টতা ও ন্যায় ইনসাফের চিরন্তন উপমা, মুমিনদের ধর্ম-কর্ম সমাজ নীতিতে খলীফাতুর রসূল (সাঃ) অন্যতম দিশারী তথা আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত।

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে মহানবী (সঃ) এর মুনাজাত কবুল করেছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন-বীরত্ব, সাহসিকতা ও ত্যাগের মহিমার এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাই লক্ষ্য করা যায় স্বীয় মাতুল প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করতঃ ইসলামের বিজয় সূচিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বীনের জন্যে সংগ্রামের পথকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মন্তব্য হল, "ওমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল দ্বীনের বিজয়, তাঁর হিজরত ছিল সাহায্য আর তাঁর খিলাফত ছিল রহমত স্বরূপ। ওমরের ইসলাম গ্রহণের শুভলগ্ন থেকেই আমরা শক্তিশালী ও বলীয়ান হতে থাকি।" হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত হামযা (রাঃ) এই দুই বীরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামী জামায়াতের কেবল হিম্মত ও শক্তি বৃদ্ধিই করেনি নওমুসলিমের উপর নির্যাতন বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলন গোপনীয়তার আচ্ছাদন ছিন্ন করে প্রকাশ্য বিপ্লবাত্মক রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

হযরত হামযার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণও কম বিস্ময়কর নহে। ঘটনা এরকমঃ একদিন সাফা পর্বতের পাশে আবু জাহল রসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাত পায়। ঐ সময় সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে ও তাঁকে গালি দেয়। সে তাঁকে অত্যন্ত অপ্রীতিকর কথা বলে। ইসলামের বিরুদ্ধে কটূক্তি এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রতি শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে কোন একটি কথাও বললেন না। আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের এক দাসী নিজের ঘরে বসে এসব কটূক্তি শুনতে পায়। অতঃপর আবু জাহল সে স্থান ত্যাগ করে কা'বার পাশে কোরাইশদের এক দরবারে গিয়ে বসে।

www.pathagar.com

এর অল্পক্ষণ পরেই আবদুল মোত্তালিবের পুত্র হামযা তীর ধনুক সজ্জিত অবস্থায় শিকার থেকে ফিরছিলেন। তিনি একজন ভাল শিকারী ছিলেন। শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপে ও শিকারের সন্ধান করায় তিনি বেশ পটু ছিলেন। এ রকম শিকার করে যখনই তিনি ফিরতেন তখন পথে কোরাইশদের কোন দরবার বা জটলা দেখলে সেখানে যেতেন, সালাম দিতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি ছিলেন কোরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও তাগড়া জোয়ান। তিনি যখন আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়ী ফিরে গিয়েছেন। দাসী হামযাকে দেখেই বললো, "একটু আগে হিশামের পুত্র আবুল হাকাম তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদের সাথে কি আচরণ করেছে তা যদি দেখতে! এখানে মুহাম্মাদ বসা ছিল। তাকে দেখেই সে তার সাথে দুর্ব্যবহার ও গালা গালি করেছে। তাঁর সাথে অত্যন্ত আপত্তিকর আচরণ করেছে। মুহাম্মাদ (সঃ) একটা কথাও না বলে চলে গেছে।"

হামযা এ কথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়লেন। কেননা আল্লাহ তাঁকে ইসলামের গৌরব মুকুট পরাতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি আবু জাহলের সন্ধানে দ্রুত ছুটে গেলেন। পথে কারো কাছে দাঁড়ালেন না। তাঁর ইচ্ছা আবু জাহলকে পেলেই তাকে শিক্ষা দেবেন। মসজিদে হারামে ঢুকেই দেখলেন, সে দরবার জমিয়ে বসে আছে। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়েই ধনুক দিয়ে তাকে প্রচন্ড আঘাত করে গুরুতরভাবে জখম করে দিলেন। অতঃপর বললেন, "তুই মুহাম্মদকে গালা গালি করিস? অথচ আমি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছি। সে যা কিছুই বলে আমি তা সমর্থনকারী। পারিসতো আমাকে পাল্টা আঘাত কর দেখি।"

তৎক্ষণাৎ বনী মাখযুম গোত্রের কিছু লোক ছুটে এল হামযার বিরুদ্ধে আবু জাহলকে সাহায্য করতে। কিন্তু আবু জাহল বললো, "তোমরা হামযাকে কিছু বলোনা। কেননা আমি সত্যিই তার ভাতিজাকে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছি।"
হামযা (রাঃ) ইসলামের উপর দৃঢ় ও অবিচল রইলেন এবং রসূলুল্লাহর কার্যক্রমের সাহায্য ও সহায়তা অব্যাহত রাখলেন। হামযার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশরা উপলব্ধি করলো যে, রসূলুল্লাহকে (সাঃ) এখন আর নিপীড়ন ও হেয় করা সহজ হবে না। কিছু করতে গেলেই হামযা এসে রুখে দাঁড়াবে। তাই আপাততঃ তারা উৎপীড়নের মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিল।

ছাফা-মারওয়ার উপরোক্ত গৌরবজ্বল অতীতকে স্মরণে রেখে আমরা সায়ী করতে থাকলাম। সাফা-মারওয়া, মারওয়া-সাফা এবং সর্ব শেষে মারওয়াতে সমাপ্তি।
প্রতিবার সায়ীর ক্ষেত্রে পড়ার জন্যে আলাদা আলাদা দোয়া থাকলেও (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তা মুখস্ত না থাকার কারণে দরূদ (বিশেষ করে আত্তাহিয়্যাতুর পরের দরূদ) হামদ্, জেকের এবং নিম্মোক্ত দোয়া পড়েছিঃ "সোবহানাল্লাহি আলহামদু লিল্লাহি অ-লাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম"।
অবশেষে ছাফার পাদদেশে দু'রাকাত নফল পড়ে আল্লাহ্পাকের দরবারে নিজের সকল দীনতা তুলে ধরে ক্ষমার নিবেদন করেছি। আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী ও মুসলিম উম্মার কল্যাণ ও তরক্কীর জন্যে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেছি।

www.pathagar.com

ওমরার কাজ শেষ

এভাবে সায়ীর কাজ যখন আমরা সমাপ্ত করি তখন রাত ১১-৪৫ টা। ইতিমধ্যে আমরা মাগরিব ও এশা মসজিদে হারামেই পড়ে নিয়েছি। কাজেই এখন আমাদের মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করে হালাল হয়ে খাবার কাজই বাকী।

এ উদ্দেশ্যে আমরা মিসফালায় গিয়ে একটি সেলুনের দোকানে বসে পড়লাম। আমরা দোকানে প্রবেশ করার পর পরই শ্যামসুন্দর দোকান বন্ধ করে দিল। জিজ্ঞেস করলে বলা হল যে, রাত ১২-০০ টার পর দোকান খোলা রাখা নিষিদ্ধ এবং এখানে এ ধরনের আইন কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়। নইলে জরিমানা, দোকান সীল করা, জেল ইত্যাদি শাস্তি অবধারিত।

যাই হোক, আমরা মাথা মুন্ডন এবং চুল ছোট করার কাজ সেরে নিলাম। আমি মাথা মুন্ডন করলাম, শহীদুল্যা সাহেব এবং তার ছেলে জিল্লুর রহমান চুল ছোট করে নিলেন। এরপর আমরা স্থানীয় এক হোটেলে (বাঙ্গালী পরিচালিত) কিছু সাধারণ খাবার খেয়ে নিলাম। উল্লেখযোগ্য যে, মিসফালায় প্রায় হোটেল ও দোকানপাঠ বাঙ্গালী পরিচালিত। বেশীর ভাগ চট্টগ্রামের অধিবাসী। কিছু পাকিস্তানী ও ইন্ডিয়ানও রয়েছে। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট আবাসিক হোটেলে পৌঁছি রাত প্রায় দেড়টায়। গোছল ইত্যাদি সেরে আমরা রাত প্রায় ১-৪৫ টায় ঘুমের জন্যে বিছানায় যাই।

ঘড়ির অ্যালার্ম দেয়া ছিল। রাত ৩-৩০ টায় ঘুম থেকে নিবৃত্ত হই। টয়লেট, অজু ইত্যাদি সেরে আমরা পবিত্র মসজিদে হারামে উপস্থিত হই। এখানে কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ার পর ফজরের নামাজ পড়ার জন্যে প্রস্তুতি নেই। স্থানীয় সময় রাত ৪-৫২ টার সময় আযান হচ্ছিল। অন্যান্য নামাজের আযানের সময় ছিল নিম্নরূপঃ

জোহরঃ বেলা ১২-১৩ মিনিট, আছরঃ বিকেল ৩-৩৮ মিনিট, মাগরিবঃ সন্ধ্যা ৬-১৭ মিনিট, এশাঃ রাত ৭-৪৭ মিনিট।

ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়ার পর আমরা জামায়াতে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার জন্যে দুঃখ ও লজ্জাজনক যে, প্রথম রাকাতে ইমাম সাহেব একটি তকবীর বলার সাথে সাথে আমি এবং কিছু মুসল্লি রুকুতে চলে যাই। অথচ এ তকবীরটি ছিল সিজদার। পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, ইমাম সাহেব আস্‌সিজদা সূরা তেলাওয়াত করছিলেন যাতে রয়েছে একটি সিজদা। মূসা সাহেবের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি জানালেন যে, ইমাম সাহেব প্রায়শই হজ্বের মওসুম বাদে ফজরে এ সূরাটি তেলাওয়াত করে থাকেন। আরবী এবং কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আমার মধ্যে কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহপাকের নিকট বার বার মাফ চেয়ে নিলাম।

ফজরের নামাজ শেষে বাসায় ফিরার সময় আমরা পথে কিছু নাশতা করে নিলাম। পরে বাসায় কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মক্কার পবিত্র স্থানে জিয়ারত

সকাল ৮-৩০ টায় পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রফেসর মূসা সাহেব একটি ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। মক্কার কিছু পবিত্র ও উল্লেখযোগ্য স্থান জিয়ারতই ছিল উদ্দেশ্য। মুসা সাহেব মিসফালার লোহার ব্রিজের দিকে আমাদের ট্যাক্সির পাশে অপেক্ষা করতে বলে সকালের নাস্তার জন্যে খাবার আনতে পার্শ্ববর্তী রেস্তোঁরায় ছুটে গেলেন।

www.pathagar.com

ড্রাইভারের নাম আব্দুল কাদের জিলানী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী জানে। জিজ্ঞেস করলাম তার বাড়ী ইরাকে কিনা। সে বলল, না, সে একজন সৌদী। চেহারায় গড়ন সৌদীর মতই কিন্তু নামটি সৌদী নয় বলেই আমাদের মনে খটকা লেগেছিল। বড়ই মিশুক, ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে বেশ ভাব করে নিয়েছে। জিল্লুর রহমান ক্যামেরাটি সাথে নিয়েছিল। গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ব্রিজটি এবং অনতি দূরের তূর্কী সালতানাতের পূরাকীর্তি সামনে রেখে আমরা কয়েকটি স্ন্যাপ নিলাম। ড্রাইভার এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করল, যদিও কোন স্ন্যাপই কাজে লাগেনি। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

মূসা সাহেব ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে নাস্তার জন্যে রুটি ও গোস্ত নিয়ে এলেন। সড়ক দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চলল। লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভারের সাথে মূসা সাহেবের বেশ ভাব, দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমরা ভেবেছিলাম, গাড়ীটি মূসা সাহেবের নিজেরই।

আমরা মীনা, মুজদালিফা, জাবালে নূর, জাবালে সাওর এবং জাবালে রহমতের উল্লেখযোগ্য দিক এবং আল্লাহপাকের নিদর্শন সমূহ দর্শন করলাম। মসজিদে নামেরা, জাবালে রহমত, জাবালে সাওর এবং জাবালে নূরের ছবিও নিলাম।

মসজিদে নামেরায়

মসজিদে নামেরাটি আরাফাতের একপাশে অবস্থিত। হজ্বের দিনে মসজিদে এবং তার আশে পাশে হাজীগণ ওকুফ করেন। এই সে মসজিদ যেখান থেকে প্রতি বছর হজ্বের খোতবা দেয়া হয় যা আমরা রেডিও-টিভিতে বাংলাদেশের ঘরে বসেও দেখতে / শুনতে পাই। বর্তমানে সৌদি বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি এ খোতবা দিয়ে থাকেন। এ মসজিদে হজ্বের দিনে হজ্বের খোতবার পর জোহর ও আছর পরপর একত্রে জামায়াতে পড়া হয়ে থাকে।

মসজিদের আশে পাশে বর্তমানে অসংখ্য নিম গাছ। হজ্বের দিনে মসজিদে জায়গার সংকুলান হয় না। এ সময় আশে পাশে নিমগাছের ছায়াকে কেন্দ্র করে হাজীগণ দাঁড়িয়ে নামেরা মসজিদের জামায়াতে শরীক হতে চেষ্টা করেন।

শুধু মসজিদের আশেপাশে নহে। দেখলাম মীনা, মুজদালিফা, আরাফাতের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নিম গাছ। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা যায় যে, নিম গাছ ধূ-ধূ মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকাকে সবুজে সবুজে একাকার করে দিয়েছে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সারিবদ্ধভাবে এ নিম গাছ লাগান হয়েছে। গাছগুলো ৫/৭ বছরের বলে মনে হয়েছে। হাজীগনের ওকুফের সুবিধার্থে এ সুন্দর আয়োজন। আরাফাতে এ সব গাছের নীচেই হজ্বের দিন তাঁবু স্থাপন করে অথবা চাদর টাঙিয়ে ওকুফের ব্যবস্থা করা হয। মরুভূমির আবহাওয়া সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যে নিম গাছের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ওকুফের সময়ে বর্তমানে অসহ্য গরম মালুম হয় না।

উক্ত নিমগাছ মক্কার অন্যান্য জায়গায়ও পরিলক্ষিত হয়েছে। শোনা যায় যে, বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরামর্শেই নাকি সৌদি আরব / আরাফাতে নিমগাছের চাষ শুরু হয়েছে। দেশের আবহাওয়ার উষ্ণতা কমানোর জন্যে

www.pathagar.com

এ গাছ যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। প্রতিটি গাছে পানি ছিটানো নিশ্চিত করার জন্যে গাছের গোড়ায় পানির ট্যাপ রয়েছে।

জাবালে রহমতে

আমরা নামেরা মসজিদ দেখে জাবালে রহমতে এলাম। এখানে কোন এক জায়গায় বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়ার (আঃ) দুনিয়ার জীবনে প্রথমে সাক্ষাৎ হয়। ঘটনাটি আল্লাহপাকের অসীম কুদরতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পৃথিবীর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করে বাবা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) কে আল্লাহ পাক প্রথমে জান্নাতে রাখলেন এবং একটি বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাঁদের দুজনকে পৃথিবীর দুজায়গায় নামিয়ে দিলেন। একজনকে শ্রীলঙ্কায় এবং অন্যজনকে জেদ্দায়।

উক্ত জাবালে রহমতের কোন এক স্থানে দাঁড়িয়ে নবীপাক (সঃ) বিদায় হজ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ পেশ করেন। এই ভাষণ মানব ইতিহাসে একটি মেগনাকাটা। কেয়ামত পর্যন্ত আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

আরাফাতের ময়দান

ঐতিহাসিক জাবালে রহমতের পাদদেশে পা রাখার সাথে সাথে মনে পড়ে গেল নবীপাকের (সঃ) সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণ। প্রায় সোয়ালক্ষ সাহাবীকে সামনে রেখে নবী পাক (সঃ) আরাফাতের এখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেনঃ

"হে জনমন্ডলী! আমার কথা শোন। সম্ভবতঃ এরপর তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাত নাও হতে পারে।"

www.pathagar.com

হে লোক সকল! তোমাদের পরস্পরের জান-মাল পরস্পরের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত এই মাস এই দিনের ন্যায় হারাম (পবিত্র) সাব্যস্ত করা হল। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পালনকর্তা রবের সাথে মিলিত হবে, তিনি তোমাদের আমল ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া হল। তোমাদের কারো কাছে গচ্ছিত আমানত মজুদ থাকলে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে। আজ থেকে যাবতীয় সুদ নিষিদ্ধ করা হল, কিন্তু তোমরা কেবল নিজ নিজ মূলধন ফেরত পাবে, এতে অন্যায়-অবিচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবে না। তোমরা নিজেরাও যুলুম করবে না, আর মাযলুমও হবে না। সুদের নাম গন্ধ না থাকাটাই আল্লাহর ফয়সালা। আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের সমস্ত সুদ রহিত ঘোষণা করা হল। জাহেলী যুগের সকল প্রকার সুদের দাবী রদ করা হলো। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম সেই দাবী মওকুফ করা হলো-যা রাবী'আ বিন আল-হারেস বিন আবদুল মোত্তালিবকে বনী লাইস গোত্রে অবস্থান কালে বনু হুযাইল গোত্রীয়রা হত্যা করেছিল। এটাই জাহেলী যুগের রক্তপাতের সূচনা করে।

হে জন মন্ডলী! তোমাদের এ-দেশে ইবাদত-আনুগত্য পাবে বলে শয়তান চিরদিনের জন্যে নিরাশ হয়ে গেছে; অবশ্য এ অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র তার আনুগত্য করা হবে। তোমাদের তুচ্ছ কাজেই সে সন্তুষ্ট। তাই দ্বীনের কাজে তার থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে।

হে লোক সকল! মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী। এ দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। আর আল্লাহর হারামকে তারা হালাল, আল্লাহর হালালকে তারা হারাম সাব্যস্ত করে। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকেই সময় তার আপন গতিতে গতিশীল। আল্লাহ্‌র ফয়সালা মুতাবেক মাসের সংখ্যা বারটি, তম্মধ্যে চারটি হারাম মাস, ক্রমাগত তিনটি। আর চতুর্থটি হলো - জুমাদা ও শা'বানের মধ্যবর্তী রজব মাস।

অতএব হে শ্রোতামন্ডলী! স্ত্রীর উপর তোমাদের হক রয়েছে, স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। তাদের প্রতি তোমাদের হক হল– তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে শোয়াবেনা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত অশ্লীল কাজে আদৌ লিপ্ত হবে না। কিন্তু যদি তারা তাতে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে শয্যায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখতে এবং প্রহার করতে আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দান করেছেন। অবশ্য মুখমন্ডলে প্রহার করা যাবে না। অতঃপর যদি তারা সংশোধন হয় ও এ থেকে বিরত থাকে, তবে ন্যায়সংগত ভাবে তারা খোর-পোষ লাভ করবে। উপরন্তু নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার বজায় রাখবে। আল্লাহর নামে তাদেরকে তোমরা পত্নীত্বে বরণ করেছ, আল্লাহর বিধান মতেই তাদের গুপ্তাংগ তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

কাজেই হে মানুষ! আমার কথা তোমরা বুঝতে চেষ্টা কর। অবশ্যই আমি (আল্লাহর বাণী) যথাযথ পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি-যা আঁকড়ে ধরে থাকা পর্যন্ত কিছুতেই তোমরা গোমরাহ হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাত।

হে জনমন্ডলী ! তোমরা উপদেশ শ্রবণ কর এবং অনুধাবনের চেষ্টা কর। স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। মালিকের

www.pathagar.com

সম্মতি ছাড়া এক মুসলমানের কোন কিছু অপর মুসলমানের জন্য হালাল নয়। কাজেই নিজে নিজের উপর তোমরা যুলুম করবে না। হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?

মহানবী (সঃ) এক একটি করে আলোচ্য বাক্য উচ্চারণ করতেন আর রবিআ বিন উমাইয়া বিন খলফ প্রতিটি বাক্য পূনরাবৃত্তি করতেন মানুষ যেন উত্তমরূপে শুনতে পায়। একের পর এক এভাবে তিনি মহানবীর (সঃ) বাণীসমূহ শুনিয়ে যাচ্ছিলেন।

মহানবী (সঃ) যখন তাঁর শেষ বাণীটি উচ্চারণ করলেনঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়েছি? তখন চতুর্দিক থেকে সমবেত জন-মন্ডলী জবাব দিয়ে উঠে ঃ "জী হ্যাঁ।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

কোন কোন বর্ণনাকারী আলোচ্য ভাষণে অতিরিক্ত কিছু কথা যুক্ত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ হে লোক সকল! আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দিয়েছেন। ওয়ারিসের জন্যে ওসীয়ত জায়েয নহে। সন্তান স্বামীর স্বত্বাভুক্ত, ব্যাভিচারীর জন্যে শিলাখন্ড। যে ব্যক্তি পিতা ছাড়া নিজের বংশধারা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে অথবা মাওলা ব্যতিত অপরকে ওলী নিযুক্ত করে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, আল্লাহ তার দান-খয়রাত কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।

এখানে অবস্থান কালে তাঁর উপর নাযিল হল ঃ "আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়ারাদিতু লাকুম ইসলামা দ্বীনা" – আয়াতটি।

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সুরা মায়েদা, ৪ আয়াত)

এখান থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) মুজদালিফা পৌঁছে মাগরিব-এশা একই সাথে দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এবং এখানেই রাত্রি যাপন করেন। মুজদালিফাস্থ 'কুযাহ' পাহাড়ের সন্নিকটে ফজরের নামায আদায় করতঃ ইরশাদ ফরমানঃ এ স্থান এবং সম্পূর্ণ মুজদালিফাই অবস্থান স্থল। অতঃপর মীনা পৌঁছে ৬৩টি উট কোরবানী করতঃ ইরশাদ করেনঃ এ স্থানসহ সম্পূর্ণ মীনা কোরবান গাহ্। অতঃপর মাথা মুড়ে মুমিনদের হজ্বের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। একইভাবে রমী জিমার (কাঁকর নিক্ষেপ, কাবা ঘরের তওয়াফ) ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দান করেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মাসের সংখ্যা আশহুরে হুরুম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) এবং হজ্বের অন্যান্য নিয়মনীতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুশরিকদের মাস পিছিয়ে দেয়ার ভ্রান্ত নীতি থেকে বাঁচার জন্যে লোকদের একত্রিত করে ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ কর্তৃক আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই সময় তার আপন গতিতে চলছে। বছর বার মাসে পূর্ণ হবে। এর মধ্যে চার মাস নিষিদ্ধ, যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ক্রমধারায় এ তিন মাস এবং রজব।

সমবেত জনমন্ডলীকে সম্বোধন করে তিনি প্রশ্ন রাখেন এটা কোন মাস? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জানেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। সাহাবীগণ ভাবলেন- সম্ভবতঃ কোন নতুন নামে একে অবহিত করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-এটা যিলহজ্জ মাস নয় কি? তাঁরা

www.pathagar.com

বললেন-জী-হ্যাঁ। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ এটা কোন শহর? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জানেন। তিনি চুপ রইলেন, সাহাবীগণ মনে করলেন-সম্ভবতঃ ভিন্ন নামে একে অভিহিত করা হবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ এটা কি মক্কা শহর নয়? তাঁরা বললেনঃ জী হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ আজ কোন দিন? তাঁরা উত্তর দিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ রইলেন। সাহাবীগণ মনে করলেন-বোধহয় এর কোন নতুন নামকরণ করা হবে। তিনি বললেন-এটা নহরের দিন নয় কি? তাঁরা বললেন- জী হ্যাঁ।

অতঃপর মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল (বর্ণনাকারী অতিরিক্ত সংযোজন করে বলেন-আমার মনে হয় রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন) এবং তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের উপর আজকের এই দিন, এই নগরী, এই মাসের ন্যায় হারাম হল। অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে আর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আমার পর তোমরা না গোমরাহীতে লিপ্ত হবে, না একে অপরের শিরোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হবে। স্মরণ রাখবে, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দেবে। সম্ভবতঃ পরবর্তী সংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক বিচক্ষণ প্রমাণিত হবে। অতঃপর দুইবার উচ্চারণ করলেন-আমি পৌঁছে দিয়েছি কি?

এটাই নবী জীবনের সর্বশেষ কা'বা জিয়ারত। এ হজ্বেই আল্লাহ মানুষের জন্যে দ্বীনের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এ হজ্বকে হজ্জুল বালাগ নামেও অভিহিত করা হয়। এতে তিনি মানুষকে সাক্ষী রেখেছেন যে, রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ

জাবালে রহমতের চূড়া থেকে তোলা মুজদালিফা পিলারের ছবি

www.pathagar.com

পালন করেছেন। অতঃপর মহানবী (সঃ) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

জাবালে রহমতের চূড়ায়

১৪০০ বছর পূর্বের সেই বর্ণাঢ্য অতীতকে স্মরণ করতে করতে আমরা জাবালে রহমতের চূড়ায় উঠে গেলাম। এখানে বিরাট বিরাট কিছু পাথর খন্ড এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি পাথর পাশাপাশি দেখে আমরা তাতে উঠে বসলাম সাথে আনা নাস্তা পানি খাবার জন্যে। যথারীতি নাস্তা গ্রহণ করে এখান থেকে আশে পাশের কয়েকটা ছবি নিয়ে আমরা নেমে পড়লাম অন্যান্য পবিত্র স্থানের উদ্দেশ্যে।

মীনা-মুজদালিফায়

আমরা মীনায়-মুজদালিফায় গেলাম। মুজদালিফায় অবস্থিত মসজিদের এবং পাশের কিছু নিমগাছের ছবি নিলাম। মূসা সাহেব শহিদুল্যা সাহেবকে হজ্বের সময় আরাফায়, মীনায়, মুজদালিফায় কি কি কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন, যা পরবর্তীতে তাঁর হজ্বের সফরের জন্যে জরুরী। এ সময়ে লক্ষ্য করলাম যে, মীনার অধিকাংশ জুড়ে অগ্নি নিরোধক হাজার হাজার স্থায়ী তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে, যা (তাবু) হজ্ব মওসুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। কাজেই মীনায় হাজীদের এখন বিন্দুমাত্র কষ্টের কারণ নেই।

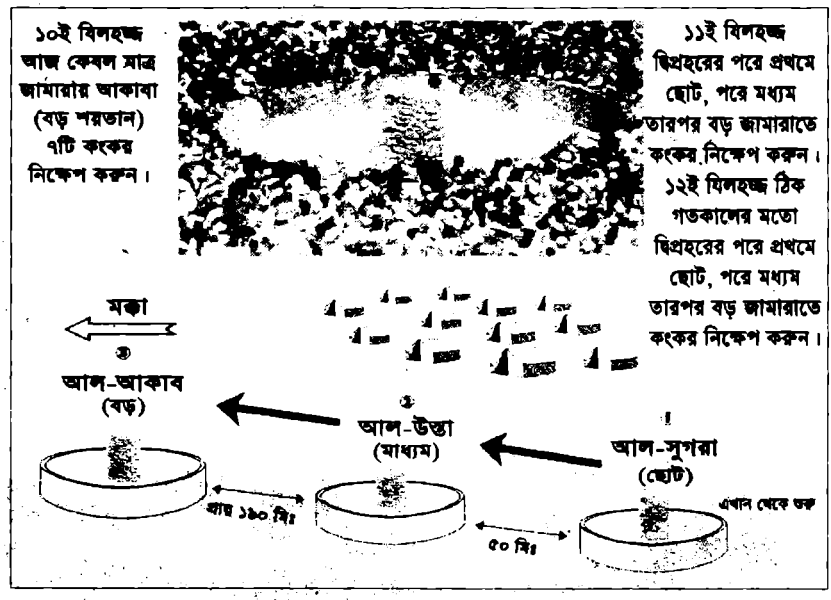

জামারাতের অবস্থান

এখানে মীনায় কোন এক স্থানেই ইব্রাহীম (আঃ) প্রভুর উদ্দেশ্যে মানব ইতিহাসের নজীর বিহীন কোরবানীর নজরানা পেশ করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্রকে সেই উপত্যকা প্রান্তরে ছেড়ে আসার পর তাকে অযত্নে ফেলে রাখেননি। বরঞ্চ

www.pathagar.com

মাঝে মধ্যে খবরাখবর নেয়ার জন্যে আসতেন এবং কিছুদিন স্ত্রীপুত্রের কাছে অবস্থানও করতেন। তিনি স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে এ স্থানে ছেড়ে যাওয়ার সময় দোয়া করেছিলেন "-হে আমার রব। এ শহরকে তুমি নিরাপদ করে দাও।"

ঠিক দোয়া অনুযায়ী এ জনবিরল স্থানটি এখন বস্তিতে পরিণত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইতিমধ্যে জুরহুমীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারও অবশ্যই করে থাকবেন। তারপর সে ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবীয় ইতিহাসে বিরল। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বার্ধক্যের সন্তান, প্রথম ও একমাত্র পুত্রকে নবযৌবন কালে খোদার ইংগিতে কুরবানী করার জন্যে তৈরী হলেন। তখন হযরত ইসমাইলের (আঃ) বয়স বারো-তেরো বছরের বেশী ছিলনা।

কুরআনে এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- তারপর যখন ছেলেটি তাঁর সাথে দৌড়ে চলাফেরার বয়সে পৌঁছলো তখন একদিন ইবরাহীম বললো, পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, তোমাকে জবেহ করছি। এখন বল, তুমি কি বলছ? সে বললো, আব্বা! আপনাকে যে আদেশ করা হচ্ছে তা করে ফেলুন! আপনি ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন। অবশেষে তাঁরা উভয়ে যখন খোদার আনুগত্যে মস্তক অবনত করলো এবং ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে উপুড় করে ফেললো এবং আমরা তাঁকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ! আমরা নেককার লোকদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চিত রূপে এ এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমরা একটি বড়ো কুরবানী ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিলাম এবং এ সন্তানকে রক্ষা করলাম। (সাফ্‌ফাত ঃ ১০২-১০৭)

হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) সেই আত্মত্যাগ ও কোরবানীকে আল্লাহ্ পাক এতই পছন্দ করেন যে, মীনায় পশু কোরবানীকে কেয়ামত পর্যন্ত হাজীদের জন্যে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এ মীনাতে হাজীগণকে ১০ই জিলহজ্ব তারিখে পশু কুরবানী দিতে হয়।

জাবালে নূরে

অতঃপর আমরা জাবালে নূরে এলাম, এ পাহাড়ে উঠার ইচ্ছা ছিল। এ জন্যে উপযুক্ত একজোড়া জুতাও মক্কায় নিয়ে গিয়েছিলাম। মূসা সাহেব এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন, এতে কোন ফায়দা নেই। তিনি আরো জানালেন যে, বাঙ্গালী, পাকিস্তানী ও ইন্ডিয়ানরা এ পাহাড়ের মাটি যেন তুলে নিয়ে যাবে। বরকতও ফায়দার আশায় তারা সবাই সাথে করে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। তারা তা নিয়ত করে খাবে বা ব্যবহার করবে। এদের অজ্ঞতায় তিনি বড়ই দুঃখবোধ করলেন। তিনি হাত দিয়ে পাহাড়ে আরোহণকারীদের প্রতি ইশারা করে দেখালেন যে, ওদের অধিকাংশই ঐ তিন দেশের। এ পর্যায়ে মূসা সাহেব জাবালে নূরের পাদদেশে স্থাপিত সাইনবোর্ডের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাতে লিখিত আছেঃ

Brother in Islam: The Prophet Muhammed (PEACE BE UPON HIM) did not permit us to climb on this hill, not to pray there, not to touch its stones and tie knot on its trees and not to take anything from its soil, stones and trees. The good deed is to follow the path of the prophet Muhammed (PEACH BE UPON HIM). So do not oppose that. Allah said "Indeed in the Messenger of Allah you have a good example for him." (Al AHZAB: 21)

www.pathagar.com

কথাটি পাঁচটি ভাষায় লিখিত আছে, অন্য ভাষাগুলো হচ্ছে-ইন্দোনেশীয়, তুর্কী, আরবী এবং উর্দ্দু।

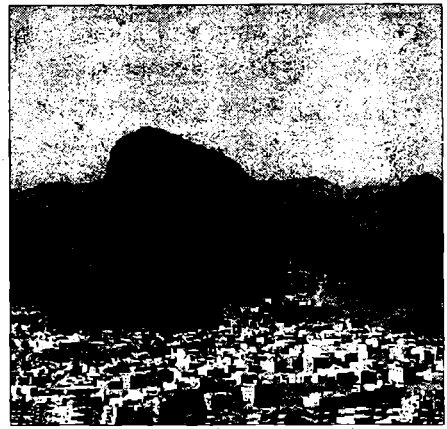

জাবালে নূর

এখানে মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকল ধারাবাহিক ভাবে সাইয়্যেদুল মুরসালিন নবী পাকের (সঃ) ওপর এই জাবালে নূরের অপ্রসস্থ গুহার অভ্যন্তরে ওহী তথা পবিত্র কুরআন নাযিল ও ফেরেশতাকুল শিরমনি জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে নবী হিসেবে আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর মনোনয়নের ঘোষণার পটভূমি। মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনার ঘটনা স্ব স্ব সনদসহ ইমাম যুহরী থেকে, তিনি যুবাইর থেকে এবং তিনি তাঁর খালা হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর অহীর সূচনা হয় সত্য ও সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা এমন হতো যেন তিনি তা প্রকাশ্য দিবালোকে দেখছেন। তারপর তিনি নির্জনতা অবলম্বন করা শুরু করেন এবং গারে হেরায় এবাদত শুরু করেন।

হযরত আয়িশা (রাঃ) নবীর (সঃ) এ কাজকে 'তাহান্নুস' শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেন। ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যায় এবাদত বন্দেগী বলেছেন। এ এক ধরনের এবাদত ছিল যা তিনি করতেন। কারণ তখন পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে এবাদতের কোন পন্থাপদ্ধতি তাঁকে বলে দেয়া হয়নি। তিনি কয়েকদিনের পানাহারের বস্তু বাড়ি থেকে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি হযরত খাদিজার (রাঃ) কাছে আসতেন এবং তিনি তাঁকে আরও কয়েকদিনের আহারের ব্যবস্থা করে দিতেন।

এ সময়ে যেসব কারণে হুযুর আকরাম (সঃ) মক্কার জনবসতি পরিত্যাগ করে পাহাড় কুঞ্জের মধ্যে হেরা গুহায় নির্জনতায় কাটাতেন, তার উপর সূরায়ে 'আলাম নাশরাহ্'-এর নিম্ন আয়াত কিছুটা আলোকপাত করেঃ- "আমরা তোমার উপর থেকে সে ভারি বোঝা নামিয়ে দিলাম যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"

এ আয়াতে "ওয়েজের" শব্দের অর্থ ভারি বোঝা। আপন জাতির অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কর্মকান্ড দেখে দুঃখ, মনোবেদনা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ভারি বোঝা তাঁর সংবেদশীল স্বভাব প্রকৃতিকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। তাঁর সামনে মূর্তিপূজা করা হচ্ছিল, শির্ক, কুফর ও কুসংস্কার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। নৈতিক পংকিলতা এবং নগ্নতা অশ্লীলতায় সমাজ জীবন নিমজ্জিত ছিল। কন্যা সন্তান জীবিত দাফন করা হতো। জুলুম, অনাচার, ব্যাভিচার সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। দূর্বল সবলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। গোত্রগুলো পরস্পর পরস্পরের উপরে হঠাৎ আক্রমণ করে বসতো। কোন কোন সময়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিগ্রহ শত শত বছর ধরে চলতো। কারো জান মাল ইজ্জত আবরু নিরাপদ ছিলনা যদি তার পেছনে কোন শক্তিশালী দল

www.pathagar.com

না থাকতো। এসব অবস্থা দেখে তিনি মর্মপীড়া ভোগ করতেন। কিন্তু এ চরম নৈতিক অধঃপতন থেকে জাতিকে রক্ষা করার কোন পন্থাই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ দুশ্চিন্তাই তাঁর দেহমনকে ভেঙ্গে ফেলছিল। আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করে এ ভারি বোঝা তাঁর উপর থেকে নামিয়ে দেন। নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করেন যে তৌহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাসই সকল জীবন সমস্যার সমাধান করতে পারে, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের পরিপূর্ণ সংস্কার সাধন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালার এ পথ নির্দেশনা নবী মুস্তাফার (সঃ) সকল বোঝা হাল্কা করে দিলেন এবং তিনি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হলেন যে এর মাধ্যমে তিনি শুধু আরব দেশেরই নয়, বরঞ্চ দুনিয়ার অন্যান্য দেশেরও মানব গোষ্ঠী যেসব অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, তাদেরকেও এসব থেকে রক্ষা করা যাবে।

নবী মুস্তাফার (সঃ) বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাস তখন একদিন রমযান মাসে হেরা হুহায় তাঁর উপর অহী নাযিল হয়। ফেরেশ্‌তা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, পড়ুন। বোখারী শরীফের কয়েক স্থানে এ ঘটনা হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যাতে তিনি বলেন, আমি বললাম আমি ত পড়তে জানিনা। তখন ফেরেশতা আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, তা আমার অসহ্য হয়ে পড়লো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমায় বললেন, পড়ুন। বল্লাম আমি ত পড়তে জানিনা। তারপর তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার চেপে ধরলেন এবং আমার তা অসহ্য হয়ে পড়লো। তিনি ছেড়ে দিয়ে আবার বল্লেন, পড়ুন। বললাম, আমি ত পড়তে জানিনা। তিনি তৃতীয়বার আমাকে চেপে ধরলেন এবং আমার তা অসহ্য হয়ে পড়লো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, - ইক্করা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাজি খালাকা।

হেরা গুহা

(পড় তোমার রবের নামে যিনি পয়দা করেছেন) এবং তারপর মা'লাম ইয়া'লাম (যা সে জানতোনা) পর্যন্ত পড়ে শুনালেন।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বললেন, তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ভীত কম্পিত অবস্থায় হযরত খাদিজার (রাঃ) নিকটে এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, আমাকে মুড়িয়ে দাও, আমাকে মুড়িয়ে দাও"। তাঁর ভয় ও শংকার ভাবটা যখন কেটে গেল তখন তিনি বললেন, হে খাদিজা এ আমার কি হলো?

তারপর সব ঘটনা তাঁর কাছে বলার পর তিনি বল্লেন, আমার ত জানের ভয় হচ্ছে। হযরত খাদিজা (রাঃ) বলেন, কখনোই না, আপনি বরঞ্চ খুশী হয়ে যান। খোদার

www.pathagar.com

কসম, আল্লাহ তায়ালা কখনো আপনার মর্যাদাহানি করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন। সত্য কথা বলেন। এক বর্ণনায় আছে, আপনি আমানত আদায় করেন। অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। অক্ষম লোকদের উপার্জন করে দেন। মেহমানদারি করেন, সৎ কাজে সাহায্য করেন। অন্য এক বর্ণনায় একথাও আছে। আপনার চরিত্র অতি মহান। তারপর হযরত খাদিজা (রাঃ) হুযুরকে (সঃ) নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ঈসায়ী হয়েছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অনেক বয়োবৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন।

আবু নাঈমের বর্ণনা মতে হযরত খাদিজা (রাঃ) স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘটনা ওয়ারাকাকে শুনিয়ে দেন। ওয়ারাকা হুযুরকে (সঃ) বলেন, ভাতিজা, তুমি কি দেখেছিলে? রসূলুল্লাহ (সঃ) যা দেখেছিলেন তা বলে দেন। ওয়ারাকা বলেন, এ হচ্ছে সেই নামুস (উর্ধ আকাশ থেকে অহী আনয়নকারী ফেরেশতা) যাকে মূসা (আঃ) এর প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। আহা যদি তোমার নবুয়তের সময় আমি শক্তি সামর্থ রাখতাম। আহা! যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দেবে তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম!

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এসব লোকেরা আমাকে বের কেন দেবে?

ওয়ারাকা বলেন, হায় কখনো এমন হয়নি যে, কোন ব্যক্তি এমন জিনিস নিয়ে এসেছে যা তুমি এনেছ, আর তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি তোমার সে যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম, তাহলে মনে প্রাণে সাহায্য সহযোগিতা করতাম।

কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন।

জাবালে সাওরে

জাবালে সাওরে এলে নবী পাকের (সঃ) হিজরতকালের কিছু খন্ড চিত্র মনের পর্দায় ভেসে উঠে। এ পাহাড়ের একটি গুহাতেই আত্মগোপন করেছিলেন নবী পাক (সঃ) এবং তার হিজরাতের সাথী আবু বকর (রাঃ)।

সাওর পর্বত

রসূলুল্লাহ (সঃ) সাধারণত সকাল বা সন্ধ্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর গৃহে গমন করতেন; কিন্তু যেদিন আল্লাহর তরফ থেকে হিজরতের আদেশ প্রাপ্ত হলেন সেদিন দ্বিপ্রহরে তাঁর গৃহে উপনীত হলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন,

www.pathagar.com

"রসূলুল্লাহ (সঃ) এ অসময়ে আগমনের নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ রয়েছে।" গৃহে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বসে পড়লেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর গৃহে তখন হযরত আয়িশা (রাঃ) ও তাঁর বোন হযরত আসমা (রাঃ) ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "তোমার নিকটে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! এখানে আমার দুই কন্যা ছাড়া আর কেউই নেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্ হিজরতের আদেশ দিয়েছেন।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার সংগ লাভের সৌভাগ্য কি আমার হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ! তুমি আমার সংগী।" তখন হযরত আবু বকরের (রাঃ) নয়ন যুগল হতে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে নিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আরীকতের নিকট গমন করলেন। আব্দুল্লাহ তখন কাফির ছিল বটে; কিন্তু তাঁর অতি বিশ্বস্ত ছিল। তিনি মদীনার বিভিন্ন পথ অবগত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি বিনা দ্বিধায় সম্মত হলেন। ধন্য সেই দুঃসাহসী আব্দুল্লাহ, যিনি সমস্ত কোরাইশের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে সংগোপনে মদীনায় পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দান করলেন।

সমগ্র বিশ্বে বিশ্বাসভাজন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে এত মারাত্মক শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও কোরাইশগণ নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে তাঁর নিকট নিজেদের সম্পদ আমানত রাখত। সেদিনও তাঁর নিকট তাদের অনেক জিনিস আমানত ছিল। তাদের দুরভিসন্ধি রসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ব হতেই অবগত ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে ডেকে বললেন, "আমার প্রতি হিজরতের আদেশ হয়েছে, আমি ইনশাআল্লাহ আজই মদীনায় রওয়ানা দেব, তুমি আমার বিছানার উপর আমার হাযরামী (হাযরামাউত দেশীয়) চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক, তোমার ক্ষতির কোন আশংকা নেই। সকালে আমানতের বস্তুগুলি ফেরত দিও।" হযরত আলী (রাঃ)-ও জানতেন কোরাইশদের দুরভিসন্ধির কথা। তিনি জানতেন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে কাদের তলোওয়ার উদ্যত রয়েছে, কী ভীষণ বিপদ সেখানে প্রতীক্ষা করছে; তথাপি আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পিত সেই নির্ভীক যুবকের নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিত্যক্ত শয্যা নির্ভয় আশ্রয় বলে বোধ হল। তিনি আরও জানতেন আজ রসূলের শয়ন শয্যা তাঁর কতল-গাহ। কিন্তু কে জানত তা খায়বার বিজয়ীর জন্য ফুলশয্যা!

নৈশ নীরবতার মধ্যে মুর্তিমান বিভীষিকার মত কাফিরদল রসূলুল্লাহ (সঃ) এর গৃহ বেষ্টন করে জেগে রইল। তিনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে সূরা ইয়াসীনের "নবম আয়াতের ইউবচেরুন" পড়ার সংগে সংগে আল্লাহতায়ালা তাঁর রসূল হতে তাদের দৃষ্টি হরণ করে নিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মাথায় মাটি ছড়িয়ে দিলেন এবং বেপরোয়াভাবে প্রশান্ত চিত্তে ও ধীর গতিতে বের হয়ে পড়লেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর গৃহত্যাগের পর কে একজন এসে বলল, "তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ?" তারা বলল, "মুহাম্মাদের।" সে বলল, "নিরাশ! নিরাশ!! সে তোমাদের মাথায় মাটি ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে।" তারা সকলে হাত দিয়ে দেখল প্রকৃতই মাথায় মাটি রয়েছে। বাইর থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাদর মুবারকে আচ্ছাদিত আলী (রাঃ) কে শায়িত দেখে তারা মনে করল যে, মুহাম্মদ শায়িতই আছেন। প্রত্যুষে হযরত আলী

www.pathagar.com

(রাঃ) শয্যা ত্যাগ করলে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, "রাত্রের সেই আগন্তুক সত্য কথাই বলেছিল। হযরত আলী (রাঃ) কে তারা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সহচর কোথায়?" তিনি বললেন, "জানি না।" রসূলুল্লাহ (সঃ) গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কোন দিকে যে গিয়েছেন হযরত আলী (রাঃ) সত্যই তা জানতেন না, তিনি বের হয়ে আসামাত্র তারা তাঁকে প্রহার করল এবং কিছুক্ষণ আটক রেখে ছেড়ে দিল।

দারে নোদওয়ার পরামর্শ ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গৃহ ঘেরাও সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, "এবং মুহাম্মদ! স্মরণ কর, যখন কাফিরগণ তোমাকে বন্দী, বধ অথবা নির্বাসিত করবার জন্যে কৌশল উদ্ভাবন করছিল। তারা কৌশল উদ্ভাবন করছিল এবং আল্লাহও কৌশল উদ্ভাবন করছিলেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল উদ্ভাবনকারী।" (সুরা আনফাল ঃ ৩০)

আল্লাহর কুদরত ও মহিমার অন্ত নেই। তিনি স্বীয় হাবিবকে অপূর্ব উপায়ে রক্ষা করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) শত্রুদল পরিবেষ্টিত হয়ে নির্ভীক চিত্তে গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন। যে সকল শত্রু মনে করেছিল যে, রসূলের দেহ ধূলায় ভূলুণ্ঠিত করে আল্লাহ্ ও রসূলকে অপমানিত করবে এবং সত্য ধর্ম ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, তাদেরই মাথায় আল্লাহ্র চির-জিল্লতির খাক রেখে তিনি অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন; যারা মনে করেছিল যে, তিনি তাদের সতর্কদৃষ্টি এড়াতে পারবেন না, তাদেরই দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে তিনি চলে গেলেন অথচ তারা দেখতে পেল না; যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নিজেদের কৌশলের উপর আর কোন কৌশল নেই, আল্লাহ্ অনায়াসে তাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দিলেন। কাফিরদের কৌশল চিরকালই ব্যর্থ হয়ে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর গৃহে উপস্থিত হলেন। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) দুটি উট আট শত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে পূর্ব হতেই বাবুল পাতা খাওয়ায়ে খুব হৃষ্টপুষ্ট করে তুলেছিলেন। এদের একটির নাম কোসওয়া। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটি গ্রহণ করতে বললে তিনি বিনামূল্যে নিতে স্বীকার করলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রাঃ) কে এর মূল্যস্বরূপ চারশত দিরহাম গ্রহণ করতে হল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) দু' তিন দিনের খাদ্য চর্মনির্মিত নাশতাদানীর মধ্যে পুরে দিলেন এবং নিজের কোমরবন্ধ দু ভাগ করে একভাগ দ্বারা নাশতাদানীর মুখ বেঁধে দিলেন। এই মহত্ত্ব প্রদর্শন করে তিনি যে গৌরব লাভ করলেন সেজন্যে ইসলাম জগতে তিনি 'যাতুন্নেতাকাইন' বা দুই কোমরবন্দধারিণী বলে পরিচিতা। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-সহ পশ্চাৎদ্বার দিয়ে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লেন। তাঁরা উট দুইটি আব্দুল্লাহ বিন আরীকতের নিকট পৌছায়ে বললেন, "এ দুটিসহ তৃতীয় রাত্রিতে সাওর পর্বতের গুহায় মিলিত হবে।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মাল দ্বারাই সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হয়েছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিনা মূল্যে উট গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন না। এর একটি নিগুঢ় কারণ রয়েছে। বাহ্যিকভাবে বিনামূল্যে উট গ্রহণের পথে কোন অন্তরায়

www.pathagar.com

ছিল না, কিন্তু তাঁর অস্বীকৃতির ভিতর দিয়ে এটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, এই হিজরত আল্লাহর প্রতি হিজরত-তা ফযিলতে পূর্ণতামন্ডিত করতে হলে জান ও মালের হিজরত হওয়া আবশ্যক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ মাল ব্যয় করেছিলেন।

মক্কা ত্যাগ করবার সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) সতৃষ্ণ নয়নে বারবার খলীলুল্লাহর গৃহ কাবা শরীফের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর বেদনার্ত কণ্ঠ ভেদ করে বিদায় বাণী ফুটে উঠল "কা'বা! আমি তোমা হতে বহিস্কৃত হচ্ছি, আমি নিশ্চিতই জানি যে, আল্লাহর যমিনের মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তুমি আল্লাহর নিকট তাঁর যমিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু তোমার সন্তানেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না। যদি আমার কওম আমাকে বহিস্কৃত না করত তা হলে কখনই আমি বের হতাম না।" তাঁর দৃষ্টি পূনঃ পূনঃ কা'বার দিকে নিবদ্ধ হতে লাগল, গন্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন ঃ "তোমার যে জনপদ তোমাকে বহির্গত করে দিল তা অপেক্ষা বহুশক্তিশালী জনপদ ছিল, যাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি অনন্তর তাদের কোন সাহায্যকারী হয়নি।" (সূরা মুহাম্মদঃ১৩)

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হিজরতের সংবাদ হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁর পরিবারস্থ লোকজন ব্যতীত আর কেউই অবগত ছিল না। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মুখে, একবার পশ্চাতে, একবার দক্ষিণে ও একবার বামে চলতে লাগলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! কোরাইশদের চৌকির কথা স্মরণ হলে অগ্রে পশ্চাদানুসরণের কথা স্মরণ হলে পশ্চাতে, কখনও দক্ষিণে এবং কখনও বামে চলি।"

কোরাইশ সর্দারগণ দেখল যে, শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মরু প্রকৃতির সকল কঠোরতায় গঠিত প্রতিহিংসাপ্রবণ কাফিরদল শ্যেন দৃষ্টিতে তাদের পলাতক শিকার খুঁজতে লাগল। কতিপয় কুরাইশ ও আবু জেহেল হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আবু বকর কোথায়?" তাঁর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) বললেন, "জানি না।" আবু জেহেল ক্রোধে জ্বলে উঠল এবং তার গন্ডদেশে এত জোরে চপেটাঘাত করল যে, তাঁর কানের বালি উড়ে গেল। পদচিহ্ন অনুসন্ধান করে পলাতককে খুঁজে বের করবার জন্যে অভিজ্ঞ লোক দিকে দিকে প্রেরিত হল। সাওর পর্বতের দিকে যে লোকটি গিয়েছিল সে পদচিহ্নের অনুসন্ধান পেয়ে ক্ষিপ্ত কোরাইশদেরকে খবর দিল। তড়িৎ গতিতে প্রত্যেক কবিলা ও বংশের শক্তিশালী যুবকদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিংস্র জন্তুর মত গুহার দিকে ধাবিত হল।

এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সাওর পর্বত গুহার নিকটবর্তী হলেন তখন রাত্রি প্রায় শেষ। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "ঐ পাক জাতের কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি অগ্রে প্রবেশ করবেন না। আমি অগ্রে প্রবেশ করে দেখি, গুহাতে কোন অনিষ্টকারী জীব আছে নাকি!" তিনি গুহাতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তাতে বহু ছিদ্র রয়েছে। তিনি বস্ত্র চিরে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলেন; কিন্তু একটি ছিদ্র বন্ধ করতে বস্ত্রে কুলালো না। তিনি তাতে পা দিয়ে রাখলেন। ঘটনাক্রমে তাতে একটি সর্প ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) গুহায় প্রবেশ করলেন। সিদ্দীকে আকবর দেখলেন যে, নগ্নপদে পথ চলাতে কাঁকর বা প্রস্তরের আঘাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)

www.pathagar.com

এর কদম মুবারক ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। তাতে তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর জানুর উপর মস্তক ন্যস্ত করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ দিকে গর্তস্থিত সর্পটি বের হবার জন্যে বিফল চেষ্টা করে বার বার সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর পায়ে দংশন করতে লাগল। পাছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ঘুম ভেঙ্গে যায় এ ভয়ে তিনি বিন্দুমাত্রও নড়লেন না। নীরবে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলেন। তাঁর দুই গন্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষে ঐ অশ্রু রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চেহারা মুবারকে পতিত হওয়ামাত্র তিনি জাগরিত হলেন এবং সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আমাকে সর্প দংশন করেছে।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "আমাকে কেন জানাও নি?" হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "আপনাকে জাগ্রত করা সমীচীন মনে করিনি।" রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর থুথু মুবারক সেই দংশনের স্থানে লাগিয়ে দিলেন। থুথুর বরকতে দংশন যন্ত্রণা সাথে সাথে নিরাময় হয়ে গেল।

আল্লাহ্‌র আদেশে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানের ব্যতিক্রম কিছুই অসম্ভব নয়। শত্রুগণ গুহার নিকট পৌছাবার পূর্বেই দুটি বন্য কবুতর এসে সেখানে বাসা বাঁধল ও ডিম পাড়ল এবং মাকড়সা জাল বিস্তার করল।

গুহার নিকটবর্তী হয়ে শত্রুগণ বিস্ফোরিত নয়নে গুহার দিকে তাকাতে লাগল এবং কবুতরের বাসা ও মাকড়সার জাল দেখতে পেয়ে বলল, "গুহাতে লোক নেই।" সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, কুরাইশদের অগ্রে পদচিহ্নবিশারদ রয়েছে। সে বলে উঠল, "তোমাদের শিকার এই গুহা হতে অন্য কোথাও যায়নি।" এটা শুনে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। প্রাণাধিক রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবন বিপন্ন দেখে তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং কেঁদে ফেললেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি নিজের জন্যে ক্রন্দন করিনা, একমাত্র আপনার জন্যে আমার যত ভয় ও শংকা। আমি মরলে বিশেষ কিছু আসে যায় না, একটি মাত্র প্রাণ বিনষ্ট হবে, কিন্তু আপনার জীবনাবসানে দ্বীনের আলো নিভে যাবে। যে মর্মান্তিক দৃশ্য আমার চক্ষু বরদাশত করতে পারব না, তা কি আজ আমাকে দেখতে হবে? ইয়া রসূলুল্লাহ! শত্রুগণ এত নিকটে এসে পড়েছে যে, তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হায়! আমাদের উপায় কি? আমরা মাত্র দুইজন!" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা তাওবা) এই আয়াত পাঠের সাথে সাথে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হতে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয়ে এক অপূর্ব প্রশান্তিধারা নেমে আসল, তাঁর ব্যাকুল হৃদয় শান্তিতে ভরে উঠল। আল্লাহ্‌তায়ালা ফিরিশতাদের দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ) কে শত্রুর কবল হতে রক্ষা করতে লাগলেন। তিনি কাফিরদের দৃষ্টি তাঁর দিক হতে হটিয়ে দিলেন। এই প্রসংগটি কুরআনের নিম্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

"যদি তোমরা তাঁকে (রসূলকে) সাহায্য না কর (তা হলে আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করবেন যেরূপ তিনি ইতিপূর্বে এর চেয়েও দুঃসময়ে) তাঁকে সাহায্য দান করেছেন-যখন কাফিরগণ তাঁকে নির্বাসিত করল-যিনি দুইজনের মধ্যে একজন এবং অপরজন

www.pathagar.com

আবু বকর (রাঃ) যখন তাঁর গুহায় ছিলেন, যখন তিনি আপন সহচরকে বললেনঃ চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর (কালবের) উপর শান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁকে এমন ফৌজ (ফিরিশতা) দ্বারা সাহায্য দান করলেন যাদেরকে তোমরা (কখনও) দেখনি এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত ও সর্বতত্ত্বজ্ঞ।" (সুরা তাওবা ঃ ৪০)

শত্রুদলের কেউ কেউ বলল, "গুহায় প্রবেশ কর।" উমাইয়া বিন খলফ বলল, "কোন আবশ্যকতা নেই। যদি সে ভিতরে প্রবেশ করত তা হলে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যেত এবং কবুতরের ডিম ভেঙ্গে যেত।" এই বলে নির্লজ্জ পাষন্ড বস্ত্র উম্মোচন করে গুহামুখে প্রস্রাব করতে বসল। ভয় বিজড়িত কণ্ঠে শংকিত আবু বকর বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! সে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে।" তিনি বললেন, "যদি আমাদেরকে দেখতে পেত তবে সে আমাদের দিক হয়ে বস্ত্র উম্মোচন ও প্রস্রাব করতে লজ্জা বোধ করত।"

শান্তি বাহক ফিরিশতাগণের প্রভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কালবে অপূর্ব শক্তি ও অতূলনীয় শান্তির সঞ্চার হল। তাঁরা তাঁকে কাফিরদের সন্ধানী দৃষ্টি হতে রক্ষা করতেছিলেন। কাফিরগণ গুহার মুখ হতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর দ্বিতীয়। দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র তাঁর জন্য খাস। তিনি বয়সে দ্বিতীয়, ইসলাম গ্রহণে দ্বিতীয়, হিজরতের পথে দ্বিতীয়, জান ও মাল কোরবানে দ্বিতীয়, মৃত্যুতে দ্বিতীয়, চিরশয্যা কবরে শায়িত হিসাবে দ্বিতীয়।

প্রকাশ্য দিবালোক আল্লাহর শত্রুদের দৃষ্টির উপর জিল্লতির অন্ধকার পর্দা টেনে দিল। আর সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর গুহায় থেকে আল্লাহর রসূল (সঃ) ও সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাঁরই অসীম কুদরতের মহিমা উপলব্ধি করলেন। শত্রুকুল বিশাল দুনিয়াকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জন্যে সংকীর্ণ করে তুললে কি হবে, আল্লাহর রহমত তাঁর জন্যে ব্যাপকতর; আর আল্লাহর গজবে বিশাল পৃথিবী কাফিরদের জন্যে গুহামুখ হতেও সংকীর্ণতর।

তিন দিন তিন রাত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই সংকীর্ণ গুহায় অবস্থান করেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর অল্পবয়স্ক স্নেহের তনয় হযরত আব্দুল্লাহ তাঁদের নিকট রাত্রি যাপন করতেন এবং প্রভাতের পূর্বেই মক্কায় ফিরে আসতেন। দিনের বেলায় রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্বন্ধে কুরাইশদের আলাপ আলোচনা শ্রবণ করে রাতে তাঁদের নিকট গিয়ে ব্যক্ত করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর গোলাম হযরত আমের বিন ফুহাইরা (রাঃ) রাতে পর্যন্ত বকরী চরাতেন এবং অন্ধকার হলে বকরী দোহন করে তাঁদেরকে খাদ্য পৌছে দিতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় রয়েছেন তা শত্রুকুল ঘূণাক্ষরেও জানতে পারল না। তিন দিনের মধ্যে তাদের ক্ষিপ্ততার পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেল। তাদের ক্রোধাগ্নি অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল, সকলেরই মুখমন্ডলে নিরাশার ছায়া। নির্ধারিত রাতের নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বস্ত আব্দুল্লাহ বিন আরীকত উট দুটি নিয়ে গুহার সম্মুখে পৌছলেন। বাইরে উটের আওয়াজ শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহা থেকে বের হলেন। হযরত আয়িশা ও হযরত আসমা (রাঃ)

www.pathagar.com

কিছুটা পাথর যোগাড় করে রেখেছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) তা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর হাতে চল্লিশ সহস্র দিরহাম ছিল। ইসলাম ও দুস্থ মুসলমানদের সেবায় ব্যয় করার পর হিজরতের সময় চারি কি পাঁচ সহস্র দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। তাও এনে হাজির করবার জন্যে তিনি আব্দুল্লাহকে আদেশ দিলেন। আব্দুল্লাহ পিতৃআদেশ দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তা সাথে নিয়ে চললেন-একটি কাণাকড়িও তাঁর গৃহে অবশিষ্ট রইল না। তিনি ক্ষণিকের জন্যেও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহ বা তাঁদের হিজরতের কথা ভাবলেন না।

রাতের অন্ধকারে রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) স্ব স্ব উষ্ট্রে আরোহণ করলেন। তাঁরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে চললেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর গোলাম হযরত আমের বিন-ফুহইরা (রাঃ) কে খেদমতের জন্যে হাওদায় উঠায়ে নিলেন। সর্বমোট চারজন লোকের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকলেন।

সাথের ব্যাগটি খোয়া গেল

উপরোল্লিখিত পবিত্র স্থানগুলো জিয়ারত শেষে আমরা একই ট্যাক্সিতে বাসায় ফেরত আসছিলাম, মূসা সাহেব পথে তার বাসার নিকটে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন। পথিমধ্যে ড্রাইভার একটি ট্রাফিক সিগন্যাল (লালবাতি) না মেনে ট্যাক্সিটি চালিয়ে আসছিল। কিছুদূর আসতে না আসতেই একটি পুলিশের গাড়ী আমাদের গাড়ীটি থামাতে নির্দেশ দিলেন। আমাদের গাড়ী থামলে তিনি ড্রাইভারকে ডাকলেন। পুলিশ অফিসার (ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের) তাঁর গাড়ী থেকে আমাদের ইঙ্গিতে ডাকলেন। শহীদুল্ল্যা সাহেব গাড়ী থেকে নেমে পুলিশ অফিসারের নিকট গেলে তিনি আরবীতে কি যেন বললেন শহীদুল্ল্যা সাহেব তার কিছুই বুঝলেন না। বুঝবেনই বা কিভাবে, তিনিত বাঙ্গালী এবং ইংরেজী শিক্ষিত বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম সচীব।

এরপর পুলিশ ক্যাপ্টেনের সাথে আবারো ড্রাইভারের কি যেন কথোপকথন হল। ড্রাইভার দুঃখভারাক্রান্ত মনে ট্যাক্সিতে আরোহণ করল এবং ট্যাক্সি স্টার্ট দিল। সামনে সামনে পুলিশ অফিসারের গাড়ী চলতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্য স্থল নবীপাকের (সঃ) বাড়ীর পাশে এসে পড়লাম। অনতিদূরেই মসজিদে হারাম। ইতি পূর্বেকার সিদ্ধান্ত মতে ড্রাইভার এখানে গাড়ী থামিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল এবং সালাম জানিয়ে বিদায় নিল। মুহূর্ত পরেই শহিদুল্ল্যা সাহেব সাথে নেয়া আমার ব্যাগটি কোথায় জানতে চাইলেন। আমি দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পরলাম। হ্যাঁ তাইত! আমার ব্যাগটিত ট্যাক্সিতেই রয়ে গেছে। ব্যাগে আমার সকল কিছুই রয়েছে- পার্সপোর্ট, মার্কিন ডলার, কিছু রিয়াল এবং টিকেট। বিদেশ সফরকারীর মূল সম্বল এগুলো খোয়া গেলে তার অবস্থা একজন ভুক্তভোগীই মাত্র আঁচ করতে পারে। পড়ে নিলাম- 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

ভরসা হল যে, সম্ভবত গাড়িটি প্রফেসর মূসা সাহেবের। তাঁর মাধ্যমে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হদিস পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি শংকা বোধ করলাম যে, ট্যাক্সিতে অন্য কোন যাত্রী উঠলে আমার ব্যাগটি আত্মসাৎ হয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

মনে পড়ল যে, আমরা নাস্তা খাওয়ার জন্যে জাবালে রহমতে আরোহণের সময় আমি আমার হাত ব্যাগটি আমার সিটের পেছনে রেখে দিয়েছিলাম, ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যার কথা বেমালুম ভুলে বসেছিলাম।

আরেকটি মারাত্মক বোকামী হয়ে গেল যে, আমি আমার পাসপোর্টের নাম্বারও মনে রাখিনি অথবা তার কোন ফটোকপিও রাখিনি। অথচ ইতি পূর্বেকার হজ্বের সফরে আমি সকল কাগজপত্র এমনকি আমার টি.সি.রও কপি সংরক্ষণ করেছিলাম, একটি আলাদা ফাইলে। আলোচ্য সফরে বেশী আত্মবিশ্বাসের কারণে উপরোল্লিখিত কাগজপত্রের কপি আলাদাভাবে রাখা হয়নি যা মোটেই সঠিক হয়নি।

মুলতাযিম আশ্রয় প্রার্থনার স্থান

যাহোক, আমরা যখন গাড়ী থেকে নামলাম তখন জোহরের নামাজের সময় প্রায় কাছাকাছি। আমরা নামাজ পড়ে বাসায় ফিরার সিদ্ধান্ত নিলাম। নামাজ শেষে শহীদুল্যা সাহেবকে আমি বললাম যে, আমি পরে আসছি। খাওয়া দাওয়া করে আপনারা বাসায় বিশ্রাম নিন। অতঃপর আমি তওয়াফের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলাম। এখানে তওয়াফ শেষে মুলতাযিম ধরে আল্লাহ্পাকের দরগাহে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে পেশ করে দিলাম। আমার পরিপূর্ণ আস্থা জন্মাল যে, এমন একটি কঠিন সময়ে একমাত্র আল্লাহপাকই আমার সহায়। তিনি চাইলে এ হেন অবস্থায় আমার সেই হারান জিনিসগুলো আমার হাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। আমার জানা ছিল যে, হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার মধ্যবর্তী দেয়াল তথা মুলতাযিম দোয়ার জায়গা এবং আশ্রয় প্রার্থনার স্থান।

বড়ই বরকতময় ও ফজিলতের জায়গা এই মুলতাযিম

মোতাযিম শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'আঁকড়ে ধরার স্থান।' লোকেরা এটাকে আঁকড়ে ধরে দোয়া করে বলে এর নাম হচ্ছে মুলতাযিম। যে সকল জায়গায় দোয়া কবুল হয় এটি তার অন্যতম।

হাদীস দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের চেহারা, বুক, দুই হাত ও দুই কব্জি দিয়ে এটিকে আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছেন।

হযরত আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মক্কা বিজয়ের দিন আমি বললাম যে, আমি আমার পোশাক পরবো, আমার ঘরও ছিল রাস্তার উপর। তারপর আমি চললাম। তখন দেখলাম নবী করিম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম কা'বা শরীফ থেকে বের হন এবং কা'বার দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত দেয়াল স্পর্শ করেন। তাঁরা কা'বার দরজায় নিজেদের গাল বিছিয়ে দেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) সবার মাঝে অবস্থান করছিলেন।

বজলুল মাজহুদ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, মুসনাদে আহমদ বর্ণিত হাদীসে, হযরত আবদুর রহমান বিন সফওয়ান বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে হাজরে আসওয়াদ এবং বাবুল কা'বার মাঝখানে দেয়াল আঁকড়ে থাকতে এবং অন্যান্যদেরকে বাইতুল্লাহর বিভিন্ন অংশ আঁকড়ে ধরতে দেখেছি।

ইবনে মাজা হযরত আমর বিন আ'স থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর বিন আস মুলতাযিম আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহর কসম, এটি সেই জায়গা যেখানে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে আঁকড়ে ধরে দোয়া করতে দেখেছি।

www.pathagar.com

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে যে, আব্দুল্লাহ কা'বার তওয়াফ করেন, হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেন, পরে হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বার দরজার মাঝখানে দাঁড়ান এবং নিজের বুক, কপাল, দুই হাত ও কব্জি এইরূপ করেন। এই বলে তিনি নিজে এগুলো বিছিয়ে দেন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

হযরত ইবনে ওমর নিজের বুক ও কপাল মুলতাযিমে লাগিয়ে দোয়া করতেন। বাবুল কা'বা এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানটুকুই হচ্ছে মুলতাযিম। তবে হযরত আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামকে হাতীম পর্যন্ত বাইতুল্লাহ্‌কে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যা বলেছেন, তার জবাব হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোলতাযিমে দাঁড়িয়েই দোয়া করেছেন তবে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং মোলতযিমে সবার সঙকুলান না হওয়ায় কিছু সংখ্যকতো মোলতাযিমেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আর অবশিষ্টরা হাতীম পর্যন্ত বাইতুল্লাহ্‌কে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মোলতাযিম দোয়া কবুলের একটি পরীক্ষিত জায়গা। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'মোলতাযিম হচ্ছে দোয়া কবুলের জায়গা। কোন বান্দাহ্‌ এখানে দোয়া করলে তা অবশ্যই কবুল হয়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম এই হাদীস শুনার পর যখনই আমি মোলতাযিমে দোয়া করেছি তখনই আমার দোয়া কবুল হয়েছে। হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বলেন, যখন ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদীস শুনেছি তখন থেকেই কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে মোলতাযিমে গিয়ে দোয়া করার পর আল্লাহ সে সকল দোয়া কবুল করেছেন এবং সমস্যাগুলো দূর করে দিয়েছেন। এই হাদীসের সনদের রাবী সুফিয়ান এবং হোমাইদীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়াও এখন পর্যন্ত বহু লোক মোলতাযিমে দাঁড়িয়ে দোয়া করার পর তাদের দোয়া কবুল হতে দেখেছেন।

কাজী এ'য়াদ তাঁর শাফা গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বইতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হল ঃ এই মোলতাযিমে দাঁড়িয়ে কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, তাঁর দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।' তারপর কাজী এ'য়াদ বলেন, আমি এবং এই হাদীসের সকল রাবী এই হাদীসটি শুনার পর মোলতাযিমে গিয়ে দোয়া করায় আমাদের সবার দোয়া কবুল হয়েছে।

আযরাকী মোলতাযিমের ফজীলত বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, হযরত আদম (আঃ) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসার পর সাতবার বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ করেন এবং বাবুল কা'বার সামনে দু'রাকাত নামায পড়েন। পরে মোলতাযিমে এসে এই প্রার্থনা করেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌ তুমি আমার প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জান। আমার ওজর আপত্তি কবুল কর, তুমি আমার দেহ ও অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, সুতরাং আমার গুনাহ মাফ কর। তুমি আমার প্রয়োজন জান, তাই আমার প্রার্থনা পূরণ কর। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে অন্তর আবাদকারী ঈমান এবং সত্য ও মজবুত বিশ্বাস কামনা করি, যেন এর ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তুমি আমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছ এবং যে পরিমাণ সন্তুষ্টি নির্ধারিত করেছ তা ছাড়া এর বাইরে অন্য কিছু আমাকে স্পর্শ করবে না।' তখন আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) এর কাছে ওহী পাঠিয়ে

www.pathagar.com

বলেন, হে আদম, তুমি আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছ আমি তা কবুল করলাম। তোমার সন্তানদের মধ্যেও যদি কেউ আমার কাছে দোয়া করে, আমি তার দুঃখ পেরেশানী দূর করে দেব। তাকে হারিয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে, তার অন্তর থেকে অভাব-দারিদ্র্য দূর করে দেব। তার সামনে ধন ও প্রাচুর্যের ফোয়ারা দেব, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যবসা থেকে তাকে দান করবো এবং সে দুনিয়া না চাইলেও দুনিয়া তার কাছে আসবে।

হযরত আদম (আঃ) এর তওয়াফের পর থেকেই কা'বার তওয়াফের সুন্নত চালু হয়।

আলফাকেহী বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ বিন জোবায়ের বলেন, আমি বসরা বাসীদের চেয়ে অন্য কাউকে এই ঘরের প্রতি এত বেশী আসক্ত দেখিনি। তিনি বলেন, বসরা থেকে আগত এক মহিলা কা'বা শরীফে এসে মোলতাযিমে দাঁড়ায়, সে দোয়া করে এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

ফাকেহী আরো উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদ এক ব্যক্তিকে বাবুল কা'বা এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে দেখে তার কাঁধ কিংবা পিঠের উপর হাত রেখে বলেন, মোলতাযিমকে আঁকড়ে ধর। মুজাহিদ আরো বলেন, মোলতাযিমে দোয়া করা হয়। এমন মানুষ কমই আছে যে, মোলতাযিমে দোয়া ও আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, বরং সবাই পেয়েছে।

মুলতাযিমকে আঁকড়ে ধরে কা'বার মালিকের নিকট মাগফিরাত চেয়েছি। দুনিয়া আখিরাতের সকল অকল্যাণ, বেইজ্জতি ও জিল্লতি থেকে ক্ষমা চেয়েছি। নবীপাকের (সঃ) নিকট সালাম পেশ করেছি বারবার। অবশেষে আল্লাহপাকের নিকট সেই খোয়া যাওয়া জিনিসগুলো ফিরে পাওয়ার জন্যে ধর্না দিয়েছি। মালিক-মনিবের নিকট নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরে এমন কঠিন সময়ে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা চেয়েছি। তাঁর কুদরতি হাত আমার প্রতি প্রসারিত করার জন্যে আরজ করেছি। বলেছি, হে আল্লাহপাক আমি "ওমরার ডায়েরী থেকে" এই বই লিখার মনস্থ করেছি, কিন্তু আমি এখন আমার ডলার, পাসপোর্ট ইত্যাদি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কি লিখব? আমি কিভাবে লিখব যে এখানে তোমার মেহমান থাকা অবস্থায় আমার জিনিস খোয়া যেতে পারে? সৌদীরা যেখানে আমার মেহমানদারী করার কথা, সেখানে কিভাবে তারা আমার একমাত্র সম্বল আত্মসাৎ করতে পারে? চোখের পানি ফেলে আল্লাহপাকের নিকট এবং একমাত্র তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করেছি এসব বলে।

হিজরে ইসমাইল বা হাতীমে

অতঃপর হিজরে ইসমাইল বা হাতীমে গিয়ে নফল নামাজ শেষে অনুরূপ ভাবে আল্লাহপাকের দরগাহে নিজেকে পেশ করেছি।

হিজরে ইসমাইলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'ইসমাইল কর্ণার'। পারিভাষিক অর্থে কা'বা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের অর্ধবৃত্ত দেয়ালের ভেতর গোলাকার স্থানকে হিজরে ইসমাইল বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বার উত্তর পার্শ্বে ছায়া গ্রহণের জন্যে একটি বিশ্রামাগার বা আরীস তৈরী করেছিলেন। এটাই পরবর্তীতে হযরত ইসমাইলের (আঃ) ভেড়া বকরীর খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহৃত হয।

www.pathagar.com

আযরাকী উল্লেখ করেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আরাক গাছের কাঠ দিয়ে কা'বার পার্শ্বে ছায়াদার আ'রীস বা বিশ্রামাগার তৈরি করেন এবং তা হযরত ইসমাইলের ছাগল দুম্বার খোঁয়াড়ে পরিণত হয়। এ সকল রেওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরে ইসমাইল কা'বা শরীফের অন্তর্ভূক্ত ছিল না বরং তা কা'বার বাইরে অবস্থিত খোঁয়াড় ছিল।

বিশুদ্ধ ও মশহুর রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত আছে, কোরায়েশরা কা'বা নির্মাণের সময় উত্তর পার্শ্বে সাড়ে ছয়হাত কা'বার অংশ অর্থাভাবের কারণে ছেড়ে দেয় এবং সেই অংশটুকু হিজরে ইসমাইলের সাথে যোগ করে দেয়।

পরবর্তীতে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় কুরাইশদের ছেড়ে দেয়া অংশটুকু পুনরায় কা'বার অন্তর্ভূক্ত করেন। কিন্তু পরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুনরায়, কা'বার সেই সাড়ে ছয়হাত অংশ কেটে হিজরে ইসমাইলের সাথে যোগ করে দেয়। ফলে, হিজরে ইসমাইলে কা'বার সাড়ে ছয় হাত অংশ ঢুকে পড়ে এবং তা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে।

তারীখে কা'বার লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শেখ হোসাইন বাসালামাহ লিখেছেন যে, হিজরে ইসমাইল কয়েকদফা ভাংগা-গড়া হয় এবং বিভিন্ন সময় এর নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। ১২৬০ হিজরীতে, সুলতান আব্দুল মজিদ খান উসমানীর আমলে, সর্বশেষ হিজরে ইসমাইল ভাংগা ও গড়া হয়।

হিজরে ইসমাইলের অপর নাম হচ্ছে হাতীমে কা'বা। হাতীম শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাঙ্গা বা ভগ্নাংশ। হাতীমে কা'বার অর্থ হচ্ছে কা'বার ভগ্নাংশ তথা কা'বার বাইরের অবশিষ্টাংশ। ইবনুল আসীর লিখেছেন যে, দুটো স্থানের নাম হচ্ছে হাতীম। ১ম টি হচ্ছে, হাজরে আসওয়াদ এবং বাবুল কা'বার মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ মুলতাযিম। ২য় টি হচ্ছে, কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফকে হাতীম নামকরণের কারণ হচ্ছে এটিকে উপরে উঠানো হয়েছিল এবং নীচে নামানো হয়েছিল। তখন সে তার ভিত্তিমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কা'বাকে হাতীম নামকরণের ২য় কারণ হচ্ছে জাহেলীয়াতের যুগে, আরবরা তওয়াফের কাপড় কা'বার ভেতরে ফেলে যেত এবং কালের আবর্তনে তা পুরাতন হয়ে মিটে যেত। তানহাতিম অর্থ মিটে যাওয়া।

আযরাফী বর্ণনা করেছেন যে, হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহীম এবং যমযম কূপের মধ্যবর্তী স্থানকে হাতীম বলা হয়। এখানে দোয়া কবুল হয় বলে লোকেরা বেশী ভিড় করে এবং একে অপরের উপর ভেঙ্গে পড়ে।

অনেক আলেম উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) কে হিজরে ইসমাইলে দাফন করা হয়েছে। তিনি ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর মা হাজারকেও একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। হিজরে ইসমাইলে, হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং হযরত হাজারের কবর সম্পর্কে, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে জরীর তাবারী এবং ইবনে কাসীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার বাইতুলল্লাহ শরীফের ভেতর ঢুকে নামায পড়তে চেয়েছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে ইসমাইলে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং বলেন, "এখানেই নামায

www.pathagar.com

পড়, যদি তুমি কা'বার ভেতর নামায পড়তে চাও, কেননা, এটি কা'বারই অংশ বিশেষ।"

হযরত আলী বিন আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কে বলেছেন, "হিজরে ইসমাইলের এক দরজায় একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে এতে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায়কারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, 'তোমার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেছে, এখন থেকে নতুনভাবে আমল কর।' এর অন্য দরজায় দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের সময় ঐ ঘর উঠিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত দন্ডায়মান আরেকজন ফেরেশতা, নামায শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, সকল মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তুমি উম্মতে মুহাম্মদের সত্যিকার অনুসারী হও, তাহলে, তুমি রহমত প্রাপ্ত।

হযরত হাসান বসরীর 'রেসালা' বইতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) মক্কার অতিরিক্ত গরমের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠান এবং বলেন, আমি তোমার জন্যে হিজরে ইসমাইলে বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেব; কিয়ামত পর্যন্ত সেই দরজা দিয়ে তোমার জন্য বেহেশতের সুশীতল ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

হযরত হাসান বসরীর 'রেসালা' বইতে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিন হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) আসলেন এবং নিজের সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কোথা থেকে এসেছি তোমরা কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না? তখন তারা প্রশ্ন করল। তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি বেহেশতের দরজায় দন্ডায়মান ছিলাম।' তিনি তখন মীযাবের নীচে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন।

মীযাবে কা'বার নীচেও দোয়া করেছি

এই মীযাবে কা'বার পরিচয় ও ফজীলত বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করছি। নবী করীম (সঃ) এর জন্মের ৩৫ বছর পর, কোরাইশরা যখন কা'বা শরীফ নির্মাণ করে, তখন তারা কা'বার ছাদ দেয় এবং ছাদের পানি সরার জন্য একটি নল লাগায়। এই নলকেই মীযাব বলা হয়। এর আগে কা'বার ছাদ ছিল না এবং মীযাবও ছিল না তার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) কা'বা নির্মাণের সময় ছাদে একটি মীযাব লাগান এবং কোরাইশদের মত তিনিও মীযাবের পানি হিজরে ইসমাইলে পড়ার ব্যবস্থা করেন। তারপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফও অনুরূপ মীযাব লাগান।

১২৭৬ হিজরীতে তুর্কী সুলতান আবদুল মজিদ খান, কনষ্টান্টিনোপলে একটি সোনার মীযাব তৈরি করেন এবং সেই বছরই তা কা'বায় লাগান। এতে প্রায় ৫০ রতল সোনা লাগানো হয়েছে। সেটিই সর্বশেষ মীযাব। বর্তমান কাবায় মওজুদ মীযাবটিই সেই মীযাব। এর পরে আজ পর্যন্ত ঐ মীযাবের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

মীযাবের নীচে দোয়া করার ফজীলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনদের পক্ষ থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

আল্লামা আযরাকী আতা থেকে এবং আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "তোমরা লোকদের নামাযের জায়গায় নামায পড় এবং নেককারদের পানীয় পান কর।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

লোকদের নামাযের জায়গা বলতে কোনটাকে বুঝায়? তিনি জবাবে বলেন, 'সেটি হচ্ছে মীযাবের নীচে'। তারপর জিজ্ঞেস করা হল নেককারদের পানীয় কি? তিনি বলেন, 'সেটি হচ্ছে যমযম'।

আযরাকী আ'তার বরাত দিয়ে বলেছেন, মীযাবের নীচে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে সেই দোয়া কবুল হয এবং দোয়াকারী ব্যক্তি মায়ের পেট থেকে সদ্য প্রসূত নবজাত শিশুর মত নিস্পাপ হয়ে যায়।

আল মোস্তাজার খানায়ে কা'বার আরেকটি বরকতময় স্থান

রোকনে ইয়ামানী থেকে কা'বা শরীফের পেছনে বিলুপ্ত দরজা পর্যন্ত ৪ হাত জায়গাকে আলমোজার বা গুনাহ মুক্তির জায়গা বলা হয়। এটাকে 'বৃদ্ধ কোরাইশদের মোলতাযাম' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। হযরত মুযাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাবা শরীফের পেছনে দাঁড়িয়ে দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হয় এবং সে মায়ের পেট থেকে সদ্য ভূমিষ্ট নবজাত শিশুর মত নিস্পাপ হয়ে যায়। নবী করিম (সঃ) থেকে শুনা ব্যতীত, সম্ভবতঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এ জাতীয় বক্তব্য পেশ করতে পারেন না। ইমাম শাবী (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ও তাঁর ভাই মুসআব, আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এই স্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন। ইমাম শাবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে দেখে গেছেন যে, যাঁরাই ঐ জায়গায় কোন কিছুর জন্যে দোয়া করেছেন তাঁরাই তা পেয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) জান্নাতের জন্যে দোয়া করে এর সুখবর লাভ করে গেছেন। এ ছাড়াও বড় বড় মুসলমানদের অনেকেই ঐ জায়গায় দোয়া করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর নাতী কাসেম বিন মুহাম্মদ (রাঃ) প্রমুখ। 'আখবারে মক্কার' লেখক আল ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, ওমর বিন আবদুল আযীয ইবনে আবি মোলায়কাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) কা'বা শরীফের পেছনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছিলেন কিনা? ইবনে আবি মোলায়কা বললেন, হ্যাঁ করেছিলেন। তিনি কা'বার পেছনে দু'হাত বিছিয়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছিলেন।

ব্যাগ হারানোর পর

তওয়াফকালে আমি মুলতাযিমে এবং হাতীমে ও মীযাবে কা'বার নীচে আল্লাহপাকের নিকট মিনতি ও আকুতি পেশ করে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। বলাবাহুল্য যে, এসময় আমি একেবারেই কপর্দকহীন। শুধু তাই নহে পাসপোর্ট ভিসা সাথে নেই। সৌদি পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক কর্তৃক যেকোন মুহূর্তে আমাকে অবৈধ অভিবাসী বলে গ্রেফতার করার আশংকাও রয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কারণ অনেক বাঙ্গাল এখানে রয়েছে বেআইনী ভাবে; যারা ধরা পড়লে পাসপোর্ট হারানো সম্পর্কে বানোয়াট গল্প উপস্থাপন করে নিস্তার পেতে চেষ্টা করে থাকে।

হোটেলে উপস্থিত হলে সাথী শহিদুল্যা সাহেব ছেলেকে দিয়ে আমার জন্যে আমার পছন্দের খাবার রুটি ও 'ফুল' (সিমের বিচি দ্বারা তৈরী একটি সুস্বাদু এবং উপাদেয়

www.pathagar.com

খাবার) নিয়ে এলেন। তখন চিন্তায় আমার খাবার রুচি চলে গেছে। সামান্য কয়েক টুকরা রুটি কোন রকমে গলাধঃকরণ করে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট যেয়ে মূসা সাহেবের সাথে টেলিফোন সংযোগ লাগানোর অনুরোধ জানালাম। অতঃপর মূসা সাহেবকে ব্যাগটি হারানোর ঘটনা খুলে বলতেই তিনি 'ইন্নালিল্লাহ' বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এই বলে যে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন আপনার ড্রাইভার নয় কি? তিনি জবাব দিলেন যে, না। তবে 'অন কলে' সে সময় সময় আমার ডিউটি করে। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরো জানালেন যে, তিনি তার বাসা এক সময় চিনতেন। এখন চিনেন না। কারণ সে সম্প্রতি বাসা পাল্টিয়েছে। মূসা সাহেব ভরসা দিয়ে জানালেন যে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন। আশা করা যায় যে ব্যাগটি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি বললেন, চিন্তা করবেন না। বিকেলে মসজিদে হারামে দেখা হবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, মূসা সাহেব প্রায়শঃই মাগরিবের পূর্বক্ষণ থেকে বাদ এশা পর্যন্ত মসজিদে হারামের বাবে মালিক ফাহাদ গেইট খয়াবর গেইট থেকে ভেতরের দিকে পনের নম্বর পিলারের গোড়ায় থাকেন। তিনি এখানে দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ প্রদান করেন। অবসর সময়ে বরকত হাসিলের জন্যে এখান থেকে খানায়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে থাকেন; এসব কথা তিনি ইতিপূর্বে বলেছেন।

যাহোক, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা হারাম শরীফে আছর নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এখানে এসে বাদ আছর সেই পনের নম্বর পিলারের নিকট যথারীতি মূসা সাহেবের সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে সাহস দিয়ে বললেন যে, কোন চিন্তা করবেন না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি উল্লেখ করলেন যে, তিনি হলেন 'হারানোর মাষ্টার'। এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র মক্কায় তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনকালে বাংলাদেশী হাজীদের সেবায় তাঁর অনেক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন। মদীনা শরীফের হজ্ব কমিটির চেয়ারম্যান এবং এডভাইজার থাকাকালীন একটি কৌতুককর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, মদীনায় হারিয়ে যাওয়া এক হাজী বললেন যে, আমার বাসা হারিয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'না' 'আপনার বাসা নয়, আপনি হারিয়ে গেছেন।'

আমার হারানো ব্যাগ সম্পর্কে বললেন যে, ড্রাইভার অত্যন্ত নির্ভরশীল, তার হাতে পড়লে ব্যাগ অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে সে অন্যান্য যাত্রী বহন করে। খারাপ যাত্রীর হাতে পড়লে ব্যাগটি না পাওয়ার আশংকা রয়েছে। তিনি বললেন, আপনার বর্তমান এ পর্যায়ে টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। আরো বললেন, মনে কিছু নিবেন না; আপনার এমন অবস্থায় দান সদকা গ্রহণ শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েজ। তবে পাসপোর্ট ভিসা সংগ্রহে কিছুটা ধকল রয়েছে। অভয় দিয়ে বললেন, এগুলো তিনি স্বয়ং ম্যানেজ করে দিবেন। তিনি আমার নিকট পাসপোর্ট নাম্বার জানতে চাইলেন। কিন্তু দুঃখজনক যে, আমি আমার পাসপোর্ট নাম্বার বলতে পারলাম না, যার কথা ইতি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমি অবশ্য বললাম যে, (দেশের) বাসায় একটি ফাইল রয়েছে সেখানে থাকতে পারে। আমার বাসার টেলিফোন নাম্বার নোট করে মূসা সাহেব বললেন যে, ঠিক আছে আমি টেলিফোন করে পাসপোর্ট নম্বর সংগ্রহ করে নেব। এসকল কথা বার্তা হওয়ার পর আমি তওয়াফ করার জন্যে প্রস্থান করলাম। মাগরিবের

www.pathagar.com

পূর্বে কয়েকবার তওয়াফ শেষে মুলতাযিম ধরে ও হাতিমে গিয়ে কাবার মালিকের নিকট ধর্না দিলাম। তাঁর দয়া ও করুণা ভিক্ষা চাইলাম। নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরে তাঁর সাহায্য কামনা করলাম। এরপর মাগরিব ও এশা পড়ে মূসা সাহেবের সাথে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করলাম। শহীদুল্যা সাহেব ও তাঁর ছেলে জিল্লুর রহমান ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছেন। মূসা সাহেব আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে খাবার খাওয়ালেন। খাবারের বিল আমাদেরকে প্রদান করতে দিলেন না।

প্রসঙ্গতঃ মূসা সাহেব আমাদের এ সফরে যে কেবল প্রতি বিকালেই সঙ্গ দিতেন তা নহে, আমাদেরকে নাস্তাপানি এবং রাতের খাবারও খাওয়াতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে নিবৃত্ত করা যেত না। তিনি বলতেন, আমরা তাঁর মেহমান। এ দায়িত্ব তাঁরই। তিনি বাসায় একা থাকেন। ভাড়া মাসে প্রায় ১২ হাজার রিয়াল। স্ত্রী পরিজন থাকেন ঢাকায় নিজের বাড়িতে। বাসায় রান্নার ভাল ব্যবস্থা নেই বলে তিনি হোটেলেই খাওয়া দাওয়া করেন।

রাতের খাবার শেষে মূসা সাহেব নিজের বাসায় এবং আমরা হোটেলে চলে এলাম। আলহামদু লিল্লাহ্, এর মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। অসীম সাহস ও ভরসার জন্ম নিল যে, আল্লাহপাক তার মেহমানকে নিরাশ করবেন না।

ব্যাগ হারানোর দ্বিতীয় দিন য়থারীতি পার হল। রাতের তাহাজ্জুদ, সময়মত নামাজ, তওয়াফ, মুলতাযিম আঁকড়ে ধরে ও হাতিমে দোয়া এবং বিকেলে মূসা সাহেবের সাক্ষাৎ, একত্রে রাতের খাবার গ্রহণ ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হল।

ব্যাগটি পাওয়া গেল

ব্যাগ হারানোর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর, ১৯৯৯ইং হারাম শরীফে নামাজ শেষে জানলাম যে, মসজিদে হারামে "লষ্ট এন্ড ফাউন্ড" বিভাগে খবর নেয়া এবং নোট করা প্রয়োজন। কিন্তু আরবী না জানার বিষয়টি অন্তরায় বোধ করলাম। ভাগ্যক্রমে মসজিদে একটি বাঙ্গালী যুবক পেয়ে গেলাম। সে অনেকদিন থেকেই হারাম এলাকায় চাকুরী উপলক্ষে বসবাস করছে। আরবীতে কথাবার্তা বলতে পারে। তাকে নিয়ে "লষ্ট এন্ড ফাউন্ড" অফিসে গিয়ে ব্যাগটির কোন হদিস না পেয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ রেকর্ড করতে চাইলাম। কিন্তু কর্তব্যরত কর্মকর্তা আমাদের জানালেন যে, মসজিদ এলাকায় ব্যাগটি হারান যায়নি বলে অভিযোগটি রেকর্ড করা যাবে না। কাজেই আমরা হোটেলের পথে রওয়ানা হলাম। পথে সেই বাঙ্গালী যুবকটি বলল যে, বাঙ্গালীদের হাতে ব্যাগটি পড়লে তা কখনো ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পাসপোর্টটি কমপক্ষে পাঁচ হাজার রিয়ালে বিক্রি হবে। অবৈধ বাঙ্গালী অভিবাসী গলাকাটা পাসপোর্ট হিসাবে তা চালিয়ে নেবে। ব্যাগের সেই টিকেট দিয়ে উক্ত গলা কাটা পাসপোর্টের মাধ্যমে সহজেই দেশে পাড়ি জমানোর হবে সূবর্ণসুযোগ।

যাহোক, আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম। সকাল বেলায় টেলিফোনে মূসা সাহেব আমার পাসপোর্টের নাম্বার জানিয়ে দিয়েছিলেন যা তিনি ঢাকায় আমার বাসা থেকে টেলিফোনে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি আমাকে পাসপোর্ট নাম্বার উল্লেখ করে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে থানায় একটি জি,ডি, করার পরামর্শ দিলেন। জি,ডি,র কপি ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট এবং ভিসা সংগ্রহের জন্যে লাগবে। আমি হোটেল ম্যানেজারের কক্ষে

www.pathagar.com

জি,ডি,র উদ্দেশ্যে থানার বরাবরে দরখাস্ত লিখতে শুরু করলাম। দরখাস্ত লিখা শেষ করে তার আরেকটি কপি করছিলাম। তার শেষান্তে আসার পর ম্যানেজার সাহেব বললেন, নিন আপনার টেলিফোন, মূসা সাহেব। রিসিভার তুলে নিয়েই সালাম আদান প্রদানের পর মূসা সাহেব ওপার থেকে বলে উঠলেন, আপনার ব্যাগটি পাওয়া গেছে। তা আমার হাতে। এরপর ব্যাগে কি আছে জানতে চাইলেন। আমি ব্যাগের কোন পকেটে কি ছিল বলতে থাকলাম। তিনি ওপার থেকে মার্কিন ডলার, পাসপোর্ট, টিকেট, নগদ কিছু রিয়াল সব তথ্য দিতে লাগলেন। আল্লাহপাকের হাজার শোকর আদায় করলাম। বলে উঠলাম, আলহামদু লিল্লাহ।

এরপর মূসা সাহেব ঘটনা বৃত্তান্ত সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। তিনি জানালেন যে, গাড়িটি মূলত ছিল প্রাইভেট কার যা দ্বারা যাত্রী বহন করা বেআইনি। পুলিশ ক্যাপ্টেন যখন নিশ্চিত হল যে, ড্রাইবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তখন তাকে ফলো করার আদেশ দিয়ে সে আগে আগে চলছিল। আমাদেরকে যথাস্থানে নামিয়ে দিতে যে সময় লাগল তাতে আমাদের ড্রাইভার সেই ক্যাপ্টেনের গাড়ী হারিয়ে ফেলল। ক্যাপ্টেনের অফিসের ঠিকানাও তার জানা ছিল না। কাজেই ড্রাইভার কিছুক্ষণ এদিক সেদিক গাড়ী চালিয়ে অবশেষে নিজ বাসায় ফিরে গেল। এরপর গাড়ী চালান সে নিরাপদ মনে করল না। কাজেই এই তিন দিন গাড়ী চালান হয়নি। আলোচ্য দিনে সকাল বেলায় ড্রাইভারের শিশু সন্তানেরা গাড়ীতে চড়ে স্কুলে যেতে বায়না ধরায় ড্রাইভার গাড়ী বের করল। ড্রাইভার গাড়ী ষ্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় সে দেখল যে, ছেলেরা একটি হাত ব্যাগ নিয়ে পরস্পরে টানাটানি করছে। ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি ছেলেদের থেকে নিয়ে নিল। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, ব্যাগটি আমাদেরই। স্কুল শেষে ছেলেদের বাসায় পৌঁছিয়ে কালবিলম্ব না করেই ব্যাগটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সে মূসা সাহেবের নিকট ফিরে এল। আল্লাহ্পাকের কুদরত ভেবে মাথা হেট হয়ে এল।

বায়তুল্লাহর প্রতি চেয়ে থেকেছি

সাথী শহীদুল্যা সাহেব নিয়ত করেছেন যে, তিনি মসজিদে হারামে বসে কোরআনে মজিদ খতম করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং শেষতক কামিয়াবও হলেন। আল্লাহ্পাক তাঁকে এর জা'যা দান করুন। আমি ও জিল্লুর রহমান বেশী বেশী তওয়াফ করতে চেষ্টা করেছি এবং নফল নামাজ পড়েছি। প্রতি পাঞ্জেগানা নামাজের আগে/পরে ওমরি কাজা পড়েছি এবং অন্য সময়ে খানায়ে কাবার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কারণ বাইতুল্লাহর প্রতি নজর করা একটি এবাদত। হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন কাবা শরীফ দেখা একটি এবাদত।

www.pathagar.com

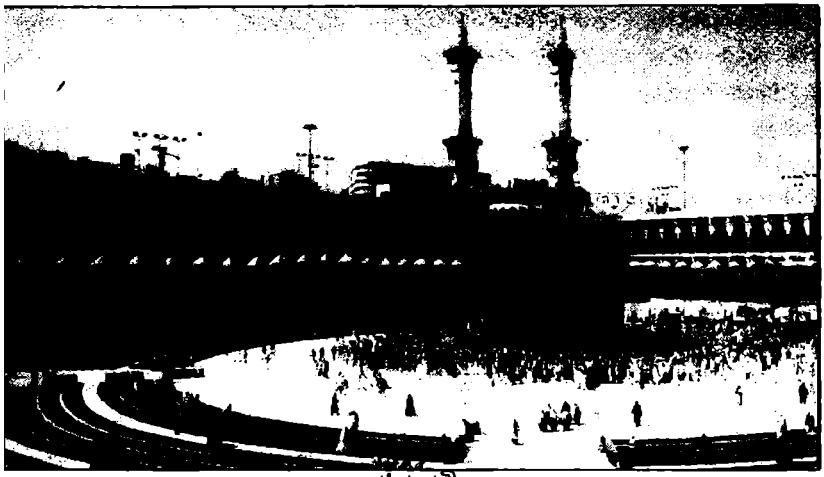

কা'বা শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ঘরের বিভিন্ন প্রকার এবাদতের ব্যাপারে আল্লাহর রহমতের যে বন্টনের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে আল্লাহর ঘরের প্রতি দৃষ্টি দানকারীদের জন্যে ২০টি রহমত নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই হাদীসটি হচ্ছে এইঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, এই কাবা ঘরের উপর প্রত্যেক দিন ও রাতে ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে এর তওয়াফকারীদের জন্যে ৬০টি, মসজিদে হারামে এতেকাফকারীদের জন্যে ৪০টি এবং কা'বার প্রতি দৃষ্টিকারীদের জন্যে ২০টি রহমত নাযিল হয়। অন্য এক বর্ণনায়, নামাযীদের জন্যে ৪০টি রহমত নাযিলের কথা এসেছে। ঐ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মক্কার মসজিদের লোকদের জন্যে ১২০টি রহমত নাযিল করেন। আবুজর ও আযরাকী এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। (আলকোরা)

সাখাওয়ী তাঁর মাকাসেদে হাসানা গ্রন্থে, তাবরানী তাঁর মায়াযেম গ্রন্থে, আযরাকী, বায়হাকী, হারেস তাঁর মোসনাদ গ্রন্থে এই হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কারুর কারুর বর্ণিত শব্দগুলো হচ্ছে এইরূপঃ ১শত রহমতের ৬০টি তওয়াফকারীদের জন্যে, ২০টি মক্কাবাসীদের জন্যে এবং অনুরূপ (বিশটি) অন্যান্য সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়।

আল-মোনজেরী ইবনে আব্বাসের উপরোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, বায়হাকী এই হাদীসটি ভাল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ আত তাবারী এই রহমতের বন্টনের পদ্ধতি এবং যাদের উপর রহমত নাযিল হবে তাদের সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর ঐ আলোচনার সার সংক্ষেপ হচ্ছেঃ ঐ রহমত নাযিলের দুটো ব্যাখ্যা আছে ঃ

প্রথমটি হচ্ছে, ঐ রহমত বর্ণিত তিন দলের প্রত্যেকের উপর সমানভাবে নাযিল হবে, তা তাদের কম বা বেশী আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এই আলোকে প্রত্যেক

www.pathagar.com

তওয়াফকারী ৬০টি, প্রত্যেক কাবা দর্শনকারী ২০টি এবং প্রত্যেক নামাযী ৪০টি রহমত পাবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই রহমত আমলের পরিমাণ, (কম-বেশি আমল) এবং আমলের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে নাযিল হবে। এই ব্যাখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। এই ব্যাখ্যার আলোকে, সকল তওয়াফকারী ৬০টি, সকল কা'বা দর্শনকারী ২০টি এবং সকল মুসল্লী ৪০টি রহমত পাবে। এতে উপরোল্লিখিত তিনদলের প্রত্যেক দলের বহুসংখ্যক লোক আল্লাহর ঐ রহমতের সুশীতল ছায়া পাবে এবং একজন লোক বহু সংখ্যক রহমতের অধিকারী হবে।

আল-কোরা কিতাবে রহমতের হাদীসটির দুটো বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ রহমত 'এই ঘরের অধিবাসী'দের উপর নাযিল হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ রহমত, 'মসজিদের অধিবাসী'দের উপর নাযিল হয়। হাফেজ তাবারী বলেছেন, ঐ দুই বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। তাঁর মতে, 'মসজিদে মক্কা' এই শব্দ দ্বারা কা'বা শরীফ বুঝানো হয়ে থাকে। কা'বা বা আল্লাহর এই ঘরকে কুরআনে 'মসজিদ' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ 'তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।' এখানে মসজিদে হারাম অর্থ হচ্ছে কা'বা শরীফ। অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ ফিরাও।

কা'বা শরীফ দেখা ইবাদত

আল-কোরা কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মুসীরুল গারাম' এর লেখক জাফর বিন মুহাম্মদ, তাঁর বাপ থেকে এবং তাঁর বাপ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'কাবা শরীফ দেখা এবাদত।' এর সমর্থনে হযরত আয়িশার বর্ণিত হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য।

আমাদের অতীতের বুজূর্গদের অনেকেই এই এবাদতটির ফজীলতের ব্যাপারে নিজেদের রুচি, জ্ঞান এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কা'বার দিকে নজর করা খালেস ঈমানের পরিচয়। মুজাহিদ বলেছেন, কা'বার দিকে নজর করা এবাদত। সাঈদ বিন মোসাইয়েব বলেছেন, যে ঈমান ও সত্য বিশ্বাসের সাথে কাবা শরীফের দিকে তাকায়, সে গুণাহ থেকে নবজাতক শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

আতা বলেছেন, কা'বার দিকে নজর করা এক বছরের নামায তথা কেয়াম, রুকু ও সেজদা থেকে উত্তম।

ইবনুস সায়েব আল-মদনী বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সত্য বিশ্বাস সহকারে কা'বার দিকে তাকায়, গাছ থেকে যেমন পাতা ঝরে পড়ে, তেমনি তার গুনাহও ঝরে পড়বে। (মুসীরুল গারাম) তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কাবার দিকে নজর করা এবাদত। কাবার প্রতি নজরকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে, সার্বক্ষণিক রোযাদার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদের সমান।

আযরাকী উপরোক্ত ৪টি বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন।

কা'বার বৈশিষ্ট্য

এ পর্যায়ে আমরা বাইতুল্লাহ শরীফের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১। পেশাব-পায়খানা করার সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে বসা হারাম। বেশী সংখ্যক আলেমের মতে, ঘর কিংবা মাঠ সর্বত্র এই হুকুম প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে এই হুকুম শুধু মাঠের জন্য প্রযোজ্য; ঘরের জন্যে নয়। মানুষ দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেন, সর্বত্রই এই হুকুম মেনে চলা জরুরী।

এর কারণ সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কা'বার সম্মান ও মর্যাদাকে সামনে রেখেই এই হুকুম দেয়া হয়েছে। হযরত সারাকা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি পেশাব পায়খানার জন্যে উন্মুক্ত মাঠে যায়, সে যেন আল্লাহর কিবলার সম্মান করে এবং কিবলামুখি হয়ে না বসে।' এটাই হচ্ছে বেশীর ভাগ আলেমের মত। কোন কোন আলেম এর ভিন্ন কারণ বলেছেন যা সমালোচনা মুক্ত নয়। বর্ণিত হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গিই বেশী সঠিক বলে মনে হয়।

২। কা'বা শরীফে সিল্কের পর্দা বা গেলাফ ব্যবহার করা জায়েয। ইমাম গাযযালী (রঃ) তাঁর ফতোয়ায় বলেছেন, কুরআন শরীফকে সোনা দিয়ে এবং কা'বা শরীফকে সিল্ক দিয়ে সাজানো জায়েয আছে। কা'বা ব্যতীত অন্য কিছুতে তা জায়েয নেই। কেননা, পুরুষের জন্যেই শুধু সিল্ক ব্যবহার নিষিদ্ধ। বায়হাকী বলেছেন, উসমান থেকে বর্ণিত আছে তিনি এটাকে অপচয় মনে করতেন।

ইমাম গাযালী এহইয়াউল উলুম বইতে লিখেছেন, কা'বার দেয়াল সাজানো নিষিদ্ধ নয়। সিল্ক শুধু পুরুষের জন্যে হারাম। কা'বার জন্যে সিল্ক ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে কা'বা সাজানো নিষিদ্ধ। অথচ কা'বা সাজানো উত্তম। আল্লাহ বলেছেনঃ 'বল আল্লাহর সৌন্দর্যকে কে হারাম করেছে? বিশেষ করে অহংকার ও গর্ব প্রকাশের জন্যে না হলে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশের বেলায় তা অবশ্যই জায়েয।

৩। কা'বায় খোশবু সুগন্ধি লাগানো

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, আমার নিকট কা'বা শরীফে সোনা-রূপা উপহার দেয়ার চেয়ে কা'বা শরীফে সুগন্ধি লাগানো অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তম। তিনি বলেছেন, তোমরা কা'বা ঘরে সুগন্ধি লাগাও, এটি কা'বাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার অন্তর্ভূক্ত। এই বলে তিনি কুরআনের একটি নির্দেশের দিকে ইঙ্গিত দেন। সেটি হচ্ছেঃ 'আমার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর'। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) কা'বা শরীফের ভিতরের সকল অংশে সুগন্ধি মেখেছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন যুগে কা'বার বাইরে, তওয়াফের ভেতর সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া দেয়ার প্রথা চালু আছে। ভেতরেও সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া দেয়া হত। এতে করে তওয়াফের লোকদের জন্যে বেশ ভালই হত। দেহ ও মনে খুশীর সঞ্চার হত।

৪। আল্লাহ কা'বা শরীফকে কুচক্রী ও ধ্বংসাত্মক লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং কা'বা ধ্বংসকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সূরা ফীলে, আবরাহা বাদশাহর হস্তীবাহিনীকে তিনি ধ্বংস করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও যারা কা'বা শরীফে খারাপ আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে চেয়েছে তাদের অনেক ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। 'উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যারা এই ঘরের ক্ষতি করতে চাইবে আল্লাহ তাদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে ধ্বংস করে দেবেন।'

www.pathagar.com

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমরা শুনে আসছিলাম যে, আসাফ ও নায়েলা জোরহুম গোত্রের দুইজন নারী ও পুরুষ ছিল। তারা কা'বায় অন্যায় কাজ করাতে আল্লাহ তাদেরকে দুটো পাথরে পরিণত করে দিয়েছেন। আরেক ঘটনা ঃ জাহেলিয়াতের যুগে একজন মেয়েলোক কা'বায় এসে স্বামীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে খারাপ নিয়তে হাত বাড়ালে তার হাত অবশ হয়ে যায়। আযযাওয়ী বলেছেন, সে ব্যক্তিটি ছিল হোয়াইতাব। আমি তাকে ইসলামী যুগেও অবশ দেখেছি। কেননা সে কা'বার সম্মান রক্ষা করেনি।

অন্য একটি ঘটনা হচ্ছে, এক ব্যক্তি কাবার তওয়াফ করছিল। তখন তওয়াফে এক সুন্দরী রমনীর খোলা হাত বিদ্যুতের মত চমকাতে দেখে তার হাতের উপর নিজের তাত রেখে যৌনাকর্ষণ উপভোগ করতে লাগলো। এতে দু'জনের হাত এমনভাবে লেগে গেল যে আর খোলা যাচ্ছিলনা। পরে ঐ দু'জন অন্য এক নেক্কার ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাদের হাত খোলার জন্যে দোয়ার অনুরোধ জানালো। তিনি দুজনকে তাদের হাত আটকে যাওয়ার ঘটনাটি জিজ্ঞেস করায় তারা তা খুলে বলল। তিনি দুজনকে উপদেশ দিলেন, তোমরা যে জায়গায় ঐ পাপ কাজটি করেছ সেই জায়গায় ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও অঙ্গীকার কর যে, তোমরা আর কখনও অনুরূপ কাজ করবে না। তারা ঐ রকম তওবা করার পর শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এমন যা বাদশাহ আবরাহার ঘটনার কাছাকাছি। সেটি হচ্ছে, ইয়েমেনের বাদশাহ্ তুব্বা'র ঘটনা। তার আসল নাম ছিল আসআদ। সে প্রাচ্যের কোন দেশে গিয়েছিল। মক্কা ও মদীনার পথে স্বদেশে রওনা হল। মদীনা থেকে বিরাট সেনাবাহিনী সহকারে মক্কার দিকে রওনা হলে পথে হোজাইল গোত্রের একটি দলের সাথে তার দেখা হয়। তারা তাকে মক্কার কাবা ধ্বংস করে এর পরিবর্তে ইয়েমেনে অনুরূপ একটি কাবা তৈরির জন্যে উৎসাহিত করে এবং বলে যে, এখন থেকে যদি ইয়েমেনে হজ্বের ব্যবস্থা করা হয়, এতে বাদশাহর আয় ও মর্যাদা বাড়বে এবং তার দেশ পূর্ণ আবাদ হবে। একথা শুনে, বাদশাহ রাজী হল এবং কাবা শরীফ ভাঙ্গার জন্যে প্রস্তুত হল। মক্কার দিকে রওনা হওয়ার জন্যে সওয়ারী পশুগুলোকে হাঁকানো হল। কিন্তু একটি পশুও চলে না। ঘোর অন্ধকার নেমে আসল এবং প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বাদশাহর দু'চোখ থেকে পানি বের হল এবং গালের উপর দিয়ে বইতে শুরু করল। তার মাথায় এমন এক বীভৎস রোগ শুরু হল যে, তা থেকে পঁচা ও দূর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হতে লাগল। দুর্গন্ধের কারণে তার কাছে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তার সাথে যে সকল পাদ্রী ও ডাক্তার ছিল, তাদের কাছে এই অকস্মাৎ মাথা ব্যাথা ও রোগের কারণ জানতে চান। তারা বাদশাহর রোগ ও বীভৎস দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মৃত গাধার পঁচা দুর্বিসহ দুর্গন্ধের মতই বাদশাহের মাথার পুঁজের দুর্গন্ধ বের হতে থাকল। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি বাইতুল্লাহর ব্যাপারে কোন খারাপ পরিকল্পনার চিন্তা করেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ তারপর সে তার পরিকল্পনা তাদের কাছে প্রকাশ করল এবং হোজাইল গোত্রের একদল লোকের পরামর্শ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করল। এসব শুনে তারা বলল, হোজাইল গোত্র আপনাকে, আপনার সোনাবাহিনীকে এবং আপনার সাথে আরো যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার

www.pathagar.com

পরামর্শ দিয়েছে। এটি হচ্ছে আল্লাহর ঘর। কেউ এই ঘরের ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেই ছাড়েন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, এখন উপায় কি? তারা জবাবে বলল, এখন আপনি এই ঘরের কল্যাণ কামনা করুন, এর সম্মান করুন, এতে গেলাফ পরান, এই ঘরের কাছে কোরবানী করুন এবং এই ঘরের অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। বাদশাহ তাই করল। ফলে অন্ধকার চলে গেল, ঝড় বন্ধ হয়ে গেল, সওয়ারী পশুগুলো চলা শুরু করল, চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল, তার মাথা সুস্থ হয়ে উঠল। বাদশাহ খারাপ নিয়ত থেকে তওবা করল এবং সেনাবাহিনীকে ইয়েমেনের দিকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। সে নিজে মক্কায় কিছুদিন থাকল এবং প্রত্যেক দিন একশত উট কোরবানী করে মক্কার বাসিন্দাদেরকে খাওয়াল। সে কাবা শরীফে গেলাফ পরাল। ইসলাম আসার সাতশত বছর আগে ঐ ঘটনা ঘটে।

আল্লাহ তাঁর ঘরকে যে কোন জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং একে সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত করেন। এজন্যে এই ঘরের অপর নাম হচ্ছে 'আতীক'। কেউ এই ঘর ধ্বংস করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ, কোরআন মজীদে বলেছেন, 'কেউ অন্যায়ভাবে এতে কুফরী করলে, আমরা তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।'

৫। যে ব্যাক্তি কাবা শরীফকে স্বপ্নে দেখবে, তার সেই স্বপ্ন সঠিক বলে তাবরানী তাঁর মোজাম কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা, শয়তান আমার এবং কাবার ছবি ধারন করতে পারে না।' অর্থাৎ শয়তান এ দুটো জিনিসের রূপ ধরতে পারে না। তাবরানী বলেছেন, আবদুর রাজ্জাক মুহাম্মদ বিন আবিস সেররী আল আসকালানী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এতে ছাড়া অন্য কোন বর্ণনায় কাবার রূপ ধারণ করতে পারে না' এই বক্তব্য আসেনি।

৬। কা'বা শরীফ একটি আবাদকৃত ঘর। মানুষ তওয়াফের মাধ্যমে সর্বদা একে আবাদ করে। মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন জাফর কিবলার দিকে মুখ করে বলতেন, 'আমার রবএর একটি মাত্র ঘর, কি সুন্দর, কি মনোরম! আল্লাহর 'শপথ, এটি আবাদকৃত ঘর।' কেউ কেউ বলেছেন, বাইতুল মামুর হচ্ছে সেই ঘর যা হযরত আদম (আঃ) প্রথমেই দুনিয়ায় এসে নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আঃ) এর প্লাবনের সময় সেই ঘরটিকে আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং দৈনিক ৭০ হাজার ফেরেশতা এর তওয়াফ করে।

আবুত তোফায়েল বলেন, হযরত আলীকে 'বাইতুল মামুর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, সেটাতো কাবা শরীফ বরাবর বহু দূরে অবস্থিত। এতে দৈনিক ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে এবং তারা এতে কিয়ামত পর্যন্ত ২য় বার আর প্রবেশ করবে না।

বাইতুল মামুর কোন আসমানে অবস্থিত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, প্রথম আসমানে, কারুর মতে ৪র্থ আসমানে, কারুর মতে ৬ষ্ঠ আসমানে কারুর মতে ৭ম আসমানে এবং কেউ কেউ অন্যমত পোষণ করেন।

www.pathagar.com

আবু নায়ীম আল-হাফেজ বুখারী শরীফের বাছাইকৃত হাদীস সংকলনে উল্লেখ করেছেন যে, আমর বিন হামদান হাসান বিন সুফিয়ান থেকে, তিনি হাদবাহ থেকে তিনি হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিনি বাইতুল মামুরে ৭০ হাজার ফেরেশতাকে প্রবেশ করতে দেখেছেন এবং তাঁরা এতে আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না।' এইভাবে প্রত্যেক দিন ৭০ হাজার ফেরেশতা এইঘরে আসে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর কত অগণিত ও সীমাসংখ্যাহীন ফেরেশতাকুল রয়েছে।

৭। ইবনে হিশাম তাঁর সিরাতুন্নবী বইতে লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) এর সময়ের বন্যার পানিতে কা'বা শরীফের আশে-পাশে পানিতে ডুবে গেলে কা'বা শরীফ আসমানের নীচে বাতাসের শূন্য রাজ্যে বিরাজ করতে থাকে। তখন হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকা কা'বা শরীফের চার দিকে তওয়াফ করতে থাকে। নূহ (আঃ) নৌকার যাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা আল্লাহর হারামে এবং আল্লাহর ঘরের পাশে আছ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্যে এহরাম কর এবং কেউ যেন কোন মেয়েলোক স্পর্শ না করে। তিনি পুরুষ ও মেয়েলোকদের মাঝখানে পর্দা করে দিলেন। যেন, মেয়েলোকেরা একপাশে এবং পুরুষরা অন্য পাশে থাকতে পারে। কিন্তু বনুহাম গোত্র সীমালংঘন করে। এতে নূহ (আঃ) তাদের শরীরের রং কাল করার জন্যে বদদোয়া করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, হাম গোত্রের বিরুদ্ধে নূহ (আঃ) এর বদ দোয়ার কারণ অন্য কিছু।

৮। হাশরের দিন কা'বা শরীফকে বিবাহিতা সুসজ্জিতা কনের মত উঠানো হবে। যে হজ্ব করেছে সে এর গেলাফ ধরে থাকবে যে পর্যন্ত না কা'বা শরীফ তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ইমাম গাযযালী এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এই হাদীসটিকে 'বাইতুল্লাহ ও মক্কার ফজীলত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা 'আসরারুল হজ্ব' নামক বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির ভাষা হচ্ছে এইরূপ ঃ 'আল্লাহ এই ঘরের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, প্রতিবছর ৬ লাখ লোক এই ঘরের হজ্ব করবে। যদি এই সংখ্যা থেকে লোক কম হয় তাহলে, আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা তা পূরণ করে দেবেন। হাশরের দিন কা'বা শরীফকে বিবাহিতা সুসজ্জিতা কনের মত উঠানো হবে। যত লোক হজ্ব করেছে তারা এর গেলাফ ধরে থাকবে এবং এর চার পাশে চলতে থাকবে যে পর্যন্ত না কা'বা শরীফ বেহেশতে প্রবেশ করে। তখন তারাও সবাই একই সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

৯। এই ঘর সৃষ্টির পর থেকে এযাবত এর তওয়াফ এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ নেই। মানুষ, জ্বিন কিংবা ফেরেশতাদের কেউনা কেউ এর তওয়াফ করেই যাচ্ছে।

তওয়াফের দৃশ্য মনোহর, কিন্তু পেছনে রয়েছে খুন ঝরা ইতিহাস

তওয়াফকারীগণ নিশ্চিন্তমনে তওয়াফ করে চলেছেন। সবার চোখে মুখে পবিত্রতার ছাপ; কোন শংকা নেই, কোন ভীতি নেই, হিংসা বিদ্বেষ নেই, সবাই একমনে এক ধ্যানে তসবিহ্-তাহলীল, দোয়া-দরূদ পড়ে চলেছেন। সবার একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য; মালিক-মনিবকে রাজী খুশী করে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করা। প্রশান্তির এ

www.pathagar.com

পরিবেশ কি অপূর্ব! কি মনোহর! এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ দুনিয়ার কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

কিন্তু সকল হাজী ও তীর্থযাত্রী কি ভেবে দেখেছেন যে, আজকের এ সুন্দর-মনোহর পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে কত মোমেন-মুসলিমের তাজা খুনে রঞ্জিত হয়েছে এই কাবা চত্তর, মাতাফ এবং এর আশ-পাশ? নওমুসলিমদের উপর কাফের মুশরিকরা এ পবিত্র অঙ্গনে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মজলুম মুসলিমের আহাজারী ও আর্তচিৎকারে এখানকার আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। চৌদ্দশ বছর পূর্বেকার সেই লোম-হর্ষক কাহিনী শুনলে সত্যিকার মানবদরদীর আজও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। তাঁদের অপরাধ(?) ছিল এই যে, তাঁরা বলেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও একক এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ)।'

মানসপটে ভেসে উঠেছে নওমুসলিমদের প্রতি আবু জেহেল, ওতবা, শায়েবা, উমাইয়ার ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম আচরণ। মজলুম মুসলিমের করুণ আর্তনাদে সমস্ত সৃষ্টি শিউরে উঠেছিল; কিন্তু অত্যাচারীর হৃদয় একটুও টলেনি। আল্লাহ ও রসূলের (সঃ) উপর ঈমান আনলে তাঁর আর রক্ষা নেই।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় যখন উপরে মরু আকাশের প্রচন্ড সূর্য অগ্নি গোলকের মত জ্বলতে থাকত আর তার তীব্র দাহনে মরুভূমির বালুকণা জ্বলন্ত অংগারের মত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠত, ঠিক সেই সময় দরিদ্র মুসলমানগনকে ধরে তারা মরুভূমির মধ্যে চিৎ করে শোয়ায়ে রাখত। যাতে তাঁরা পার্শ্ব পরিবর্তন করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তারা মুসলমানদের বক্ষে গুরুভার পাথর চাপা দিয়ে রাখত। তাঁদের দেহে তপ্ত বালুকা ছড়ায়ে দিত এবং লোহা উত্তপ্ত করে শরীরে চেপে ধরত।

মুসলিম জাহানের সর্ব প্রথম মুয়াজ্জিন হাবশী বেলাল ছিলেন দুরাত্মা উমাইয়া বিন খলফের গোলাম। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই উমাইয়া তাঁর উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে দিল। সেই দুরাত্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কার ইবাদত করছ?" হযরত বেলাল (রাঃ) বললেন, "মুহাম্মদের আল্লাহ্‌র"। সেই মালাউন বলল, "তাঁর দ্বীন ত্যাগ কর, নতুবা কঠিন শাস্তি দিয়ে তোমাকে হালাক করব।" তিনি বললেন, "তা করতে কখনও রাজী নই। আমি তোমার অধীন, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার!"

তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হল। সেই মালাউন পূর্বাহ্নে তাঁকে উলংগ করে বাবুল কাটা দ্বারা দেহ ক্ষত বিক্ষত করত। কাঁটা তাঁর হাড় পর্যন্ত বিদ্ধ হত। ঠিক দ্বিপ্রহর বেলায় তাঁকে জ্বলন্ত বালুকারাশির উপর শোয়ায়ে বুকের ওপর গুরুভার পাথর চাপা দিয়ে রাখত যেন নড়াচড়া করতে না পারেন। এ অবস্থায় অনেকে তাঁকে বলত 'ইসলাম ত্যাগ কর নতুবা মারা পড়বে।" হযরত বেলাল (রাঃ) এর মুখ হতে শুধু বের হত ঃ আহাদ! আহাদ! আমার আল্লাহ এক, লা-শারীক! আমার আল্লাহ এক, লা-শারীক। হযরত বেলাল (রাঃ) এর মনিব যখন দেখতে পেত যে, এইরূপ কষ্টের ভিতরও তিনি অটল, তখন তারা তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে ছেলেদের হাতে দিত এবং ছেলেরা তাঁকে শহরের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেত। তখনও হযরত বেলাল (রাঃ) এর মুখ হতে বের হতে থাকত ঃ আহাদ! আহাদ!!

www.pathagar.com

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে তাঁকে শৃংখলাবদ্ধ করে অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হত। উমাইয়ার আদেশ অনুযায়ী তার গোলাম দল অতি নির্দয়ভবে তাঁকে চাবুক দ্বারা প্রহার করত। সারারাত এই চাবুকের শব্দ দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলত - আর হযরত বেলাল (রাঃ) করুণ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে থাকতেন ঃ আহাদ! আহাদ!!

একদিন সন্ধ্যায় হযরত আবুবকর (রাঃ) উমাইয়ার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ হযরত বেলাল (রাঃ) এর মর্মন্তুদ আওয়াজ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে। লোকের নিকট জিজ্ঞেস করে তিনি হযরত বেলাল (রাঃ) এর হৃদয়বিদারক কাহিনী অবগত হলেন। পরদিন প্রভাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই নররূপী শয়তান উমাইয়ার গৃহে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর এবং এই গোলামটির উপর অন্যায় অত্যাচার করো না। সে দীনেবরহক হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। তাঁকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করা তোমার কর্তব্য। শাস্তি দানের পরিবর্তে তার প্রতি সদয় হও, আখিরাতে তোমার মঙ্গল হবে।" সেই পাপাত্মা বলল, "যদি আখিরাত থেকেই থাকে, তবে সেই কাল্পনিক লোভ-লালসায় প্রলুব্ধ হয়ে লাভ কি? দুনিয়াতে আমার কোন জিনিস কম আছে? ধন দৌলতের বেহেশত আমার কাছে রয়েছে। তুমি জান এমন কোন জিনিস নেই যা আমার ভান্ডারে নেই।" হযরত আবু বকর (রাঃ) আবার তাকে নসীহত করলেন। তদুত্তরে সে বলল, 'তার জন্যে যদি হৃদয় একান্তই জ্বলতে থাকে, তবে তোমার আখিরাতের জন্যে তাকে ক্রয় কর না কেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "তাই আমার একান্ত ইচ্ছা। তুমি যে মূল্য চাও তা দিয়েই আমি বেলালকে খরিদ করতে প্রস্তুত।" সে বলল "তুমি খরিদ করতে সক্ষম হবে না। যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে, তোমার গোলাম নাসতাস রুমীর পরিবর্তে বেলালকে নিতে পার।" নাসতাস রুমী অতিশয় বিশ্বাসী ও ব্যবসায়ে দক্ষ ছিল। তাঁর মূল্য দুই সহস্র দীনারের সমান। হযরত আবু বকর (রাঃ) অতি আগ্রহের সাথে নাসতাস রুমীর বিনিময়ে হযরত বেলাল (রাঃ) কে ক্রয় করে নিলেন। তা ছাড়া তিনি তাকে চল্লিশ উকীয়া যবও পাঠিয়ে দিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) কে মুক্ত করে নিয়ে চললে উমাইয়া পৈশাচিকভাবে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "এই লোকটি কী নির্বোধ। সে কতই না ক্ষতিগ্রস্ত হল! যদি কেহ বেলালকে এক সঠাংশ দিরহামে বিক্রয় করত, তবুও আমি তাকে খরিদ করতাম না, আর এই নির্বোধ দুই সহস্র দীনার মূল্যের একটি দক্ষ ও বিচক্ষণ গোলামের বিনিময়ে অকর্মণ্য বেলালকে নিয়ে গেল।" হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনে বললেন, "আমার দৃষ্টিতে বেলাল অতি মহান। নাসতাস রুমীর বিনিময়ে কেন, একটি সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমি তাঁকে খরিদ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না।"

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সম্মুখে হাজির করে বললেন "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! একে খরিদ করেছি।" অতঃপর তিনি তাঁর নিকট আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, "আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আল্লাহ্‌র নামে তাঁকে আজাদ করে দিচ্ছি।" এতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন। সেইদিন হতে হযরত বেলাল (রাঃ) আজাদী লাভ করলেন এবং নিজেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর খেদমতে বিলিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

হিজরাতের আগে হযরত আবু বকর হযরত বিলালসহ মোট সাতজন নওমুসলিম গোলামকে স্বাধীন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আমের ইবনে ফুহাইরা, উম্মে উবাইস এবং যিননীরা। যিননীরাকে মুক্ত করার সময় তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোরাইশরা তা দেখে বললো, "ওর চোখ নষ্ট হয়েছে লাত ও উযযার অভিশাপেই।" যিননীরা বললেন, "আল্লাহর ঘরের শপথ, ওরা মিথ্যা বলছে। লাত ও উযযা কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারেনা।" পরে আল্লাহ তাঁর চোখ ভালো করে দিয়েছিলেন।

বনী আবদুদ দারের এক মহিলার বাঁদী নাহদিয়া ও তাঁর মেয়েকেও আবুবকর মুক্ত করেন। তাঁদের মনিব যখন তাঁদেরকে কিছু আটা দিয়ে কোথাও পাঠাচ্ছিল এবং বলছিল, "আল্লাহর শপথ, তোদের আমি কখনো মুক্ত করবোনা", তখন আবু বকর সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কথাটা শোনামাত্রই বললেন, "হে অমুকের মা, তুমি শপথ ভংগ কর।" সে বললো, "কী বলছো! শপথ ভংগ করবো? তুমিই তো ওদেরকে খারাপ করেছো। এখন তুমিই মুক্ত কর।" আবু বকর বললেন, "আমি ওদেরকে নিয়ে নিলাম! ওরা মুক্ত ও স্বাধীন।" মেয়ে দুটিকে বললেন, "তোমরা মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও।" মেয়েদ্বয় বললো, "হে আবু বকর, আগে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেব এবং পরে আটা ফিরিয়ে দেব কি?" আবু বকর বললেন, "সে তোমাদের ইচ্ছা।"

আর একবার তিনি বনী মুয়াম্মালের একজন নও মুসলিম বাঁদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে ইসলাম ত্যাগের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। ওমর তখনো মুশরিক। তিনি মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন তাকে বললেন, "তোর কাছে আমি ওজর জানাচ্ছি যে, শুধু ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই তোকে আর মারতে পারলাম না।" মেয়েটি বলল, "আল্লাহ তোমার সাথে যেন এরূপ আচরণই করেন।" এই দৃশ্য দেখে আবু বকর তৎক্ষনাৎ বাদীটিকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

আবুবকরের (রাঃ) পিতা আবু কুহাফা একদিন তাঁকে বললেন, "বেটা, আমি দেখছি তুমি শুধু দূর্বল দাস দাসীদেরকে মুক্ত করছো। যদি তুমি শক্তিশালী জোয়ান পুরুষ দাসদের মুক্ত করতে তাহলে প্রয়োজনের সময় তারা তোমার পক্ষে দৃঢ়বাবে দাঁড়াতে পারতো।" একথা শুনে আবু বকর বললেন, "হে পিতা, আমি যা করছি তা একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করছি।"

পাপিষ্ট আবু জাহল যখনই শুনতো যে অমুক ইসলাম গ্রহণ করেছে, অমনি তার বিরুদ্ধে কোরাইশদের উস্কিয়ে দিত। ইসলাম গ্রহণকারী যদি ভালো পদমর্যাদাধারী ব্যক্তি হতো তাহলেও তাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতো এবং বলতো, "তুমি তোমার বাপের ধর্ম ত্যাগ করেছ। অথচ তোমার বাপ তোমার চেয়েও উত্তম। কাজেই আমরা তোমাকে বেকুফ প্রতিপন্ন করবো, তোমার মতামত যে খারাপ ও ভুল, তা আমরা প্রমাণ করে ছাড়বো, তোমার মান-সম্মান ভূ-লুণ্ঠিত করে তবে ক্ষান্ত হবো।" আর যদি তিনি ব্যবসায়ী হতেন তবে তাঁকে বলতো, "আমরা তোমার ব্যবসায়ের সর্বনাশ ঘটাবো এবং তোমার মালপত্র নষ্ট করে দেবো।" আর যদি দুর্বল কেউ হতো তাহলে মারপিট করতো ও তার বিরুদ্ধে লোকজনকে লেলিয়ে দিত।

www.pathagar.com

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাহাবাদের উপর কি এতদূর অত্যাচার চালাতো যার ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করলেও তাদের উপর দোষারোপ করা চলতো না?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ। তারা তাঁদেরকে প্রহার করত এবং অনাহার ও পিপাসায় কষ্ট দিত। তাঁদের এক একজন এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে এতদূর হীনবল হয়ে পড়তেন যে, সোজা হয়ে বসে থাকতেও পারতেন না। এহেন নির্যাতন চালানোর পর তারা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতো, 'স্বীকার কর আল্লাহ ছাড়া লাত-উয্যাও তোমার মাবুদ?' কেউ কেউ বলতো, 'হ্যাঁ।' এমনকি একটা তুচ্ছ পোকামাকড়কে দেখিয়ে বলতো, 'আল্লাহ ছাড়া একেও মাবুদ বলে মান তো?' কেউ কেউ অসহ্য নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অনন্যোপায় হয়ে বলতো, 'হ্যাঁ।'

হযরত খাব্বাব (রাঃ) উম্মে আম্মার গোলাম ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ছয় জনের পরেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। কুরাইশগণ তাঁর উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালাত। একদিন মাটিতে জ্বলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে তারা হযরত খাববাব (রাঃ) কে জোর করে সেই অগ্নি-শয্যার উপর শোয়ায়ে দিল এবং একটি লোক পা দিয়া তাঁর বুক চেপে ধরল। যতক্ষণ আগুন জ্বলেছিল, ততক্ষণ সেই লোকটি পা দিয়ে চেপে রেখেছিল। এভাবে তাঁর পিঠের নীচে জ্বলন্ত অংগার জ্বলে জ্বলে নিভে গেল।

বহুদিন পর হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। কথা শেষ হলে তিনি হযরত খাববাব (রাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ খুলে দেখালেন। দেখা গেল যে, তাঁর পৃষ্ঠদেশ শ্বেত দাগে পরিপূর্ণ। তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। লোকের নিকট তাঁর অনেক পাওনা ছিল। তিনি তা চাইলে তারা বলত, "মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে একটি কড়িও পাবে না।" তিনি বলতেন, "যদি তোমরা একবার মরেও জীবিত হও, তবুও তা করব না।"

হযরত আম্মার (রাঃ) ছিলেন ইয়েমেন দেশের বাসিন্দা। তাঁর পিতা ইয়াসের মক্কায় আসেন। তিনি আবু হোজায়ফার সুমাইয়া নাম্মী দাসীকে বিবাহ করেন। হযরত আম্মার (রাঃ) প্রাথমিক মুসলমানগণের মধ্যে চতুর্থ। কুরাইশগণ তাঁকে ও তাঁর মাতা পিতাকে উত্তপ্ত বালুকাতে শোয়ায়ে রাখত এবং এই প্রকার নির্মমভাবে প্রহার করত যে, তাঁরা বেহুশ হয়ে পড়তেন। এইরূপ অত্যাচার যখন চলতে থাকত, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের নিকট দিয়ে যেতেন ও বলতেন, "ইয়াসের বংশ! সবর কর। তোমাদের জন্যে বেহেশ্‌ত।" তাঁর মাতাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর সময়ে তিনি ইসলাম ব্যতীত সব কিছুই অস্বীকার করছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আবু জেহেল হযরত সুমাইয়া (রাঃ)-কে বর্শা দিয়ে এমন আঘাত করেছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহীদ। কাফিরগণের হস্তে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে করতে হযরত ইয়াসের (রাঃ)-ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত সোহাইব (রাঃ) এর জন্ম হয় মাসেলে; কিন্তু প্রতিপালিত হন রোমদেশে। তাঁর পিতা একটি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কোন কারণে একদা তিনি বন্দী হন ও গোলামরূপে বিক্রিত হন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন,

www.pathagar.com

তখন তিনি এবং আম্মার (রাঃ) উভয়েই তাঁর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরাইশগণ তাঁকে এমনভাবে নির্যাতন করত যে, তাঁর শরীরের প্রত্যংগগুলো অকর্মন্য হয়ে পড়েছিল। তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করতে চাইলে, তাঁর সমস্ত মাল আসবাবপত্র ছেড়ে যেতে বলে। তিনি সানন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হন।

হযরত আবু ফুকাইহা (রাঃ) সাফওয়ান-বিন-উমাইয়ার গোলাম ছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) এর সংগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। উমাইয়া যখন এ সংবাদ অবগত হল, তখন তাঁর পায়ে রশি বেঁধে দুজন লোকের হাতে এই বলে ছেড়ে দিল, যেন তারা তাঁকে মাটির উপর দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় এবং উত্তপ্ত জমিনে শোয়ায়ে রাখে। একটি গোবরে পোকাকে রাস্তায় চলতে দেখে উমাইয়া বলল, "এ কি তোর আল্লাহ্ নয়?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমাদের এবং আমার আল্লাহ্ আল্লাহ্তায়ালা।" এ কথা শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং এত জোরে তাঁর গলা টিপে ধরল যে, উপস্থিত জনতা ভাবতে লাগল বোধ হয় তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। একদা তারা তাঁর বুকের উপর গুরুভার পাথর চাপিয়ে দিল। সেই বিশাল প্রস্তর-পেষণে তাঁর জিহ্বা বহির্গত হয়ে পড়ল।

হযরত উসমান ঐ সময় একজন বিশিষ্ট লোক বলে পরিচিত ছিলেন। বয়সে প্রবীণ এবং সর্বজনমান্য লোক বলে সকলেই তাঁকে তাজীম করত। যখন তিনি মুসলমান হলেন, সকলের তাজীম কর্পূরের মত উড়ে গেল। শুধু বাইরের লোক নয়, তাঁর আপন চাচাও তাঁকে রশিতে বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করেছিল।

হযরত আবুযর (রাঃ) সপ্তম মুসলমান বলে বর্ণিত। কা'বা শরীফে এসে যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ঘোষণা করলেন, তখন কুরাইশগণ তাঁকে প্রহার করতে করতে মাটিতে ফেলে দিল।

হযরত যুবাইর-বিন-যায়েদ আওয়াম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর চাচা তাঁকে চাটাইয়ের মধ্যে গুটে নাকে ধোঁয়া দিতে লাগল। হযরত সাঈদ-বিন-যায়েদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত ওমর তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য মুসলমানগণের ঈমান! এত অমানুষিক অত্যাচার, অসহ্য ব্যবহার ও রক্তপাত একটি মুসলমানকেও সত্য পথ হতে বিচ্যুত করতে পারেনি। সকল সংকটের মধ্যে তাঁদের বিশ্বাস পর্বতের মত স্থির হয়ে রইল। বিভীষিকার অসংখ্য বজ্র তাঁদের মস্তকে উদ্যত হল, তাঁরা বিন্দুমাত্র প্রাণের মমতা করলেন না। সকল শংকা অতিক্রম করে তাঁদের ভক্তি বিশ্বাসের অতুলনীয় দীপ্তি সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত করল। এই প্রকারের অমানুষিক অত্যাচার ও নিদারুণ নির্যাতনের ফলেই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

মুসলমানগণ ইসলামের জন্যে কুরবান হতে এবং সর্বপ্রকার কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে পারতেন; কিন্তু মক্কায় থেকে ইসলামের কর্তব্যগুলো স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে পারতেন না। নবুওতের পঞ্চম বৎসর পর্যন্ত জোর গলায় কেহ হেরেম শরীফে কোরআন পাঠ করতে পারেননি। হযরত আব্দুল্লাহ-বিন-মাসউদ (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তিনি বললেন, "আমি এ কর্তব্য অবশ্যই সমাপন করব।" উপস্থিত সাহাবাগণ তাঁকে নিষেধ করে বললেন, "কোরাইশগণ তোমার উপর অত্যাচার করতে পারে।

www.pathagar.com

আমাদের ইচ্ছা যে, এই কাজ করতে এমন কেউ অগ্রসর হয় যাঁকে তাঁর আত্মীয় স্বজন কোরাইশগণের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে পারে। তোমার পক্ষে এরূপ কাজে অগ্রসর হওয়া শোভা পায় না।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করবেন।" পরদিন সকালে তিনি হারাম শরীফে গমন করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে জোর গলায় সূরা আর রাহমান পড়তে লাগলেন। তৎশ্রবণে কাফিরগণ চতুর্দিক হতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁর মুখমন্ডলে নিদারুণভাবে প্রহার করতে লাগল। তিনি প্রহার উপেক্ষা করে যতটুকু পড়বার ছিল, পড়লেন বটে, কিন্তু মুখমন্ডলে বহু যখমের চিহ্ন নিয়ে আপন সহচরগণের নিকট ফিরলেন। তিনি বলতে লাগলেন, "শত্রুগণের নিকট হতে এরূপ সহজ ব্যবহার প্রত্যাশাই করিনি। আপনারা যদি বলেন তবে আগামী কালও আমি তদ্রুপ করতে পারি।" তাঁরা বললেন, "না, তোমার পক্ষে এরূপ করা আর ভাল দেখায় না। তাদের যা অপ্রিয়, তা তুমি শুনিয়ে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছ। এটাই যথেষ্ট।"

কোরাইশদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) একজন অতি সম্ভ্রান্ত রইস ছিলেন; কিন্তু তিনিও জোর গলায় কোরআন পাঠ করতে পারতেন না। এ জন্যে তিনি একবার হিজরতও করতে চেয়েছিলেন।

কাফের মুশরীকের নিষ্ঠুরতম উৎপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মানবতার মহান মুক্তিদূত, সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমতাল্লিল আলামীন দয়াল নবীও রেহাই পেতেন না। আবু তালিব ও হযরত খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যু হলে কোরাইশদের সম্মুখে আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না, তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে নির্যাতন করতে লাগল। একদা একটি পথ অতিক্রম করার সময় তারা তাঁর মস্তকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করল। ঐ অবস্থায় যখন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করলেন, তখন তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) পবিত্র মস্তক ধুয়ে দিতে লাগলেন। মহান পিতাকে উৎপীড়িত হতে দেখে তাঁর সমগ্র অন্তর বেদনাতুর হয়ে পড়ল। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, "ফাতিমা তুমি কেঁদো না, আল্লাহ্ তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন।" জালেমরা ভেবেছিল যে, নির্যাতনের মাত্রা চড়ালে মুহাম্মদ (সঃ) ইসলাম প্রচারে বিরত হবেন। তারা তাঁর পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত, নামায পড়বার সময় হাসি ঠাট্টা করত, সেজদা করলে উটের নাড়ীভূড়ি তাঁর উপরে নিক্ষেপ করত, গলায় চাদর জড়িয়ে এত জোরে টানত যে, তাঁর গলায় দাগ পড়ে যেত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর রূহানী শক্তি দেখলে তাঁকে যাদুকর বলত, তাঁর নবুওয়্যাতের দাবী শুনে পাগল আখ্যা দিত, ঘর হতে বের হলে দুষ্ট ছেলেরা তাঁর পিছনে লাগত, উচ্চ কণ্ঠে কোরআন শরীফ পাঠ করলে কোরআন শরীফ আনয়নকারী রসূল এবং কোরআন শরীফ নাযিলকারী আল্লাহ্তায়ালাকে গালি দিত, কোরআন শরীফ পাঠকালে তারা সজোরে শীষ ও হাততালি দিত এবং বলত "কেউই তাঁর কোরআন পাঠ শুনবে না এবং খুব গন্ডগোল কর।"

একদা তিনি হেরেমের মধ্যে নামায পড়ছিলেন, তখন কোরাইশদের অনেক সর্দার সে স্থানে উপস্থিত ছিল। আবু জেহেল বলে উঠল, "তোমাদের মধ্যে কে উটের নাপাক নাড়ীভূড়ি সেজদার সময় মুহাম্মদের কণ্ঠে নিক্ষেপ করতে পারে?" ওত্বা তখন দাড়িয়ে

www.pathagar.com

বলল. "আমিই এই কাজের ভার নিলাম।" এই বলে সে একটি পঁচা দুর্গন্ধময় নাড়ীভুড়ি এনে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র কণ্ঠে ঢেলে দিল। সমবেত কুরাইশগণ পৈশাচিক আনন্দে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়তে লাগল। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পাঁচ বৎসরের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) সংবাদ শুনে সেখানে এসে দুর্গন্ধযুক্ত নাড়ীভুড়ি দূরে ফেলে দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কোন মজলিসে ইসলামের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেই আবু লাহাব বলত, "এসব মিথ্যা কথা।"

জনৈক সাহাবী বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদিন এক বাজারে ছিলাম, সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) জনতার ভিড়ের মধ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবার জন্যে সকলকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আবু জেহেল তখন তাঁর উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করছিল আর বলছিলঃ "খবরদার! তোমরা তার ধোকায় পড়ো না, সে চায় যে, তোমরা লাত ও ওজ্জার পূজা ছেড়ে দাও।"

শত্রুগণ কত প্রকারে এবং কত ভাবে যে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে অত্যাচারে জর্জরিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। খায়র ও বরকতের পূর্ণ ভান্ডার বিতরণ করবার জন্যে, জ্বিন ও ইনসানের মঙ্গল মুক্তির পথ দেখাবার জন্যে যিনি এ দুনিয়াতে পদার্পণ করলেন, তাঁর উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কথা ভাবতে গেলেও মনপ্রাণ শিউরে উঠে। স্বভাবতই মনে জাগে কেন এই অগ্নি পরীক্ষা?

বস্তুত দায়িত্বের গুরুভার যার উপরে যত বেশী, তাঁর জন্যে পরীক্ষাও তত কঠিন। হযরত নূহ্ আলাইহিস্‌সালাম লোকজনের বিরুদ্ধতায় অধীর হয়ে তুফানের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করলেন-যার ফলে দুনিয়ার একটি বৃহৎ অংশ ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামও ত্রিশ চল্লিশ জনের এক জামাত কায়েম করে দুনিয়া ছেড়ে আসমানে চলে গেলেন; কিন্তু নিখিল জগতের প্রাণ পেয়ারা রসূল-আমাদের রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাঁর দায়িত্ব যেমন অসীম, তাঁর পরীক্ষাও তেমনি কঠিন। আসমান থেকে প্রত্যেকটি মুসীবত তাঁর উপর নাযিল হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মুসীবতের সম্মুখেই তাঁকে অকুণ্ঠ চিত্তে দাঁড়াতে হয়েছে।

কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন হযরত খাব্বাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বদ দোয়ার জন্যে অনুরোধ করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমাদের পূর্বে আরও অনেক লোক দুনিয়া থেকে গুজরিয়ে গেছেন যাঁদের মস্তকে করাত চালান হয়েছিল, যাঁদের চিরে ফেলা হয়েছিল, তথাপি তাঁরা তাঁদের কর্তব্য হতে বিরত হননি। সময় অতি নিকটে (যখন) তোমরা দেখতে পাবে যে, সান্‌য়া থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত উটের পিঠে সওয়ার (হয়ে) লোকজন নির্ভয়ে চলে যাবে অথচ আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কোন ভয়ই তাদের থাকবে না।"

রসূলে পাকের (সঃ) প্রতি নিষ্ঠুরতম নির্যাতন, নিপীড়ন, গাল-মন্দ, কুৎসারটনা, ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাশাপাশি তাঁর আন্দোলন প্রতিরোধে, আবু জাহেল, ওতবা. শাইবা, আবু সুফিয়ান, নাদার প্রমুখ কোরাইশ সরদাররা নানা ধরনের ফন্দি ফিকির ও কূটজালের আশ্রয় নিয়েছিল।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট কোরাইশ সরদার উতবা-ইবনে রাবীআ একদিন কোরাইশদের দরবারে বসে ছিলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মসজিদে হারামে একাকী বসেছিলেন। উতবা বললো, "হে কোরাইশগণ, আমি মুহাম্মাদের কাছে যেয়ে কিছু কথা বলবো। তার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখবো। হয়তো সে কিছু না কিছু প্রস্তাব মেনে নেবে এবং তার প্রচার বন্ধ করবে। তোমরা এটা কেমন মনে কর?"

এ সময় হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে। তাই সকলে বললো, "খুব ভালো প্রস্তাব। আপনি যান এবং কথা বলুন।"

উতবা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে গেল এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলো। সে বললো, "ভাতিজা, তুমি আমাদের গোত্রের মধ্যে কতখানি সম্ভ্রান্ত ও বংশমর্যাদা সম্পন্ন তা তোমার অজানা নয়। তুমি একটা মারাত্মক ব্যাপার নিয়ে তোমার জাতির কাছে আবির্ভূত হয়েছ। তোমার এ দাওয়াত জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তুমি তাদেরকে বেকুফ ঠাওরিয়েছ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের হেয় প্রতিপন্ন করেছ। আমার কথা শোনো। তোমার কাছে কয়েকটা বিকল্প প্রস্তাব রাখছি। একটু ভেবে দেখো এর কিছু কিছু মেনে নিতে পার কিনা।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "বেশ, বলুন। আমি শুনি।"

উতবা বললো, "ভাতিজা, তুমি যে নতুন দাওয়াত দিতে শুরু করেছ, এর দ্বারা যদি বিপুল সম্পদ লাভ করা তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে আমাদের ভিতর সবচেয়ে বিত্তশালী বানিয়ে দেবো। আর যদি তুমি পদমর্যাদা লাভ করতে চাও তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের সবার নেতা হিসেবেও স্বীকার করে নেব। তোমাকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবো না। আর যদি তুমি রাজত্ব চাও তাহলে আমরা তোমাকে এ দেশের রাজা বানিয়ে দেবো। আর যদি এমন হয়ে থাক যে, তোমার কাছে জ্বিন আসে, তাকে তুমি হটাতে পারছনা, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসা করবো। যত টাকা লাগুক তোমাকে সুস্থ করে তুলবো। কেননা অনেক সময় জ্বিন মানুষের উপর পরাক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাকে তাড়ানোর জন্যে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।"

এই পর্যন্ত বলে উতবা থামলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) মনোযোগ সহকারে উতবার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তাহলে আমার কিছু কথা শুনুন। "উতবা বললো, "বল"। রসূলুলাহ (সঃ) সূরা হা-মীম আস-সাজদা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হা-মীম! এটা পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত কিতাব কোরআন। এ আয়াতগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, জ্ঞানী লোকদের জন্যে। সুসংবাদ বাহী ও সতর্ককারী হিসেবে তা এসেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনতে চায়না। তারা বলে, তুমি যে বিষয়ের দিকে আমাদের আহ্বান করছো আমাদের মন তা থেকে পর্দার আড়ালে রয়েছে।"

উতবা স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো। সে পেছনের দিকে হাতে ভর দিয়ে বসে খুবই মনোযোগের সাথে তা শুনছিলো। রসূলুলাহ (সঃ) তিলাওয়াত করতে করতে ঐ সূরার সিজদার আয়াতে গিয়ে থামলেন এবং সিজদা করলেন। এরপর বললেন, "যা শুনবার তা তো শুনলেন। এখন যা করণীয় মনে করেন করুন।"

www.pathagar.com

অতঃপর উতবা উঠে তার সঙ্গীসাথীদের কাছে ফিরে গেলো। সাথীরা তাকে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "উতবা একরকম চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন ভিন্ন রকম চেহারা নিয়ে ফিরে আসছে।" দলবলের মধ্যে গিয়ে বসতেই সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলো, "হে আবুল ওয়ালীদ, আপনার কথা কী?"

উতবা বললো, "আমি এমন বাণী শুনেছি যা আর কখনো শুনিনি। হে কুরাইশগণ, সত্যিই তা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, কোন জ্যোতিষীর কথাও নয়। তোমরা আমার কথা শোনো এবং এই ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। এই লোকটা যা করতে চায় করতে দাও। তার সাথে কোন সংশ্রব রেখোনা। আমি নিশ্চিত যে, মুহাম্মাদ যে কথা প্রচারে নিয়োজিত, তা ভবিষ্যতে বিরাট আলোড়ন তুলবে। আরবরা যদি তার বিপর্যয় ঘটায় তাহলে তোমরা অন্যের সাহায্যে তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলে। আর যদি সে আরবদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার মর্যাদা তোমাদেরই মর্যাদার কারণ হবে। তার কারণে তোমরা হবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান জনগোষ্ঠী।" একথায় সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, "মুহাম্মাদ এবার তোমাকে যাদু করেছে।" উতবা বললো. "এটা আমার অভিমত। এখন তোমরা যা ভাল বুঝ কর।"

একদিন সূর্যাস্তের পর প্রত্যেক গোত্র থেকে কুরাইশ সরদারগণ কা'বা শরীফের নিকট জমায়েত হলো। যারা জমায়েত হলো তারা হচ্ছে উতবা ইবনে রাবীয়া, শাইবা ইবনে রাবীয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, নাদার ইবনে হারেস, আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, যামআ ইবনে আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহল ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাহই ইবনে হুজ্জাজ, মুনাববিহ ইবনে হুজ্জাজ এবং উমাইয়া ইবনে খালফ। তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো, "মুহাম্মাদকে ডেকে পাঠাও, তার সাথে কথা বল, প্রয়োজনে ঝগড়াও কর। তাহলে জনতার কাছে তোমরা দোষ এড়িয়ে যেতে পারবে।" যথার্থই তাঁর কাছে দূত পাঠানো হলো। দূত গিয়ে বললো, "কোরাইশ নেতৃবৃন্দ তোমার সাথে কথা বলার জন্যে জমায়েত হয়েছেন। তাদের কাছে একটু চল।"

একথা শোনা মাত্রই রসূলুলাহ (সঃ) ত্রস্তপদে তাদের কাছে ছুটে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে যে দাওয়াত দিয়েছেন সে সম্পর্কেই বোধ হয় তারা নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করেছে। বস্তুতঃ রসূলুলাহ (সঃ) আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যে, তারা সঠিক পথে ফিরে আসুক। তাদের গোয়ার্তুমী ও অত্যাচারে তিনি ভীষণ দুঃখিত ছিলেন। তিনি গিয়ে কোরাইশ নেতৃবৃন্দের পাশে বসলেন। তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, তোমার সাথে কিছু কথা বলার জন্যে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। খোদার কসম, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, তেমন আর কোন আরব কখনো করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, প্রচলিত ধর্মের নিন্দা করেছ, দেব-দেবীকে গালিগালাজ করেছ, বুদ্ধিমান লোকদের বোকা ঠাওরিয়েছ এবং জাতির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ। মোটকথা, আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন খারাপ জিনিসই আনতে তুমি বাকী রাখনি। এখন কথা হলো, এসব কথা বলে তুমি যদি সম্পদ অর্জন করতে মনস্থ করে থাক তাহলে আমরা

www.pathagar.com

তোমাকে টাকা কড়ি সংগ্রহ করে দেই যাতে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হতে পার। আর যদি এর দ্বারা তুমি পদমর্যাদার প্রত্যাশী হয়ে থাক তাহলে আমরা তোমাকে সরদার বানিয়ে দেই। আর যদি তুমি রাজা বাদশাহ হতে চাও তাহলে এস তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নেই। আর তোমার কাছে যে দূত আসে সে যদি কোন জ্বিন ভূত হয়ে থাকে এবং তোমার উপর পরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা যত টাকা লাগুক, তোমার চিকিৎসা করাতে প্রস্তুত যাতে তুমি সুস্থ হয়ে উঠ অথবা তোমার সম্পর্কে জনতার কাছে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে না হয়।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বলেন, "তোমরা যা যা বলছ তার কোনটাই আমি চাইনা। আমি যে দাওয়াত তোমাদের কাছে পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি তোমাদের সম্পদ চাই কিংবা তোমাদের মধ্যে পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হতে চাই কিংবা তোমাদের রাজা হতে চাই। আমাকে আল্লাহ তোমাদের কাছে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছেন এবং তোমাদের জন্যে সাবধানকারী ও সুসংবাদ দানকারী হতে আমাকে আদেশ করেছেন। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণের জন্যে সুদপদেশ দিয়েছি। এখন তোমরা যদি আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করে নাও তাহলে সেটা তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের ও আমার ব্যাপারে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো।"

তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, আমরা যে কয়টা প্রস্তাব তোমার কাছে পেশ করলাম তার কোনটাই যদি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে আর একটা কথা শোনো। তুমি তো জান, দুনিয়ায় আমাদের মত সংকীর্ণ আবাস ভূমি আর কারো নেই, পানির অভাব ও অন্যান্য উপকরণের দৈন্যের কারণে আমরা যেরূপ দুঃসহ জীবন যাপন করি, পৃথিবীতে আর কোন জাতি এমন জীবন যাপন করেনা। সুতরাং তোমার যে প্রভু তোমাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তার কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি এই পাহাড় পর্বতগুলোকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নেন যাতে আমাদের আবাসভূমি আরও প্রশস্ত হয় এবং তিনি যেন ইরাক ও সিরিয়ার নদ নদীর ন্যায় আমাদের এ দেশেও নদনদী প্রবাহিত করে দেন। তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের পূর্ব পুরুষদের পুনর্জীবিত করেন এবং পুনর্জীবিত পূর্বপুরুষদের মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাবও যেন অন্তর্ভুক্ত থাকেন যিনি অন্যতম সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাদেরকে আমরা তোমার কথা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞেস করবো। তারা যদি বলেন তুমি সত্যবাদী এবং আমাদের দাবী অনুসারে তুমি যদি কাজ কর তাহলে আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো, তোমার খোদাপ্রদত্ত মর্যাদা আমরা স্বীকার করবো এবং তোমাকে যথার্থই আল্লাহর রসূল বলে মেনে নেব।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেন, "এসব ব্যাপার নিয়ে আমি তোমাদের কাছে আসিনি। আমাকে আল্লাহ যে জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাছাড়া আর কোন কিছু আমার ইখতিয়ারে নেই। আর যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এটা যদি তোমরা গ্রহণ কর তাহলে এটা দুনিয়া ও আখিরাতে

www.pathagar.com

তোমাদের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে। আর যদি অগ্রাহ্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ও আমার মধ্যে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো।"

তারা বললো, "এ প্রস্তাবও যদি তোমার মনোপূতঃ না হয়, তাহলে তুমি নিজের জন্যে একটা কাজ কর। তোমার প্রতিপালককে বল তোমার সাথে একজন ফিরিশ্‌তা পাঠাতে। তিনি আমাদের সামনে তোমার কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দেবেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন। আর আল্লাহ তোমার জন্যে অনেকগুলো বাগবাগিচা ও প্রাসাদ বানিয়ে দিক এবং অনেক সোনা রূপার ধনদৌলত দান করুক। এতে করে তোমার যে অর্থ লিপ্সা দেখতে পাই তা মিটবে। কেননা তুমি তো আমাদেরই মত বাজারে ঘোরাফেরা কর এবং আমাদেরই মত জীবিকা অন্বেষণ কর। তোমার এসব ধনদৌলত হলে আমরা বুঝবো, তুমি যথার্থই আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার প্রভুর কাছে মর্যাদাবান। তুমি নিজের ধারণা মুতাবিক সত্যিই যদি রসূল হয়ে থাক তাহলে এসব করে দেখাও তো দেখি।"

রসূল (সঃ) বললেন, "না, এটাও আমি করবোনা। আমি আল্লাহর কাছে এসব জিনিস চাইতে পারবোনা। আমি তোমাদের কাছে এসব জিনিস নিয়ে আসিনি। আল্লাহ আমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। তোমরা যদি আমার আহ্বানে সাড়া দাও, তবে সেটা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সৌভাগ্যের উৎস। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আল্লাহ যা করেন তাই হবে। তিনি যতক্ষণ আমার ও তোমাদের মধ্যে নিষ্পত্তি না করে দেন ততক্ষণ আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো।"

তারা বললো, "তাহলে কয়েক টুকরো মেঘ আমাদের মাথার ওপর ফেলে দাও, যেমন তুমি বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। এটা না করলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনবোনা।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে অবশ্যই তা করতে পারেন।"

তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, তোমার প্রতিপালক কি এটা জানতেন না যে, আমরা তোমার সাথে বৈঠকে বসবো এবং যা এখন তোমার কাছে চাইলাম তা তোমার কাছে চাইবো? তিনি কি তোমার কাছে এসে আমরা যেসব কথা তোমার কাছে উত্থাপন করলাম তার জবাব তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারলেন না এবং তোমার দাওয়াত অগ্রাহ্য করলে আমাদের তিনি কি করবেন তা তোমাকে জানাতে পারলেন না? আমরা জানতে পেরেছি যে, ইয়ামামায় বসবাসকারী 'রাহমান' নামক এক ব্যক্তি তোমাকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো রাহমানকে বিশ্বাস করবোনা। মুহাম্মাদ, তোমার কাছে আমরা আমাদের অক্ষমতার কথা জানাচ্ছি। তোমার আচরণ আমাদের সাথে যতদূর গড়িয়েছে তাতে আমরা তোমাকে ছাড়বোনা। হয় তুমি আমাদের ধ্বংস করবে নচেৎ আমরা তোমাকে ধ্বংস করবো- তার আগে আমরা ক্ষান্ত হবোনা।"

সমবেত লোকদের একজন বললো, "আমরা ফিরিশতাদের পূজা করি। ফিরিশতারা হলো আল্লাহর মেয়ে।" আর একজন বললো, "আল্লাহ ও ফিরিশতাদেরকে আমাদের সামনে হাজির কর। নচেৎ আমরা তোমার উপর ঈমান আনবোনা।"

www.pathagar.com

এসব কথা শোনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান থেকে চলে এলেন। তাঁর ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাও তাঁর সাথে এলো। সে বললো "শোনো মুহাম্মাদ তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার কাছে কতকগুলো প্রস্তাব পেশ করলো তার একটাও তুমি গ্রহণ করলে না। তারপর তারা এমন কতকগুলো জিনিস তোমার কাছে দাবী করলো যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে যে পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন বলে তুমি নিজে বলে থাক তা জানতে ও বুঝতে পারে এবং তোমাকে স্বীকার করতে ও তোমার অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু তুমি সে দাবী গুলোও পূরণ করলেনা। তুমি যে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তুমি যে আল্লাহর রসূল তা জানার জন্যেও তারা কিছু দাবী জানালো তোমার কাছে। তুমি তাও রাখলে না। আল্লাহর কসম, তুমি একটা সিঁড়ি দিয়ে আকাশে চড়বে এবং তোমাকে আকাশে উঠে যেতে আমি স্বচোখে দেখবো, অতঃপর তোমার সাথে চারজন ফেরেশতা আসবেন এবং তারা তোমার দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে- তা না হলে আমি তোমার উপর ঈমান আনবো না। এমনকি তুমি যদি এসব করে দেখিয়ে দাও তাহলেও আমার মনে হয়না যে, আমি তোমার উপর ঈমান আনব।"

এসব কথা বলে সে রসূলুল্লাহর (সঃ) কাছ থেকে চলে গেল। রসূলুল্লাহও (সঃ) তাকে ত্যাগ করে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষন্ন মনে বাড়ী চলে এলেন। কেননা তাঁকে যখন ডেকে নেয়া হয় তখন তিনি খুবই আশান্বিত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ যখন দেখলেন যে, তারা তাঁর থেকে আরো দূরে সরে গেল তখন তাঁর দুঃখের সীমা থাকলোনা।

রসূলুল্লাহ (সঃ) চলে যাওয়ার পর আবু জেহেল বললো, "হে কোরাইশ, শোন! মুহাম্মাদ কিছুতেই তার নীতি ত্যাগ করতে রাজী নয়। আমাদের ধর্মের সমালোচনা, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দা, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে বিবেচনা করা এবং আমাদের দেব-দেবীকে গালমন্দ করার বদ্ধমূল স্বভাব সে কিছুতেই পরিহার করবেনা। আমি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করছি, কাল যত বড় পাথর আমি উত্তোলন করতে পারি, হাতে নিয়ে তার অপেক্ষায় থাকবো। নামাযে যখনই সে সিজদায় যাবে, তখনই সেই পাথর দিয়ে আমি তার মাথা গুড়িয়ে দেবো। এরপর যা হয় হবে। তোমরা আমাকে বিচারে সোপর্দ কর কিংবা রক্ষা কর, সেটা তোমাদের বিবেচ্য। বনু আবদ মানাফ যা ভালো মনে করে তাই করবে।" সবাই বললো, "আল্লাহর শপথ, আমরা কিছুতেই তোমাকে বিচারের জন্যে সোপর্দ করবোনা। তুমি যা সংকল্প করেছো তা করে ফেলো।"

পরদিন আবু জেহেল সত্যি সত্যি প্রকান্ড একখানা পাথর নিয়ে রসূলুল্লাহর (সঃ) অপেক্ষায় বসে রইলো। রসূলুল্লাহও (সঃ) নিত্যকার অভ্যাস মত নামায পড়তে গেলেন। মক্কায় বাস করলেও তিনি সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায পড়তেন। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আর কুরাইশরা তাদের সম্মেলন স্থলে বসে আবু জেহেল কি করে সেজন্যে অধীর আগ্রহে প্রহর গুণতে লাগলো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সিজদায় গেলেন তখন আবু জেহেল পাথর উত্তোলন করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর কাছে যেতেই পরাজিত, ভীত-বিহ্বল ও বিবর্ণ চেহারা নিয়ে ফিরে এলো। তার হাত দুটো যেন পাথরের উপর নিথর ও নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। সে

www.pathagar.com

পাথর খানা দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। এ সময় কোরাইশদের কয়েকজন তার দিকে এগিয়ে গেল এবং বললো, "হে আবুল হাকাম, তোমার কি হলো?" সে বললো, "আমি মুহাম্মাদের কাছে চলে গিয়েছিলাম এবং গতরাতে তোমাদের কাছে যে সংকল্প ব্যক্ত করেছিলাম, তাই কার্যকর করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু যে মাত্র তার কাছে গিয়েছি, অমনি একটা প্রকান্ড ও ভয়ংকর উট তার ও আমার মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহর শপথ, আমি কখনো এমন ভয়ংকর চুট, ঘাড় ও দাঁত ওয়ালা উট দেখিনি। উটটা আমাকে খেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলো!"

আবু জেহেলের এসব কথা বলার পর নাদার ইবনে হারেস উঠে দাঁড়ালো। সে বললো, "হে কোরাইশ জনতা, আল্লাহর শপথ, তোমাদের উপর এমন এক আপদ আপতিত হয়েছে যার প্রতিকারে তোমরা এখনো কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারনি। মুহাম্মাদ ছিল তোমাদের মধ্যে একজন তরুণ কিশোর মাত্র। সে ছিল তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ও সবচেয়ে সত্যবাদী। সে ছিল সবচেয়ে বিশ্বস্ত। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করা মাত্রই সে এক নতুন জিনিস নিয়ে আবির্ভূত হলো। তখন তোমরা তাকে বললে যাদুকর। না, আল্লাহর শপথ, সে যাদুকর নয়। আমরা যাদুকরদের দেখেছি। তাদের তন্ত্রমন্ত্র ও ফুঁকও আমরা দেখেছি। তোমরা তাকে বললে জ্যোতিষী। আল্লাহর শপথ, সে জ্যোতিষী নয়। জ্যোতিষীদের মারপ্যাচ ও রংঢং আমরা অনেক শুনেছি ও দেখেছি। তোমরা বললে, সে কবি। না, আল্লাহর শপথ, সে কবিও নয়। কবিতা আমরা অনেক দেখেছি। সব রকমের কবিতা দেখেছি। সমর সংগীত থেকে শুরু করে সাধারন গান পর্যন্ত সবই আমাদের জানা। তোমরা বললে, সে পাগল। কিন্তু সত্যকথা হলো, সে পাগলও নয়। আমরা পাগল দেখেছি। পাগলের কথাবার্তায় যে জড়তা, আবোল তাবোল ও ভাবাবেগ থাকে, তা তাঁর কথাবার্তায় অনুপস্থিত। হে কোরাইশগণ, তোমরা নিজেদের অবস্থাটা খতিয়ে দেখ। আল্লাহর শপথ, তোমাদের উপর এক ভয়াবহ মুসীবত আপতিত হয়েছে।"

নাদার ইবনে হারেস ছিল কোরাইশদের সবচেয়ে কুটিল ও কুচক্রী নেতাদের অন্যতম। রসূলুল্লাহকে (সঃ) নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করাই ছিল তার কাজ। সে হীরায় কিছুকাল কাটিয়েছিল এবং সেখান থেকে পারস্যের রাজ রাজাদের কাহিনী শিখে এসেছিলো। রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের উপাখ্যানও সে জানতো। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখনই কোন বৈঠকে বসে আল্লাহর বাণী শোনাতেন এবং তাঁর জাতিকে পূর্বতন জাতিগুলো কিভাবে আল্লাহর রোষের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেসব কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ার করতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কথা শেষ করে উঠে যাওয়া মাত্রই সে বলতো, "হে কোরাইশগণ, আমি মুহাম্মাদের চেয়েও সুন্দর কাহিনী বলতে পারি। এসো, আমি তোমাদেরকে তাঁর কথার চেয়ে চটকদার কথা শুনাই।" অতঃপর সে তাদেরকে পারস্যের রাজাদের এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের উপাখ্যান শোনাতো। তারপর বলতো, "মুহাম্মাদ আমার এসব কথার চেয়ে কি সুন্দর কথা বলতে পারে?" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "নাদার ইবনে হারেস সম্পর্কে কোরআনে আটটি আয়াত নাযিল হয়েছে।"

www.pathagar.com

"যখনই তার সামনে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখনই সে বলেঃ এগুলো তো প্রাচীনকালের উপাখ্যান!" এই আয়াতটি এবং 'প্রাচীন কালের উপাখ্যান' এর উল্লেখ অন্য যেসব আয়াতে হয়েছে, তা এই নাদার ইবনে হারেস সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

জান্নাতুল মোয়াল্লায়

মক্কায় ব্যবসায় করেন এমন এক বাঙ্গালী হোটেল ব্যবসায়ী, জনাব সামছুল হকের সাথে ইতিমধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ করে রেখেছিলাম। তিনি আমাকে আশেপাশের কিছু ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি দেখাবেন বলে জানালেন। কথামত ২৬শে সেপ্টেম্বর বাদ জোহর তিনি আমাদের হোটেলে হাজির হলেন এবং পরে আমাকে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলেন। তাঁর হোটেলটির নাম 'আহ্‌মদ মহল', নবীর (সঃ) জন্মস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে রাস্তার অপর পারে (সুক আললাইল, আল-গাজ্জা)। সেখানে কিছু আপ্যায়ন শেষে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন জান্নাতুল মোয়াল্লায়, যেখানে চিরশান্তির শয্যায় শুয়ে আছেন জগৎজননী খাদিজা (রাঃ)।

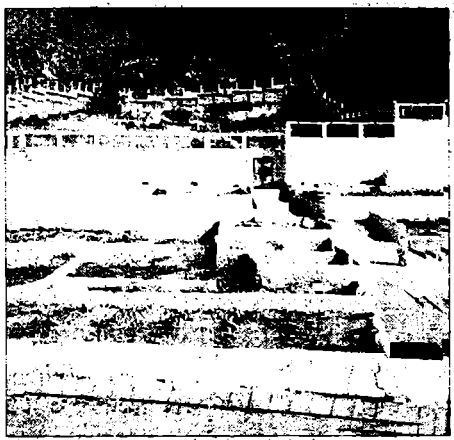

জান্নাতুল মোয়াল্লা

মোয়াল্লা কবরস্থানে অসংখ্য কবর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। অবশ্য কবরের চিহ্ন নেই; বড় বড় পাথর সারি সারি করে রাখা আছে, যা দেখে কবরের আন্দাজ করা যায় মাত্র। হক সাহেব জানালেন, কয়েক বছর পর পর একই কবরের স্থানে নতুন মৃতদেহ দাফন করা হয়। পূর্বের কঙ্কাল ইত্যাদি তুলে ফেলে দেয়া হয় অন্যত্র। এখানে শায়িত সকল মোমেন মোমেনার জন্যে মুনাজাত করেছি। তাঁদের এবং নিজের নাজাতের জন্যে আল্লাহ্‌র দরগাহে নিবেদন করেছি। শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়েছি তামাম জাহানের মুসলিম জননী, উম্মুল মুমেনীন সাধ্বী হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রতি। তাঁর নজীরবিহিন আত্মত্যাগ ও কীর্তি গাথা স্মরন করে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছি। এই সেই পূন্যময়ী মহিয়সী মহিলা যাঁর বক্ষে শিশু ইসলাম বিহংগ শাবকের মত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, আল্লাহ্ তায়ালার রিজওয়ানের অজস্র ধারা তাঁর উপরে বর্ষিত হোক। তাঁরই স্নেহ ছায়ায় ইসলাম পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ওহী বহন করে আবির্ভূত হলেন, তখন আম্মা খাদীজা (রাঃ)-ই ইসলামের প্রকৃত হিতৈষিণীর মত তা পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন।

নির্মম আঘাতে যখন রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) অনুপম জিছম মুবারক রুধিরাক্ত, বিশাল কাল্‌ব মুবারক বেদনার্ত হয়ে উঠত, পৃথিবীর কোন প্রান্তেই যখন আশ্বাসের কোন আভাস পাওয়া যেত না, তখন একমাত্র হযরত খাদীজা (রাঃ)-ই তাঁকে অভয় দান করতেন, তাঁর নিকট শান্তির আশ্বাস বয়ে আনতেন। তাঁর সকল বেদনা মুছে ফেলবার চেষ্টা করতেন এবং রিসালতের মহান কর্তব্যে অটল থাকবার জন্যে তাঁকে সর্বদা প্রেরণা দান

www.pathagar.com

করতেন। দিগন্তব্যাপী নিরাশ্বাস মরুপ্রান্তরের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাঃ)-ই ছিলেন রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) একমাত্র আশ্রয় মঞ্জিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "আমি খাদীজাকে এমন এক মুক্তানির্মিত প্রাসাদের সুসংবাদ দিতে আদিষ্ট হয়েছি যাতে যন্ত্রণা ও অভিযোগ নেই।" বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) - রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট নাযিল হয়ে বললেন ঃ খাদীজাকে আল্লাহ্‌র তরফ হতে সালাম পৌঁছিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ খাদীজা! ইনি জিবরাঈল, আল্লাহ্ তোমাকে সালাম জ্ঞাপন করেছেন। খাদীজা (রঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্, স্বয়ং সালাম, তাঁর নিকট হতে সালাম এবং জিবরাঈলের উপর সালাম।

জ্বিন মসজিদে

জান্নাতুল মোয়াল্লা থেকে আমরা গেলাম জ্বিন মসজিদে। কথিত আছে, রসূলেপাকের (সঃ) উপর এখানে নাযিল হয়েছে পবিত্র কালামে পাকের সূরা জ্বিন। তার স্মরনেই এ মসজিদ। ইতিহাসে জ্বিনদের কোরআন শুনার ব্যাপারে নিম্মোক্ত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে ঃ বনু সাকীফের কাছ থেকে হতাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে চললেন। পথে নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে মধ্যরাতে তিনি নামায পড়ছিলেন। এ সময়ে নাসীবীনের সাত জন জ্বিন ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা রসূলুলাহ্‌র (সঃ) কোরআন তিলাওয়াত শুনলো। নামায শেষ হলে তারা নাসীবীনে ফিরে গিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে কোরআনের বাণী পৌঁছে দিল-যার প্রতি তারা পথিমধ্যে শোনামাত্রই ঈমান এনেছিলো। পবিত্র কোরআনের সূরা জ্বিন ও সূরা আহকাফে আল্লাহ এই জ্বিনদের কাহিনী নবীর (সঃ) কাছে বর্ণনা করেছেন। সূরা আহকাফের আয়াত কয়টি হলোঃ

"সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমার দিকে জ্বিনদের একটি দলকে পরিচালিত করলাম যেন তারা কোরআন শুনতে পারে। তারা সেখানে পৌঁছে পরস্পরকে বললোঃ 'তোমরা চুপ করে শোনো।' তাদের কোরআন শোনা শেষ হলে তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সবধান করতে লাগলো। বলল, 'হে আমাদের জাতি, আমরা এমন এক গ্রন্থের তিলাওয়াত শুনে এসেছি যা মূসার পরবর্তী সময়ে তাঁর কিতাবের (তাওরাতের) সত্যায়নকারী এবং সত্য ও নির্ভূল পথের দিশারী হয়ে নাযিল হয়েছে। হে আমাদের জাতি, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন তা হলে তিনি তোমাদের গুণাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন।"

সূরা জ্বিনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে নবী, তুমি বল যে, আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, একদল জ্বিন কোরআনের বাণী শুনেছে ....." এরূপ সমগ্র সূরাটিই জ্বিনদের সংক্রান্ত আলোচনায় পরিপূর্ণ।

নবীপাকের (সঃ) জন্মস্থানে

এরপর আমরা গেলাম নবীর (সঃ) জন্মস্থানে। মসজিদে হারামের বাবুস সালাম বরাবর উত্তর-পূর্ব দিকে খালি চত্তর পার হলেই একটি টিলার উপর নবী পাকের (সঃ) জন্ম স্থান। এখানে বর্তমানে একটি পাকা ভবন রয়েছে যাতে রয়েছে

www.pathagar.com

একটি লাইব্রেরী। আমরা লাইব্রেরীতে গমণ করি। লাইব্রেরীতে প্রচুর বই। কিন্তু সীমাবদ্ধতার কারনে বইগুলোর মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারিনি। কারন, সকল বই আরবীতে প্রকাশিত।

বেশ ক'টি বই উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখেছি। বই গুলোর ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম না হলেও বইগুলোর প্রতি ছত্রে নবীপাকের (সঃ) স্মৃতি অংকিত রয়েছে বলে মনে হয়েছে। তাঁর জন্ম লগ্নের উল্লেখযোগ্য কিছু কাহিনী মানষপটে ভেসে উঠেছে।

'আমুল ফীল অর্থাৎ হস্তীবাহিনী নিয়ে আবরাহার কা'বা অভিযানের ঘটনা যে বছর ঘটে, সেই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ রজনী অতিক্রান্ত হবার শুভ মুহূর্তে সোমবারে, রসূলুল্লাহ (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

কায়েস ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আমি ও রসূলুল্লাহ (সঃ) আবরাহার হামলার বছর জন্মগ্রহণ করি। তাই আমরা সমবয়সী।"

হাসসান ইবনে সাবিত বলেন ঃ "আমি তখন সাত আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী ও লম্বা হয়ে উঠেছি। যা শুনতাম তা বুঝতে পারার ক্ষমতা তখন হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইহুদী ইয়াসরিবের (মদীনার) একটা দূর্গের উপর উঠে উচ্চস্বরে 'ওহে ইহুদী সমাজ।' বলে চিৎকার করে উঠলো। লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়ে বললো, "তোমার কি হয়েছে?" সে বললো, "আজ রাতে আহ্মদের জন্মের সেই নক্ষত্র উদিত হয়েছে।"

নবীপাক (সঃ) এর জন্ম স্থান

অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সঃ) ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর মা আমিনা তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালিবের নিকট এই বলে খবর পাঠালেন যে, "আপনার এক পৌত্র জন্মেছে। আসুন, তাঁকে দেখুন।" আবদুল মোত্তালিব এলেন, এসে তাঁকে দেখলেন। এই সময় আমিনা তাঁর গর্ভকালীন সময়ে দেখা স্বপ্নের কথা, নবজাতক সম্পর্কে যা তাঁকে বলা হয়েছে এবং তাঁর যে নাম রাখতে বলা হয়েছে তা সব জানালেন, তাঁর স্বপ্নটি ছিল নিম্নরূপঃ

নবী পাক (সঃ) গর্ভে আসার পর মা আমিনার কাছে কোন এক অপরিচিত আগন্তুক আসেন এবং তাঁকে বলেন, তুমি যাঁকে গর্ভে ধারন করেছ, তিনি এ যুগের মানব জাতির মহানায়ক। তিনি যখন ভূমিষ্ট হবেন তখন তুমি বলবেঃ সকল হিংসুকের অনিষ্ট থেকে এই শিশুকে এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর আশ্রয়ে সমর্পন করছি। অতঃপর তার নাম রাখবে মুহাম্মদ।" আমিনা আরো স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর ভেতর থেকে এমন একটা জ্যোতি বেরুলো যা সিরীয় ভূখন্ডের বুসরার প্রাসাদ সমূহ দেখা গেল।

www.pathagar.com

অতঃপর আবদুল মোত্তালিব তাঁকে নিয়ে কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে কা'বাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং শিশুকে মায়ের কাছে দিয়ে ধাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে বনু সা'দ ইবনে বকরের আবু যুয়াইবের কন্যা হালীমাকে ধাত্রী হিসেবে নিয়োগ করলেন।

হালিমার বাড়ির উঠান ও কূপ

সামিয়া হারাতুল বাবে

হক সাহেব, অতঃপর আমাকে নিয়ে গেলেন "সামিয়া হারাতুল বাবে" মালেক ফাহাদ গেইটের বিপরীত দিকে যেখানে ইবরাহীম খলীল সড়ক এসে শেষ হয়েছে-তার পাশ দিয়ে উপরের দিকে একটি রাস্তা। কিছু দূর গেলেই সেই সামিয়া হারাতুল বাব। পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট এলাকাজুড়ে গর্তের মত বিরান এলাকা। হক সাহেব বললেন, আইয়্যামে জাহিলীয়াতের জামানায় এখানে পাহাড়ের উপর থেকে কন্যা সন্তানদের নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হত। তিনি আরো জানালেন যে, এখানে নির্মান কাজের অনেক চেষ্টা করেও অজানা কারনে তা সম্ভব হয়নি। আমরা এখানে কয়েকটি স্ন্যাপ নিলাম; কিন্তু হক সাহেব জানালেন, ছবি নাও আসতে পারে; কারন, ইতিপূর্বে এখানের ছবি কেউ তুলতে পারেনি। (পরে দেখেছি, আমাদের তোলা ছবি প্রিন্টিং হয়নি, ক্যামেরার ত্রুটির কারনেও তা হতে পারে)। হক সাহেবের উল্লেখিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অনাগত অতীতের সেই কন্যা সন্তানদের প্রতি দোয়া করে আমরা এই অভিশপ্ত স্থানটি ত্যাগ করলাম। এরপর আমরা মসজিদে হারামে আসরের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করে পরস্পরের থেকে বিদায় নিলাম।

মদীনা-মনোয়ারার পথে

মক্কা মোয়াজ্জমায় আমাদের অবস্থানের ৬ দিন কেটে গেল। সময় বেশী হাতে নেই। মক্কা-মদীনায় মাত্র বার দিনের প্রোগ্রাম। নবী পাকের (সঃ) রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মনোয়ারায় যেতে হবে। মূসা সাহেবকে আমাদের ইচ্ছার কথা জানালাম। পরামর্শ শেষে সিদ্ধান্ত হল যে, ২৯শে সেপ্টেম্বর সকালে বাস যোগে আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব।

প্রোগ্রাম অনুসারে আমরা ২৯ তারিখ ভোর বেলা থেকে কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিলাম। স্বল্প সময়ের জন্যে মদীনায় যাচ্ছি। কাজেই প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় বাদে বাকী মাল-সামান হোটেল ম্যানেজারের রুমে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে মূসা সাহেব এসে গেছেন। সকাল ৭-৩০ টার বাস সুবিধাজনক হবে বলে তিনি জানালেন। তিনি আরো উল্লেখ করলেন যে, তাঁর বন্ধু জনাব মসিউল্লাহ্ মদীনা বাস স্টপেজে আমাদেরকে রিসিভ করবেন। এর সাথে তাঁর টেলিফোনে আলাপ

www.pathagar.com

হয়েছে। আমাদের থাকার ব্যাপারেও জনাব মসিউল্লাহ্ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তিনি জানালেন।

আমরা আমাদের লাগেজসহ বাবে মালিক ফাহাদ বাস স্ট্যান্ডে (১৫নং বাস স্ট্যান্ডে) যথারীতি পৌঁছে গেলাম। তখন যে বাসটি মদীনার পথে যাত্রার অপেক্ষায় ছিল, তার টিকেট কাটার জন্যে মূসা সাহেব টিকেট কাউন্টারে গেলেন। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে তিনি জানালেন যে, এ বাসে সিট খালি নেই; পরের বাসের টিকেট কাটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই বাসের জন্যে আমাদেরকে আরো এক ঘন্টা এখানে অপেক্ষা করতে হল।

যাহোক আমরা সকাল ৮-৩০ টার বাসে মদীনা মনোয়ারার উদ্দেশ্যে (SAPTCO)বাসে চড়লাম। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মদীনার প্রধান আকর্ষন হুযুরের (সঃ) রওজা মোবারক। এমন পাষান হৃদয়ের মুসলমান নেই যে মক্কায় হজ্ব বা ওমরা উপলক্ষে গেল অথচ মদীনা মনোয়ারা গেলনা। শুধুমাত্র হুযুরের (সঃ) রওজা মোবারক নহে, হায়াতে মদীনার প্রতিটি রাস্তা ও গলি তাঁর সৌরভে চৌদ্দশ বছর পূর্বে যেরূপ সুরভিত হত আজও তেমনি তার প্রতিটি রেনু তাঁর জীবন বহন করছে।

হে অতীতের অপরিচিত মদীনা! সকল যুগের শ্রেষ্ঠতম মানব দ্বারা তোমার শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। নিখিল বাঞ্ছিত সাইয়্যেদুল মুরসালীন রসূলুল্লাহ্র (সঃ) দেহ মোবারক ধারণ করে তুমি চিরধন্য। হে হিজরতের পরম পবিত্র ভূমি! বিশ্ব দরবারে তোমার শির চির উন্নত- আল্লাহ্ পাকের রহমতের অজস্র ধারায় উদ্ভাসিত।

আল্লাহ্পাকের কুদরত বুঝার সাধ্য কার! যাঁকে দিয়ে খানায়ে কাবার আবাদ হবে, যাঁর অনুসারীদের কেবলা, তাহ্জীব তমদ্দুনের মূলকেন্দ্র বিন্দু হবে এই খানায়ে কা'বা তাঁকে এখানে অবাঞ্চিত ঘোষনা করা হল। শুধু তাই নয়,তাঁকে হত্যা করার সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেল। মালিকের নির্দেশে তাঁকে মদীনা মনোয়ারার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে হল অতি সন্তর্পনে।

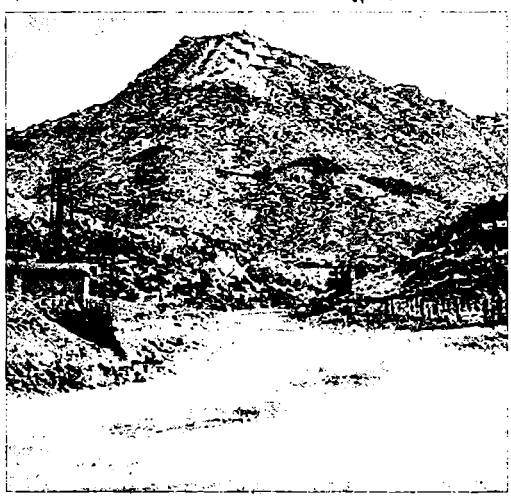

হিজরতকালীন রাস্তা

আমাদের বাস আল ইব্রাহীম স্ট্রীট ধরেই যাত্রা শুরু করল। পাশ দিয়ে আল-হিজরা স্ট্রীটও চলে গেছে যেই পথ দিয়ে নবী পাক (সঃ) মদীনার পথে হিজরত করলেন। মুহাম্মদের (সঃ) মদীনায় হিজরতের পটভূমি ইসলামের ইতিহাসে উজ্বল নক্ষত্রের মত উদ্ভাসিত। এই হিজরতের পথ ধরে জন্ম নিল 'মদীনা' নামক প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র। তারপর বদর, ওহুদ, হুনাইন

www.pathagar.com

ও খন্দক পেরিয়ে মুসলমানদের বীর বেশে এই মক্কায় পদার্পন। যারা একদিন নবীপাককে (সঃ) এই পবিত্র মক্কায় অবাঞ্ছিত ঘোষনা করল, যাঁকে টিটকারী, ঠাট্টা, প্রলোভন থেকে শুরু করে যাবতীয় জুলুম নির্যাতন সহ চিরতরে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র করল, যাঁর পরিজনসহ বংশের সবাইকে শেবে আবু তালেবে, পানাহার ব্যতীত তিন বছর বন্দীজীবনে বাধ্য করল, মক্কা বিজয়ের পর তারা আবার মহানবীর (সঃ) একটুখানি করুণার জন্যে হন্যে হয়ে উঠল। প্রমাণিত হল- "সত্য এসে গেছে, বাতিল নির্মূল হয়েছে, বাতিলের পতন অবশ্যম্ভাবী।"

নিখিলের নবী (সঃ) করুণার ছবি নবী (সঃ) তাঁর এবং মুসলমানদের উপর শত নির্যাতন ভুলে গিয়ে মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিলেন। ইসলামের শীতল ছায়ায় সবাইকে স্থান করে দিলেন এবং তাঁদেরকে নিয়েই দিকে দিকে ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়ে চললেন।

ইতিহাস সাক্ষী যে, মদীনায় হিজরত মুসলমানদের বিজয়ের প্রথম সোপান। এ হিজরতের ঘটনা মুসলমানদের জন্যে গৌরব গাঁথার সূচনা করেছে। অথচ আজকের মুসলমানগণ সেই গৌরবোজ্বল হিজরতকে ভুলে গেছে। বস্তুতঃ জিহাদ এবং হিজরতকে ভুলে যাওয়ার কারণেই আজকের মুসলমানরা অধঃপতিত, লাঞ্ছিত এবং পরাজিত। স্বাধীনভাবে দ্বীন মেনে চলার সুযোগ না থাকলেই ইসলামে হিজরতের উপর তাকিদ দেয়া হয়েছে।

নবীর (সঃ) হিজরতের কাহিনী মনে পড়ে গেল

আমাদেরকে নিয়ে বাস ছুটে চলল মদীনা মনোয়ারা অভিমুখে। আর আমার মন চলে গেল নবী পাকের (সঃ) হিজরতকালীন ঘটনা পঞ্জীর দিকে।

মক্কার পৌত্তলিকরা যখন দেখলো যে, সাহাবায়ে কেরামগণ পরিবার পরিজন ধন-সম্পদ ফেলে রেখে আওস এবং খাযরাজদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। ক্রোধে তারা অস্থির হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে তারা এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কখনো সম্মুখীন হয়নি। এ পরিস্থিতি ছিল তাদের মূর্তি পূজা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর মারাত্মক আঘাত এবং চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

পৌত্তলিকরা ভালো করেই জানতো যে, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে নেতৃত্বের ও পথ নির্দেশের যোগ্যতা এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী গুণাবলী। তাঁর সাহাবাদের মধ্যে আত্মত্যাগের এবং সাহসিকতার যে প্রেরণা রয়েছে সেটাও তাদের অজানা ছিল না। আওস এবং খাযরাজ গোত্রের রণ কৌশল, যোদ্ধা বা লড়াকু হিসেবে তাদের সুনাম সুখ্যাতিও ছিল সর্বজনবিদিত। উভয় গোত্রের মধ্যে যেসব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা রয়েছেন তাদের অসাধারণ প্রজ্ঞাও সকলের জানা ছিল। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন লড়াই করতে জানেন তেমনি প্রয়োজনে সন্ধি সমঝোতাও করতে জানেন। বহু বছর গৃহযুদ্ধের তিক্ততার পর আওস এবং খাযরাজ গোত্র বর্তমানে প্রয়োজনে সন্ধি এবং

www.pathagar.com

মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এ খবরও কোরায়েশদের অজানা ছিল না।

পৌত্তলিক কোরায়েশদের এটাও জানা ছিল যে, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে যে পথ রয়েছে, সেই পথেই চলাচল করে কোরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা। সে পথ মদীনা থেকে বেশী দূরে নয়। কাজেই অর্থনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিরিয়া থেকে মক্কাবাসীদের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল (সেই সময়ের হিসাব অনুযায়ী) আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার সমপরিমাণ। তাবেরা এবং অন্যান্য এলাকার বাণিজ্যিক হিসাব ছিল এর অতিরিক্ত। কাজেই বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তার মাধ্যমেই যে এ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা হতে পারে এটা তারা ভালো করেই বুঝতো।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়ায় এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিণাম কতো মারাত্মক। পৌত্তলিকরা এ সব আশঙ্কা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিল এবং তারা বুঝতে পারছিল যে, সামনে কঠিন সময় ও কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ কারণে তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কার্যকর প্রতিষেধক সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলো। তারা জানতো যে, এসব বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির(?)মূলে রয়েছেন ইসলামের পতাকাবাহী মোহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং নিজে।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার প্রায় আড়াই মাস পর ২৬শে সফর, ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের শুক্রবার সকালে দারে নোদওয়ায় কোরায়েশদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মক্কার পার্লামেন্ট দারে নোদওয়ায় ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য এ বৈঠকে মক্কার কোরায়েশদের সকল গোত্রের প্রতিনিধি যোগদান করে। আলোচ্য বিষয় ছিল এমন একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করা যাতে ইসলামী দাওয়াতের নিশান বরদারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া যায় এবং ইসলামের আলো চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দেয়া যায়।

এ জঘন্য বৈঠকে যেসব গোত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিল তারা হল ঃ

	ব্যক্তির নাম	গোত্রের নাম
১.	আবু জেহেল ইবনে হিশাম	বনি মাখযুম
২.	যোবায়ের ইবনে মুয়েম তুয়াইমা ইবনে আবদে মান্নাফ আদী এবং হারেস ইবনে আমের	বনি সওফেল
৩.	শায়বা ইবনে রবিয়া; ওতবা ইবনে রবিয়া এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব	বনি আবদে
	শামস ইবনে আবদে মান্নাফ	
৪.	নযর ইবনে হারেস	বনি আবদুদ দার
৫.	আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম জামআ ইবনে আসোয়াদ এবং হাকিম ইবনে হেযাম ইবনে আব্দুল ওজ্জা	বনি আসাদ

www.pathagar.com

৬. নবীহ ইবনে হাজ্জাজ এবং মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ — বনি ছাহাম

৭. উমাইয়া ইবনে খালফ — বনি জুমাহ

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিনিধিরা দারে নোদওয়া পৌঁছে গেল। এ সময় ইবলিস শয়তান একজন বৃদ্ধের রূপ ধারণ করে সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিল জোব্বা। প্রবেশদ্বারে তাকে দেখে লোকেরা বলল, আপনি কে, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। শয়তান বলল, আমি নজদের অধিবাসী, একজন শেখ। আপনাদের প্রোগ্রাম শুনে হাযির হয়েছি। কথা শুনতে চাই, কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারব আশা করি। পৌত্তলিক নেতারা শয়তানকে যত্ন করে সসম্মানে নিজেদের মধ্যে বসালো।

সবাই হাযির হওয়ার পর আলোচনা শুরু হলো। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর নানা প্রকার প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রথমে আবুল আসওয়াদ প্রস্তাব করলো যে, তাঁকে আমরা আমাদের মধ্য থেকে বের করে দেব। তাঁকে মক্কায় থাকতে দেব না। আমরা তাঁর ব্যাপারে কোন খবরও রাখব না যে, তিনি কোথায় যান কি করেন। এতেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব। আমাদের মধ্যে আগের মতো সহমর্মিতা ফিরে আসবে।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বলল, এটা কোন কাজের কথা নয়। তোমরা কি লক্ষ্য করোনি যে, তাঁর কথা কতো উত্তম কতো মিষ্টি। তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করেন। যদি তোমরা তাঁর ব্যাপারে নির্বিকার থাকো তবে তিনি কোন আরব গোত্রে গিয়ে হাযির হবেন এবং তাদেরকে নিজের অনুসারী করার পর তোমাদের ওপর হামলা করবেন। এরপর তোমাদের শহরেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের সাথে যেমন খুশী আচরণ করবেন। কাজেই তোমরা অন্য কোন প্রস্তাব চিন্তা করো।

আবুল বুখতারী বলল, তাঁকে লোহার শেকলে বেঁধে আটক করে রাখা হোক। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আটক রাখা হোক। এতে করে সেই ঘরে তাঁর মৃত্যু হবে। কবি যোহাইর এবং নাবেগার এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বলল, এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা যদি তাকে আটক করে ঘরের ভেতরে রাখো তবে যেভাবে হোক তার খবর তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে যাবে। এরপর তাঁরা মিলিতভাবে তোমাদের ওপর হামলা করে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তাঁর সহায়তায় সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের ওপর হামলা করবে। সেই হামলায় তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। কাজেই অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করো।

উল্লেখিত দু'টি প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর তৃতীয় একটি প্রস্তাব পেশ করা হলো। মক্কার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধী আবু জেহেল এ প্রস্তাব উত্থাপন করলো। সে বলল, এ লোকটি সম্পর্কে আমার একটি মাত্র প্রস্তাব রয়েছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনো কেউ সেই প্রস্তাবের কাছে পৌঁছেনি। সবাই বলল, বলো আবুল হাকাম কি সেই প্রস্তাব? আবু জেহেল বলল, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যুবককে বাছাই করে তার হাতে একটি ধারালো তলোয়ার দেয়া হবে। এরপর সশস্ত্র শক্তিশালী যুবকরা একযোগে তাকে হত্যা করবে। এমনভাবে মিলিত হামলা করতে হবে দেখে যেন মনে হয় একজন আঘাত করেছে। এতে করে আমরা এই লোকটির হাত থেকে রেহাই পাব। এমনিভাবে হত্যা করা হলে তাকে হত্যার দায়িত্ব সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনু আবদে

www.pathagar.com

মান্নাফ সকল গোত্রের সাথে তো যুদ্ধ করতে পারবে না। ফলে তারা হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে রাজি হবে। আমরা তখন তাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব।
শেখ নজদী রূপী শয়তান এ প্রস্তাব সমর্থন করলো। মক্কা পার্লামেন্ট ও প্রস্তাবের উপর ঐক্যমত্যে উপনীত হলো। সবাই এ সঙ্কল্পের সাথে ঘরে ফিরলো যে, অবিলম্বে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে।

রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে প্রিয় নবীর নিকট হাযির হল। তিনি নবীকে কোরায়েশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। হিজরত করার সময় জানিয়ে হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রিয় নবীকে বললেন, আপনি আজ রাতে আপনার বাসভবনের বিছানায় শয়ন করবেন না।

এ খবর পাওয়ার পর প্রিয় নবী (সঃ) ঠিক দুপুরের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হিজরতের পরিকল্পনা তৈরী করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, ঠিক দুপুরের সময় আমরা আবু বকরের ঘরে বসেছিলাম, এমন সময় একজন আবু বকরকে বললেন, আল্লাহর নবী মাথা ঢেকে এদিকে আসছেন। এই সময়ে আল্লাহর রসূল কখনো আসতেন না। আবু বকর (রাঃ) এ খবর শুনে বললেন, আমার মা-বাবা তাঁর জন্যে কোরবান হউন। নিশ্চয়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে এসেছেন।
হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবী এলেন এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর আবু বকরকে বললেন, তোমার কাছে যারা রয়েছে তাদের সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন, শুধু আপনার স্ত্রী রয়েছে। রসূল বললেন, আমাকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে কি আমি, হে রসূল? আপনার উপর আমার মা-বাবা কোরবান হোন, হে আল্লাহর রসূল। প্রিয় রসূল (সঃ) বললেন, হ্যাঁ। এরপর হিযরতের কর্মসূচী তৈরী করে তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন এবং রাতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।
এদিকে কোরায়েশদের নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা মক্কার পার্লামেন্ট দারে নোদওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সারা দিন ব্যাপী প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। জঘন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে এগারোজন সর্দারকে বাছাই করা হলো। এদের নাম হচ্ছে, ১) আবু জেহেল ইবনে হিশাম, ২) হাকাম ইবনে আস, ৩) ওকবা ইবনে আবি মুয়াইত, ৪) নয়র ইবনে হারেছ, ৫) উমাইয়া ইবনে খালফ, ৬) জামআ ইবনে আসওয়াদ, ৭) তুয়াইমা ইবনে আদী, ৮) আবু লাহাব, ৯) উবাই ইবনে খালফ, ১০) নুবাইহ ইবনে হাজ্জাজ, ১১) মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ।
ইবনে ইসহাক বলেন, রাতের আঁধার ঘন হয়ে এলে এগারোজন দুর্বৃত্ত নবী (সঃ)- এর বাসভবনের চারদিকে ওঁৎ পেতে রইলো। তারা অপেক্ষা করছিল যে, তিনি শুয়ে পড়লে তারা একযোগে হামলা করবে।

www.pathagar.com

দুর্বৃত্তরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অবশ্যই সফল হবে। আবু জেহেল তার সঙ্গীদের সঙ্গে ঠাট্টা মস্কারা করে বলেছিল, মোহাম্মদ (সঃ) বলে যে, তোমরা যদি তার ধর্ম মতে দীক্ষা নিয়ে তার অনুসরণ করো তবে আরব অনারবের বাদশাহ হবে। এরপর মৃত্যুশেষে পুনরুজ্জীবিত হলে তোমাদের জন্যে জর্দানের বাগানের মতো জান্নাত থাকবে। যদি তোমরা তাকে না মারো তবে তারা তোমাদের জবাই করবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হলে তোমাদের আগুনে পোড়ানো হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল রাত বারোটার পর। এ কারণে নির্ঘুম চোখে নির্ধারিত সময়ের প্রতিক্ষায় তারা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর ইচ্ছা সফল করে থাকেন। তিনি আসমান যমিনের বাদশাহ। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে বাঁচাতে চান কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। যাকে পাকড়াও করতে চান কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। এই সময়েও আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেছিলেন তাই করলেন। প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, 'স্মরণ কর, কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্যে, হত্যা করার জন্যে, নির্বাসিত করার জন্যে তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন, আর আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

একদিকে কাফের মোশরিকরা রসূলকে (সঃ) হত্যা করার কাংখিত মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল, অপরদিকে প্রিয় রসূল (সঃ) কাফেরদের প্রতি এক মুঠো ধূলা নিক্ষেপ করে কিভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন তার বিস্তারিত ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সাওর পর্বতের গুহা হতে বহির্গত হয়ে সারওয়ারে কায়েনাতের ক্ষুদ্র কাফেলাটি কোন্ দিকে গেছে, কেউই বলতে পারল না। সৃষ্টির ঊষা থেকে যাঁর নাম প্রত্যেক সৃষ্টি অবগত, কিয়ামত পর্যন্ত যাঁর নাম মানব হৃদয়ে অংকিত থাকবে, আজ তিনি মরুর নিশীত অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন কেউ তাঁর সন্ধান জানেনা।

রসূলেপাককে (সঃ) কিংবা হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খুঁজে না পেয়ে কোরায়েশ নেতারা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, আল্লাহর রসূল এবং হযরত আবু বকরকে গ্রেফতার করার জন্যে সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। তারা মক্কা থেকে বাইরের দিকে যাওয়ার সকল পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলো। সেই সাথে ঘোষণা করা হলো যে, যদি কেউ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং আবু বকরকে (রাঃ) বা দু'জনের একজনকে জীবিত বা মৃত হাজির করতে পারে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। এ ঘোষণা সর্বসাধারণে প্রচারিত হবার পর চারদিকে বহু লোক বেরিয়ে পড়লো। পায়ের চিহ্ন বিশারদরাও উভয়কে তালাশ করতে লাগলো। পাহাড়ে প্রান্তরে উঁচু নীচু এলাকায় সর্বত্র চষে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু এতো কিছু করেও কোন লাভ হলো না।

গারে সাওর থেকে বেরোবার পর হুযুরের (সঃ) ক্ষুদ্র কাফেলাটি প্রথমে ইয়েমেনের দিকে গেলেন এবং দক্ষিণ দিকে বহুদূর অগ্রসর হলেন। এরপর পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করলেন। এরপর এমন এক পথে চলতে লাগলেন যে পথ

www.pathagar.com

সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা কেউ অবহিত ছিল না। সে পথ ধরে তাঁরা উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে খুব কম সময়েই লোক চলাচল করতো।

আল্লাহর রসূল (সঃ) এ পথে যেসব স্থান অতিক্রম করেছেন ইবনে ইসহাক তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পথ প্রদর্শক যখন তাদের নিয়ে বের হলেন তখন মক্কার নিম্ন ভূমি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করলেন। এরপর উপকূল দিয়ে পথ চলার পর আসফানের নীচু এলাকায় বাঁক ঘুরলেন। সানিয়াতুল মুররা দিয়ে লকফের বিস্তীর্ণ ভূমি অতিক্রম করলেন। এরপর হাজাযের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পৌঁছুলেন এবং সেখান থেকে মুজাহের মোড় দিয়ে শস্যশ্যামল ভূমিতে গমন করেন। তারপর যি কেশরার মাঠে প্রবেশ করে জুদুজাদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজার্দে পৌঁছেন। এরপর তাহানের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশ দিয়ে যু যালাম অতিক্রম করেন। সেখান থেকে আবাদি তারপর ফাজা অভিমুখে রওয়ানা হন। তারপর অবতরণ করেন আজরে। তারপর রকুবার ডান পাশ দিয়ে সানিয়াতুল আযেরে গেলেন এবং রিম উপত্যকায় অবতরণ করেন। তারপর কুবায় গিয়ে পৌঁছুলেন।

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, গারে সাওর থেকে বেরিয়ে আমরা সারারাত ধরে পথ চলেছি, পরদিন দুপুর পর্যন্তও চলেছি। ঠিক দুপুরে রাস্তায় কোন পথচারী ছিল না। আমরা এ সময় একটা লম্বালম্বি প্রান্তর দেখতে পেলাম। এখানে রোদ নেই। আমরা সেখানে অবতরণ করলাম। নিজের হাতে আমি প্রিয় নবীর (সঃ) শয়নের জন্যে একটি জায়গা সমতল করলাম, এরপর সেখানে পুস্তিন বিছালাম। প্রিয় নবীকে (সঃ) এরপর বললাম যে, হে আল্লাহর রসূল, আপনি শয়ন করুন, বিশ্রাম নিন, আমি আশে পাশে খেয়াল রাখছি। নবীজী (সঃ) শুয়ে পড়লেন। আমি চারিদিকে নযর রাখলাম। হঠাৎ দেখি একজন রাখাল কিছু সংখ্যক বকরি নিয়ে এদিকেই আসছে। সে প্রান্তরের ছায়ায় আসছিল। আমি তাকে বললাম, তুমি কার লোক? সে মক্কা বা মদীনার একজন লোকের নাম বলল। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরির কি কিছু দুধ হবে? সে বলল, হ্যাঁ আমি বললাম, দোহন করতে পারি? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা বলে সে একটি বকরি ধরে আনলো। আমি বললাম, মাটি খড়কুটো এবং লোম থেকে ওলান একটু পরিষ্কার করে দাও। পরিষ্কার করার পর একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দোহন করে দিল। আমার কাছে ছিল একটি চামড়ার পাত্র। রসূলের ওযু করার এবং পানি পান করার জন্যে সেটি রেখেছিলাম। প্রিয় নবীর কাছে এসে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করলাম না; কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুম থেকে জাগলেন। দুধের সাথে কিছু পানি মেশালাম, এতে পাত্রের নীচের অংশ ঠান্ডা হয়ে গেল। তাঁকে বললাম, আপনি এ দুধটুকু পান করুন। তিনি পান করলেন এবং খুশী হলেন। এরপর বললেন, এখনো কি রওয়ানা হওয়ার সময় আসেনি? আমি বললাম, কেন নয়? এরপর আমরা আবার রওয়ানা হলাম।

এ সফরের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূলের (সঃ) পেছনে বসতেন। পথচারীদের দৃষ্টি তাঁর দিকেই যেতো প্রথমে, কারণ তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ছিল। তাঁর

www.pathagar.com

তুলনায় রসূলকে কমবয়সী মনে হচ্ছিল। পথচারীদের কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতো যে, আপনার সামনে উনি কে? হযরত আবু বকর (রাঃ) জবাব দিতেন যে, উনি আমাকে পথ দেখান। প্রশ্নকারী বুঝতো যে মরুভূমিতে পথ দেখাচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নেকী ও কল্যাণের পথের কথাই বোঝাতেন।

এই সফরের সময় প্রিয় নবী (সঃ) উম্মে মা'বাদ খোযায়ার তাঁবুতে কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি করেন। এই মহিলা খুব বুদ্ধিমতী। নিজের বাড়ীতে আঙ্গিনায় তিনি বসেছিলেন। যাতায়াতকারী পথচারীদের সাধ্যমতো পানাহার করাতেন। প্রিয় নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে? মহিলা বললেন, যদি কিছু থাকতো তবে আপনাদের মেহমানদারিতে ত্রুটি করতাম না। কয়েকটি বকরি আছে যেগুলো দূরে চারণভূমিতে রয়েছে। এখন দুর্ভিক্ষের সময় চলছে।

আল্লাহর রসূল (সঃ) লক্ষ্য করলেন যে, বাড়ীর এক পাশে একটি বকরি বাঁধা আছে। তিনি বললেন, উম্মে মা'বাদ, এ বকরি এখানে কেন? উম্মে মা'বাদ বললেন, এ বকরি খুব দূর্বল, হাঁটতে পারে না। প্রিয় রসূল বললেন, অনুমতি যদি দাও তবে ওর দুধ দোহন করি? মহিলা বললেন, হ্যাঁ, যদি দুধ দেখতে পান অবশ্যই দোহন করুন। এ কথার পর প্রিয় রসূল (সঃ) বকরির ওলানে হাত লাগালেন। আল্লাহ পাকের নাম নিলেন এবং দোয়া করলেন। বকরি সাথে সাথে পা প্রসারিত করে দাঁড়ালো। তার ওলান ভরা দুধ। প্রিয় রসূল (সঃ) একটি বড় পাত্র নিয়ে সেই পাত্রে দুধ দোহন করলেন। সেই পাত্র ভর্তি দুধ এক দল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারতো। দুধ দোহনের পর পাত্রে ফেনা ভরে গেল। হুযুরে (সঃ) সেই দুধ পান করলেন, সঙ্গীদের পান করালেন। উম্মে মা'বাদ নিজে পান করলেন। এরপর হুযুর (সঃ) সেই পাত্রে পুনরায় দুধ দোহন করলেন। সেই পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মা'বাদের ঘরে রেখে আল্লাহর রসূল (সঃ) গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলেন।

কিছুক্ষণ পর মহিলার স্বামী বকরির পাল নিয়ে বাড়ী ফিরলো। সেসব বকরিও দূর্বল, পথ চলতে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ দুধ দেখে তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন দুধ পেলে কোথায়? সব দুগ্ধবতী বকরি তো আমি চারণ ভূমিতে নিয়ে গেছি, ঘরে তো দুধ দেয়ার মতো বকরি ছিল না। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমাদের কাছে একজন বরকত সম্পন্ন মানুষ এসেছিলেন। তাঁর কথা ছিল এমন এবং তাঁর অবস্থা ছিল এমন। সব শুনে আবু মা'বাদ বললেন, এই তো মনে হয় সেই ব্যক্তি যাকে কোরায়েশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা তুমি তার আকৃতি প্রকৃতি একটু বলো। উম্মে মা'বাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভবে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে তিনি রসূলের (সঃ) পরিচয় বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনা ভঙ্গি শুনে মনে হয় শ্রোতা যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। আগন্তুকের ভূয়সী প্রশংসা শুনে সে বললো, আল্লাহর শপথ এই হচ্ছে কোরায়েশদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বর্ণনা করেছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর প্রিয় সঙ্গীদের একজন হবো। যদি কোন পথ পাই তবে অবশ্যই এটা করবো।

এদিকে মক্কার বাতাসে কবিতার ছন্দে কিছু কথা ভেসে আসছিল। যিনি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন তাকে দেখা যাচ্ছিল না। কবিতার অর্থ নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ পাকের পুরস্কার লাভ করুন সেই দু'জন,
উম্মে মা'বাদের বাড়ীতে যারা করলেন পদার্পন।
ভালোয় ভালোয় থেমেছিলেন, যাত্রা করলেন ফের সফলকাম হয়েছেন
তিনি সঙ্গী যিনি মোহাম্মদের।
হায় কুসাই তোমাদের থেকে
নযির বিহীন সাফল্য এবং নেতৃত্ব নিলেন আল্লাহ কেড়ে।
বনু কা'ব এর সেই মহিলা আহা কী যে ভাগ্যবান
মোবারক হোক মোমেনীনের জন্যে সেই বাসস্থান।
বকরির কথা পাত্রের কথা মহিলার কাছে জানতে চাও
সেই বকরিও সাক্ষী দেবে তোমরা বকরির কাছে যাও।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমাদের জানা ছিল না যে, আল্লাহর রসূল কোনদিকে গেছেন। হঠাৎ একটি জিন মক্কায় এসে এসব কবিতা শোনালো। উৎসাহী জনতা সেই জিনকে পাচ্ছিল না। তারা শব্দের পেছনে ছুটে যাচ্ছিল। শব্দ শুনছিল। এক সময় সেই শব্দ মক্কার উঁচু এলাকায় মিলিয়ে গেল। সেই কবিতা শুনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রিয় রসূল কোনদিকে গেছেন। স্পষ্টই বোঝা গেল যে তিনি মদীনার পথে রয়েছেন।

পথে ছোরাকা ইবনে মালেক প্রিয় নবী (সঃ) এবং হযরত আবু বকরকে অনুসরণ করেছিলেন। ছোরাকার বর্ণিত ঘটনা নিম্নরূপঃ আমি আমার কওম বনি মুদলেজের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর বসলো। সেই লোকটি বলল, ওহে ছোরাকা একটু আগে আমি উপকূলের কাছে কয়েকজন লোক দেখলাম। আমার ধারণা তিনি মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথী। ছোরাকা বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এঁরাই তাঁরা, কিন্তু যে লোকটি খবর দিয়েছিল তাঁর কাছে মনোভাব গোপন রাখার জন্যে বললাম, না না ওরা তারা নয়, তুমি যাদের দেখেছ তাদের তো আমরাও দেখেছি তারা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে গেছে। এরপর আমি মজলিসে কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে আমার দাসীকে আমার ঘোড়া বের করার জন্যে বললাম, ঘোড়া বের করার পর তাকে বললাম টিলার পেছনে নিয়ে যাও এবং সেখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। এরপর আমি তীর নিলাম এবং ঘরের পেছন দিয়ে বাইরে বের হলাম। তীরের এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্ত মাটিতে হেঁচড়ে আমি ঘোড়ার কাছে গেলাম। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলে ঘোড়া আমাকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। এক সময় আমি উপকূলীয় এলাকায় তাঁদের নিকট এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ ঘোড়া লাফাতে শুরু করলো। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। পুনরায় আমি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম এবং তূণ এর দিকে হাত বাড়ালাম এবং পাশার তীর বের করে আনতে চাইলাম, তাকে বিপদে ফেলতে পারব কিনা। কিন্তু যে তীর বের হলো সেটি আমার অপছন্দনীয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহর রসূল নির্বিকার ভাবে একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কোনদিকেই তাঁর খেয়াল নেই। আবু বকর সিদ্দিক পেছন ফিরে আমাকে দেখছিলেন। হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'খানি মাটিতে দেবে গেল। হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল এক সময়। আমি

www.pathagar.com

ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। ঘোড়াকে শাসন করলাম, ঘোড়া উঠতে চাইল। অনেক কষ্টে ঘোড়া নিজের পা উপরে তুললো। ঘোড়া পা তুললে তার পায়ের নিশানা থেকে ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ছিল। আমি তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম, এবার এমন তীর বের হলো যা আমি চাইনি। এরপর আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে তাদের ডাক দিলাম, তারা থামলেন। ঘোড়ার পিঠে করে আমি তাদের নিকটে পৌঁছলাম। যখনই আমি তাদের থামালাম তখনই হঠাৎ আমার মনে হলো আল্লাহর রসূলই বিজয়ী হবেন। আমি তখন আল্লাহর রসূলকে বললাম, আপনার স্বজাতীয়রা আপনার জীবনের পরিবর্তে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে মক্কার লোকদের সংকল্প সম্পর্কেও আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তাঁকে পথের কিছু সম্বলও আমি দিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না এবং আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করলেন না। শুধু বললেন, আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখে দিন। আল্লাহর রসূল তখনই আমের ইবনে ফোহায়রাকে আদেশ দিলেন। আমের নিরাপত্তার পরোয়ানা স্বরূপ এক টুকরো চামড়ায় কিছু কথা লিখে আমাকে দিলেন। এরপর আল্লাহর রসূল সামনে অগ্রসর হলেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবু বকরের (রাঃ) একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা রওয়ানা হওয়ার পর কওমের লোকেরা আমাদের তালাশ করছিল। কিন্তু ছোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশুম ছাড়া কেউ আমাদের দেখতে পায়নি। ছোরাকা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল একটি লোক আমাদের পিছু লেগেছে, সে কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রিয় নবী সাথে সাথে বললেন, 'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।' অর্থাৎ ভয় পেয়োনা আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

ছোরাকা মক্কায় ফিরে এসে দেখতে পেল, তখনো অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর রসূলকে যে পথে দেখল সেদিকে কিছু লোককে দেখে ছোরাকা বলল, ওদিকে তোমাদের যে কাজ ছিল সেটা হয়ে গেছে। দিনের শুরুতে যে লোক ছিল সন্ধানকারীদের একজন, দিনের শেষে সেই ব্যক্তিই হয়ে গেল আমানতদার।

পথে বুরাইদা আসলামির সাথে রসূলের (সঃ) সাক্ষাৎ হলো। এই লোক ছিল তার কওমের সর্দার। কোরায়েশদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে এই লোকও রসূল (সঃ) এবং হযরত আবু বকরের (রাঃ) সন্ধানে বের হয়েছিল কিন্তু রসূলের সাথে কথা বলার সাথে সাথে তার মনে ভাবান্তর হলো। তিনি নিজ গোত্রের ৭০ জন লোকসহ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর পাগড়ি খুলে বর্শায় বেঁধে দোলাতে দোলাতে সুসংবাদ শোনালেন যে, শান্তির বাদশাহ, সমঝোতার পথিকৃৎ পৃথিবীকে ন্যায় বিচার ইনসাফ পরিপূর্ণ করার অগ্রপথিক আগমণ করছেন। মদীনা যাওয়ার পথে হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামের (রাঃ) সাথে প্রিয় রসূলের দেখা হলো। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তিনি প্রিয় নবী (সঃ) এবং হযরত আবু বকরকে (রাঃ) কিছু জিনিস উপহার দেন।

আমাদের বাস মদীনার হারাম এলাকায় প্রবেশ করল

বাসে বসে বসে হিজরতকালীন নিষ্ঠুরতম অধ্যায়গুলো মনের কোনে পরপর ভেসে আসছিল। পথে সকাল ১১-৪৫ টায় নাস্তার জন্যে এবং বেলা ১২-৩০ টায় জোহরের নামাজের জন্যে বিরতি শেষে প্রায় দু'টার দিকে আমাদের নিয়ে বাসটি মদীনা মনোয়ারার হারাম এলাকায় প্রবেশ

www.pathagar.com

করল। এখান থেকে মসজিদে নববীর সুউচ্চ মিনারগুলো নিকটে আসতেই তার প্রতি শহীদুল্যা সাহেব ও জিল্লুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ওই সুউচ্চ মিনার অথবা আধুনিকতম মসজিদে নববী বেশী দিনের নয়। নবীর (সঃ) নিজ হাতে গড়া মসজিদে নববী যুগে যুগে সংস্কার হয়ে এ-ই আধুনিক রূপ নিয়েছে।

জ্বিন ও ইনসানের মুহব্বতের হেরেম মসজিদে নববী

ঈমানদার জ্বিন ও ইনসানের মুহব্বতের হেরেম-মদীনার ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মসজিদে নববী। মদীনা যেরূপ নবীর শহর, এই মসজিদও সেরূপ নবীর মসজিদ। যে ভূমিখন্ডের উপর কোসওয়া বসে পড়েছিল সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বহস্তে এই মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপন করেন।

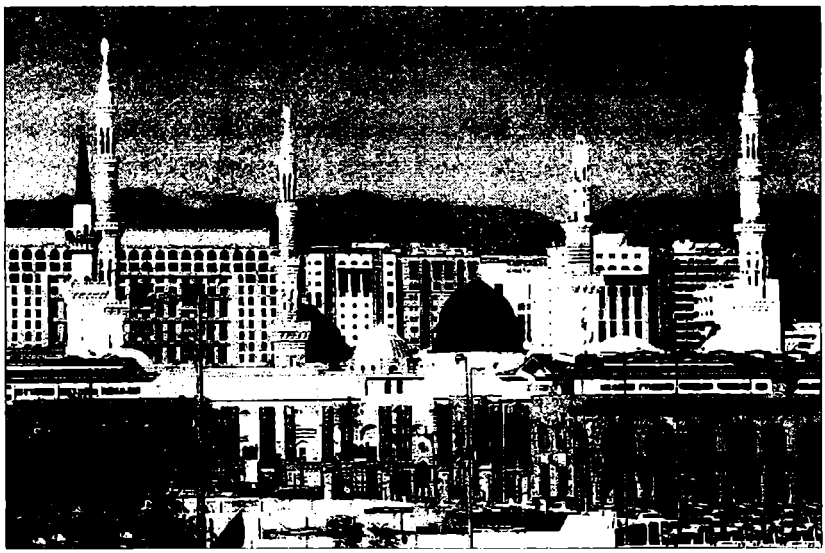

মসজিদে নববী

মদীনায় পদার্পণ করার পর রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রধান লক্ষ্য হল মসজিদ নির্মাণ করা। তিনি নামায পড়বার সময় বিশেষ অসুবিধা অনুভব করতেন। তাঁর বাসস্থানের নিকট নাজ্জার বংশের কিছুটা জমিন ছিল। তিনি লোকদিগকে ডেকে বললেন, "আমি এই ভূমিখন্ড মূল্য দিয়ে নিতে চাই।" তাঁরা বললেন, "মূল্য নেব কিন্তু আপনার নিকট থেকে নয়, আল্লাহর নিকট থেকে।" ঐ ভূমিখন্ডের প্রকৃত মালিক ছিলেন সাহ্‌ল ও সোহাইল নামক দুই এতিম সহোদর। এরা হযরত মোয়ায বিন-আকরার (রাঃ) তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত। ঐ ভূমিখন্ডের সংলগ্ন হযরত আসয়াদ বিন যোরার (রাঃ) এর এক খন্ড ভূমি ছিল। উক্ত খন্ডের একদিকে হযরত আসয়াদ (রাঃ) একখানি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার চতুর্দিকে প্রাচীর দেয়া ছিল, উপরে ছাদ ছিল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হিজরতের পূর্বে সেখানে জুময়া ও জামাত অনুষ্ঠিত হত। হিজরতের পর রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও কখনও ঐ মসজিদে নামাজ পড়তেন। তিনি ঐ মসজিদের ভূমিখন্ড এবং সংলগ্ন অংশ ক্রয় করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তিনি হযরত আসয়াদ (রাঃ) এর

www.pathagar.com

মুখে এর পূর্ণ তথ্য অবগত হন। হযরত মোয়ায (রাঃ) একা সমস্ত মূল্য পরিশোধ করে ভূমিখন্ড দান করতে প্রস্তাব করলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) তাতে সম্মত হলেন না। রসূলুল্লাহ (সঃ) এতিমদ্বয়কে ডেকে পাঠালেন। এতিমদ্বয় উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমরা তা হেবা করে দিচ্ছি, আপনি গ্রহণ করুন।" তিনি তাতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং দশ দীনারের বিনিময়ে তা ক্রয় করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে মূল্য দিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সন্তুষ্ট চিত্তে হুকুম তামিল করলেন। এ ভূমিতে বহু খেজুর বৃক্ষ, গর্ত ও মুশরিকদের কবর ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশে বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলা হল, গর্তসমূহ ভরাট করা হল এবং মুশরিকদের অস্থিপুঞ্জ তুলে দূরে ফেলা হল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবীগণ মসজিদ নির্মাণ কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁদেরকে প্রস্তর আনতে নির্দেশ দিলেন। শাহেনশাহে দুআলম নিজেও প্রস্তর বহন করে আনতে লাগলেন। তাঁর সিনা মুবারক ধূলি ধূসরিত হয়ে যেত। প্রস্তর বহন করে আনবার সময় সাহাবীগণ এ কবিতা পাঠ করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও- তাঁদের সংগে তা আবৃত্তি করতেনঃ "আখিরাতের মঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নেই। আল্লাহ্! আনসার ও মুহাজিরদেরকে রহম কর।" কখনওবা তিনি ও সাহাবীগণ পাঠ করতেনঃ "আখিরাতের জীবন ব্যতীত জীবন নেই; আল্লাহ্! আনসার ও মুহাজিরদেরকে রহম কর।"

কখনওবা সাহাবীগণ নিজেরাই তা পাঠ করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পড়তেন।

মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আবির্ভূত হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলে গেলেন যেন তাঁর ছাউনি তাঁর ভ্রাতা হযরত মূসা (আঃ)-এর ছাউনির মত হয়। তা তিনি সাহাবীগণকে বললেন, "আমার জন্যে মূসার ছাউনির মত সুক্ষ্ম তৃণ ও কাঠের একখানা ছাউনি-মূসার ছায়ার মত ছায়া নির্মাণ কর।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে, "মূসার ছায়া কি?" তিনি বললেন, "তিনি দাঁড়ালে ছাদ মস্তক স্পর্শ করত।" এর মর্ম এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের ছাউনি যে রূপ মাত্র ছায়ার জন্যে নির্মিত হয়েছিল সেরূপ মসজিদে নববীও শুধু ছায়ার জন্যে নির্মিত হবে, জাঁকজমকের জন্যে নয়।

মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপনের সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পাশে দাঁড়ালেন। তখন মসজিদে নববী থেকে খানে কা'বা পর্যন্ত আবরণ উঠে গেল এবং সমুদয় কিছু দৃষ্ট হতে লাগিল।

প্রস্তর বহন করবার কালে সকলেই একখানা করে এবং বলিষ্ঠকায় হযরত আম্মার (রাঃ) দুখানা করে পাথর বহন করতেন-নিজের তরফ হতে অপরখানা। তা দেখে তাঁর পৃষ্ঠে দস্ত মুবারক বুলাতে বুলাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "অপর সকলের জন্যে একটি, আর তোমার জন্যে দুটি করে সওয়াব। তোমার সর্বশেষ পানীয় দুগ্ধ।" একবার তাঁর উপর তিনখানা প্রস্তর চাপানো হল; তিনি প্রস্তর নামাতে নামাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, "এরা আমাকে মেরে ফেলবে: যা বহন করতে সক্ষম নই তারও অধিক চাপানো হচ্ছে।" রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দেহ হতে ধূলা ঝেড়ে দিতে দিতে

www.pathagar.com

বললেন, "তোমাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করবে, এরা নয়।" এটা শুনে তিনি বললেন, "আমি ফিত্না হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাইছি।"

মসজিদ নির্মিত হল অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে-পাথরের দেয়াল খেজুর পাতা ও তৃণের ছাউনি, খেজুর গাছের খুঁটি, মাটির ভিটি, মানুষের সমান উচ্চ প্রাচীর। বৃষ্টির সময় ঐ ছাদ দিয়ে পানি পড়ত, মুসল্লিগণ ভিজে যেতেন এবং গৃহতল কর্দমাক্ত হয়ে যেত। খেজুরের শাখা জ্বেলে মসজিদে বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। হযরত তামীমদারী (রাঃ) নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় আগমন করেন। তিনি মসজিদে জায়তুন তেলের লণ্ঠনের ব্যবস্থা করেন, তা খুঁটিগুলিতে লটকিয়ে দেয়া হত। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আনন্দিত হয়ে বললেন, "তুমি আমাদের মসজিদকে যেরূপ আলোকিত করেছ, আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ আলোকিত করুক। আমার কন্যা থাকলে তোমার নিকট বিয়ে দিতাম।"

মসজিদের মাটির উপরেই নামায পড়া হত। একরাত্রি বৃষ্টিতে এর মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে গেল। নামায পড়বার সময় কেউ কেউ নিজ নিজ বসবার স্থানে কাঁকর বিছিয়ে নিতেন। তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মনঃপূত হল। তারপর সমস্ত মসজিদে কাঁকর বিছিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিসের দিকে। এর তিনটি দরজা দেয়া হয়েছিল-একটির নাম বাবে রহমত, অপরটির নাম বাবে জিবরাঈল, আরেকটি পশ্চাৎ দিকে। বাবে জিবরাঈল দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে প্রবেশ করতেন। কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হলে পশ্চাৎ দিকের দরজাটি বন্ধ করে উত্তর দিকে একটি নূতন দরজা দেয়া হয়। একদা আনসারগণ মসজিদটিকে উচ্চ ও সুশোভিত করবার জন্যে কিছু মাল এনে হাজির করলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, "কোথায় এই মসজিদের শোভা! আপনি আর কতকাল খেজুর পাতার ছাউনিতলে নামায পড়বেন? এইরূপ মসজিদে নামায পড়া আপনার পক্ষে শোভা পায় না।" সম্ভবত এর উত্তরেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলে থাকেন, "আমি মসজিদ বুলন্দ ও সুশোভিত করতে আদিষ্ট হইনি।" তারা পুনর্বার আরজ করলেন "যদি আদেশ করেন তা হলে অধিক মাটি দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধ করে দেই।" তিনি বললেন, "মূসার ছাউনির মত ছাউনি নেই।" খায়বার বিজয়ের পর মসজিদের আয়তন কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) দশ সহস্র দেরহামের বিনিময়ে জনৈক আনসারীর নিকট হতে মসজিদ সংলগ্ন একখন্ড ভূমি ক্রয় করেন। লোকাধিক্যবশত মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভূত হলে হযরত ওসমান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, "আপনি কি ঐ ভূমিখন্ড ক্রয় করবেন যা আমি আনসারের নিকট হতে ক্রয় করেছি?" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "হ্যাঁ, ক্রয় করলাম। তোমার জন্যে বেহেশতে একটি বালাখানা।" হযরত ওমরের (রাঃ) খিলাফত পর্যন্ত মসজিদের ঐ অবস্থা ছিল। তিনি মসজিদের পুনর্নির্মাণ সাধন করেন; কিন্তু কোন পরিবর্তন করেননি। তাঁর জমানা হতে মসজিদে মোটা চাটাই বিছান শুরু হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফতের সময় কারুশিল্প খচিত প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভ ও প্রাচীর এবং শাল কাঠ দ্বারা মসজিদের ছাদ পুনর্নির্মিত হয়। ইসলামের রওনক বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য। কারণ তিনি দেখলেন যে, মাটির প্রাচীর ও খেজুর পাতার ছাউনিবিশিষ্ট মসজিদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট নাও হতে

www.pathagar.com

পারে এবং নিজেদের অজ্ঞতা হেতু এর অমর্যাদা করে ইবাদতে অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে। অতএব এই পরিবর্তন তাঁর তাক্ওয়ারই পরিচায়ক-আড়ম্বর, রিয়া বা সুনাম অর্জন নয়।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না লোক মসজিদ সম্বন্ধে পরস্পর গর্বে লিপ্ত হবে।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমার এই মসজিদের এক নামায কা'বার মসজিদ ছাড়া অপরাপর মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেয়।"

তিনি বলেছেন, "তোমরা মাত্র তিনটি মসজিদের প্রতি সফর করবে-বায়তুল্লাহ্, বায়তুল মাকদিস এবং আমার এই মসজিদ।"

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরও বলেছেন, "আমার এই মসজিদ তাক্ওয়ার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

মসজিদের জন্যে কাঁচা ইট দ্বারা হুজরা নির্মাণ করা হয়। হুজরা সমূহ এত সংলগ্ন ছিল যে, ইতিকাফের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদ হতে মস্তক বের করে দিতেন এবং তাঁর বিবিগণ হুজরার থেকে তা ধুয়ে দিতেন। প্রথমে হযরত সাওদা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) এর জন্যে দুইটি হুজরা এবং পরে প্রয়োজনানুসারে অপর হুজরাগুলি তৈরি করা হয়। এদের প্রস্থ ছিল ছয় কিংবা সাত হাত এবং দৈর্ঘ্য দশ হাত। দাঁড়ালে খেজুর পাতার ছাদ নাগাল পাওয়া যেত। দরজার পর্দা ছিল কম্বল। তাতে বিলাসের তিল মাত্র উপকরণও ছিল না, এমন কি আলোকের অভাবে হুজরাগুলি সমস্ত রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর গৃহে অবস্থান কালে পরিজনবর্গকে মদীনায় স্থানান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) কে দুটি উট ও আবশ্যক মত দ্রব্যাদি ক্রয় করবার জন্যে পাঁচ শত দিরহামসহ মক্কায় প্রেরণ করেন। হযরত আবু রাফে (রাঃ) এবং সিদ্দীকে আকবরের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁর সংগে গেলেন। তাঁদের পথ প্রদর্শক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন-উরাইকাত (রাঃ)। রসূল তনয়া হযরত ফাতিমা ও হযরত উম্মে কুলসুম, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ও হযরত সাওদা, ধাত্রী হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ওসামা-বিন-যায়েদ, হযরত আসমা ও তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্-বিন-যুবাইর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর সঙ্গে আসলেন। তাঁদের সাথে সিদ্দীকে আকবরের পরিবারও হিজরত করেন। সেই সময় হযরত রোকেয়া (রাঃ) তাঁর স্বামী হযরত ওসমান (রাঃ) এর জ্যেষ্ঠা তনয়া হযরত জয়নাব (রাঃ) এর স্বামী তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত জয়নাব (রাঃ) হিজরত করতে স্বামীর অনুমতি পেলেন না; বদর যুদ্ধের পর তিনি হিজরত করেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু আইউব (রাঃ) এর গৃহে সাত অথবা বার মাস অবস্থান করেন। হুজরা নির্মিত হওয়ার পর তিনি সেখানে চলে যান।

যুগে যুগে মসজিদে নববীর সংস্কার ও সম্প্রসারন হতে হতে বর্তমানের আকার আকৃতি আধুনিকতম রূপ বৈশিষ্ট ধারণ করেছে। হুযরার উপর নির্মিত বিরাটকায় সবুজ গম্বুজ

www.pathagar.com

এর পাশাপাশি নির্মিত অর্ধচন্দ্র খচিত সুউচ্চ মিনার মদীনার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে।

বর্তমানে মসজিদে নববীর আয়তন হচ্ছে ৯৮ হাজার ৫শ বর্গমিটার। মসজিদের চারপাশের আঙ্গিনার আয়তন হচ্ছে ১লাখ ৩৫ হাজার বর্গমিটার। মসজিদ ও আঙ্গিনা সব মিলিয়ে বর্তমানে ৬লাখ ৫০ হাজার লোক একত্রে নামাজ পড়তে পারে।

মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ২৭। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে খোলা ও বন্ধ করা যায়। গরমের সময় বন্ধ করে দেয়া যায় এবং অন্য সময়ে তাজা বাতাস প্রবাহের জন্যে খুলে দেয়া যায়। মোট মিনারের সংখ্যা ১০টি। উচ্চতা ৯৮ মিটার। ৮৬ মিটার উঁচু একটি মেশিন দ্বারা লেসার মেশিন ব্যবহার করে তাতে কিবলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যাতে ৫০কিলোমিটার দূর থেকে যেয়ারতকারীরা অনায়াসেই কিবলা নির্ধারণ করতে পারেন।

মদীনা মনোয়ারায় পৌঁছে গেলাম

মদীনা মনোয়ারায় পৌঁছে প্রায় ২টায় আমরা বাস থেকে নেমে পড়ি। ওয়েটিং রুমে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলাম মসিউল্ল্যা সাহেবের সন্ধানে। তাঁর সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয়নি। তবে বাঙ্গালী হওয়ার সুবাদে খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না ভাবলাম, কিন্তু অপেক্ষারত কাউকে বাঙ্গালী বলে মনে হলনা। খানিক পরেই সৌদি রুমাল ও জুব্বা পরা একব্যক্তি আমাদের দিকে এসে আমাদেরকে সালাম দিয়ে নাম জিজ্ঞেস করলে কনফার্ম হলাম যে, ইনিই জনাব মসিউল্ল্যাহ্। পরস্পরের প্রাথমিক পরিচিতির পর তিনি জানালেন যে, তিনি দুপুর ১২-৩০ টা থেকে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা বিলম্বের কারণ জানালাম যে, ৭-৩০ টার বাসে সিট পাওয়া যায়নি বলে পরের বাসে উঠতে হয়েছিল। তিনি বললেন, চলুন। এই বলে তিনি সামনে সামনে চলতে থাকলেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। কিছুদূর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসেই তিনি একটি ট্যাক্সির দরজা খুলে তাতে আরোহণ করলেন এবং আমাদেরকে তাতে উঠতে বললেন। বুঝতে বাকি রইল না যে, এটি তাঁরই ট্যাক্সি। ট্যাক্সি চালাতে চালাতে জনাব মসিউল্ল্যা বলতে থাকলেন, এখানে পুলিশকে বিশ্বাস করানো কঠিন যে, আমি আত্মীয় স্বজনকে বহন করছি। তারা মনে করবে যে, আমি ভাড়ায় যাত্রী বহন করছি যা নির্দিষ্ট ট্যাক্সি ব্যতীত বে-আইনী। দুপুরের পরের এ সময়ে পুলিশ কম থাকে, আশা করি কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা। ট্যাক্সিতে চলতে চলতে জনাব মসিউল্ল্যার পরিচয় নিলাম। তাঁর বাড়ী লক্ষীপুর জেলায়। মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে সামানিয়া বাজারে কাপড়ের ব্যবসায় করেন। মদীনায় স্ত্রী-পরিজন নিয়েই বসবাস করছেন। মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করতে এসে এখানে ব্যবসা শুরু করেছেন। মোটামুটি ভালভাবেই আছেন। তাঁর সাথে পারিবারিক আলাপ শেষ হতে না হতেই আমাদের গাড়ী এক হোটেলের সামনে পৌঁছল নাম "সিনা রেষ্ট হাউজ"। পরিচালনা করেন জনাব নাঈম এক বাঙ্গালী, বাড়ী চাঁদপুরে। জনাব মসিউল্ল্যা ইতিপূর্বেই উক্ত হোটেলে আমাদের সিটভাড়া করে রেখেছিলেন। ৫ তলা ভবনের তৃতীয় তলায় আমাদের জন্যে তিনটি খাট পাতান রয়েছে। বাথরুম এটাস্ড। প্রতিদিনের জন্যে প্রতি সিটের ভাড়া ১০ রিয়াল। হজ্ব মৌসুমে উক্ত রুমে ফ্লোরেই বিছানা পাতান হয়, ভাড়াও অনেক বেশী।

www.pathagar.com

যাহোক, আমরা হাতমুখ ধুয়ে পাশের এক রেষ্টুরেন্ট থেকে খানা সেরে নিলাম। এখানকার বেশীর ভাগ রেষ্টুরেন্ট পরিচালনা করে পাকিস্তানীরা। ভাত-রুটি, গোস্ত, সব্জীর ব্যবস্থা রয়েছে। দাম মক্কার মিসফালার হোটেলের মতই। মধ্যাহ্ন বা রাতের সাধারণ খাওয়া ৬-৮ রিয়ালে সম্পন্ন হয়ে যায়।

খানিকটা বিশ্রাম নিয়েই আমরা আসরের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। ৪/৫ মিনিটের মধ্যেই আমরা সরদারে দোআলম হুজুরে মকবুলের (সঃ) এর রওজা পাকের কাছাকাছি এসে গেলাম।

রওজা মোবারক

কম্পিত পদে, ধীরে, অতি ধীরে অগ্রসর হতে থাকলাম। মনে হয়েছে নবী পাক (সঃ) সাথীদের নিয়ে অনতিদূরে অপেক্ষা করছেন অনাগতকাল থেকে উম্মতগণের সাক্ষাৎ দানের জন্যে। বুকে ধড়পড়ানি অনুভব হল, কি-জানি এ গুণাহ্গার উম্মতকে তিনি গ্রহণ করেন কিনা। এস্তেগফার পড়ে হুজুরের (সঃ) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে করতে বাবে জিবরাঈল গেইটের দিকে এগিয়ে গেলাম সাথীদের নিয়ে। বলতে থাকলাম, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ), আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ্ (সঃ), আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ (সঃ), আস্সালাতু আস্সালাম আলাইকা ইয়া নূরুল্লাহ্ (সঃ), আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া খাইরে খলকিল্লাহ্ (সঃ), আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাফিআল্লাহ্ (সঃ), আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্নাবিঈন (সঃ), আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রহমাতাল্লিল আলামিন (সঃ), আস্সালাতু আস্সালাতু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনেবীন (সঃ)। আমরা সালাম পেশ করতে করতে বাবে জিবরাঈল গেইট দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম এই বলে - "আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক।" আমরা রিয়াজুল জান্নাতে আসন নিলাম। পাশেই দয়াল নবী (সঃ) শুয়ে আছেন চিরসুখের জান্নাতে। যাঁকে কাছে থেকে সালাম পেশ করার জন্যে সর্বদা আল্লাহ্পাকের নিকট ধর্না দিয়েছি, যাঁর সুপারিশ ও যাঁর হাতে হাউজের পানি পানের জন্যে, শুধু আমি নই, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী উম্মুখ. আল্লাহপাকের সেই হাবীব, সাইয়্যেদুল মুরসালিন রহমাতাল্লিল আলামিনের শয্যাপাশে নিজেকে আবিষ্কার করে আল্লাহ্পাকের নিকট হাজার শুকর আদায় করে তাঁর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সপে দিয়ে তাঁর মাগফিরাত ভিক্ষা করে নাজাত ও মুক্তির জন্যে দরখাস্ত করেছি বার বার। একমাত্র সম্বল অজস্র ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিয়ে

www.pathagar.com

আল্লাহ্পাকের রহমত ও করুণা যাচনা করেছি। নবী পাকের (সঃ) পাশে শায়িত আবু বকর (রাঃ) এবং ওমরের (রাঃ) প্রতি এবং নবী পাকের (সঃ) সকল সহাবী, সকল মোমেন-মোমেনার প্রতি, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা নানী, খালা-খালু, ফুফা-ফুফু, শ্বশুর ও অন্যান্য আত্মীয়ের জন্যে দোয়া করে এবং বাদ আছর হুযুরের (সঃ) প্রতি সালাম পেশ করতে করতে বাবে বাকী দিয়ে মসজিদে নববী থেকে তখনকার মত প্রস্থান করি। এরপর জান্নাতুল বাকিতে এসে সকল মোমেন, মোমেনার প্রতি সালাম পেশ করে হোটেলে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার মসজিদে নববীতে যথারীতি মাগরিব ও এশা পড়ে নিলাম এবং পথে রাতের খাবার শেষ করে হোটেলে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন বাদ জোহর প্রায় দু'টায় আমরা তিনজন জিয়ারতে বেরিয়ে পড়লাম। মসিউল্ল্যা সাহেব তাঁর ট্যাক্সিতে করে আমাদেরকে নিয়ে ওহুদ প্রান্তর, মসজিদে কিব্লাতাইন, খন্দকের ময়দান এবং কুবা মসজিদ ঘুরিয়ে আনলেন।

ওহুদের ময়দানে

প্রথমেই আমরা পৌঁছলাম ওহুদের প্রান্তরে। এখানে প্রবেশের পথে ডান পাশে ছোট একটি টিলা (এর নাম আইনাইন পাহাড়)। তার প্রতি সাথীদের ইঙ্গিত করে আমি বললাম, এর পাশেই ছিলেন মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যাঁদের অধিকাংশই ডিউটিস্থল ত্যাগ করার সুযোগেই খালেদ (তিনি তখনো মুসলমান হননি) বাহিনী মুসলমানদেরকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করেন এবং এর ফলে যুদ্ধ মোশরিকদের পক্ষে চলে যায়। শহীদুল্ল্যা সাহেব এতে যোগ করেন যে, গণিমতের মাল লুট করতে গিয়েই এমন দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে। মসিউল্ল্যা সাহেব এতে মৃদু প্রতিবাদ করে বলেন যে, গণিমতের মাল লুটের বিষয় নহে। যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত শত্রুর ফেলে যাওয়া সামান মুসলমানদের জন্যে হালাল। তবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ছিল মূলতঃ আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা।

বস্তুতঃ ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি জানা না থাকলে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের শুরুতে কোরাইশ কাফেরগণ প্রায় তিন হাজার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করে বসে। সংখ্যাধিক্য ছাড়াও তাদের সাজ সরঞ্জামও মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। বদর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাদের মধ্যে আক্রোশ ও প্রতিশোধ স্পৃহাও ছিল অত্যন্ত তীব্র। নবী করীম (সঃ) ও অভিজ্ঞ সাহাবীদের রায় ছিল এই যে, মদীনায়ই অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কিছুসংখ্যক যুবক-যারা শাহাদাত বরণ করবার আগ্রহাতিশয্যে খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং যারা বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেনি, মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে পৌনঃপুনিক আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হয়ে নবী করীম (সঃ) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই সিদ্ধান্ত করলেন। এক হাজার সৈন্য তাঁর সাথে বের হলেন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে পৌঁছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত সঙ্গী সাথী নিয়ে সরে পড়ল। মূল যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে তার এ রূপ আচরণে মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে অনেকটা

www.pathagar.com

হতাশার সৃষ্টি হল। এমন কি বনু সালমা ও বনু হারেসার লোকেরা এতদূর মন ভাঙ্গা নিয়ে গেল যে, তারা ফিরে যাবার ইচ্ছা করে বসল। কিন্তু প্রধান প্রধান সাহাবাদের প্রচেষ্টায় এ হতাশা লোপ পায়, ভয় কাতরতা বিদূরিত হয়। ফলে অবশিষ্ট সাতশত লোকের বাহিনী নিয়ে নবী করীম (সঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং ওহুদের উপত্যকায় (মদীনা হতে প্রায় চার মাইল দূরে) তাঁর বাহিনীকে এমনভাবে কাতারবন্দী করলেন যে, পাহাড় পিছনের দিকে পড়ল, কোরাইশ শত্রুরা ছিল সম্মুখের দিকে। এক পাশে এমন একটি পাহাড়ী পথ ছিল, যেখান হতে আকস্মিক আক্রমণ হওয়ার আশংকা ছিল।

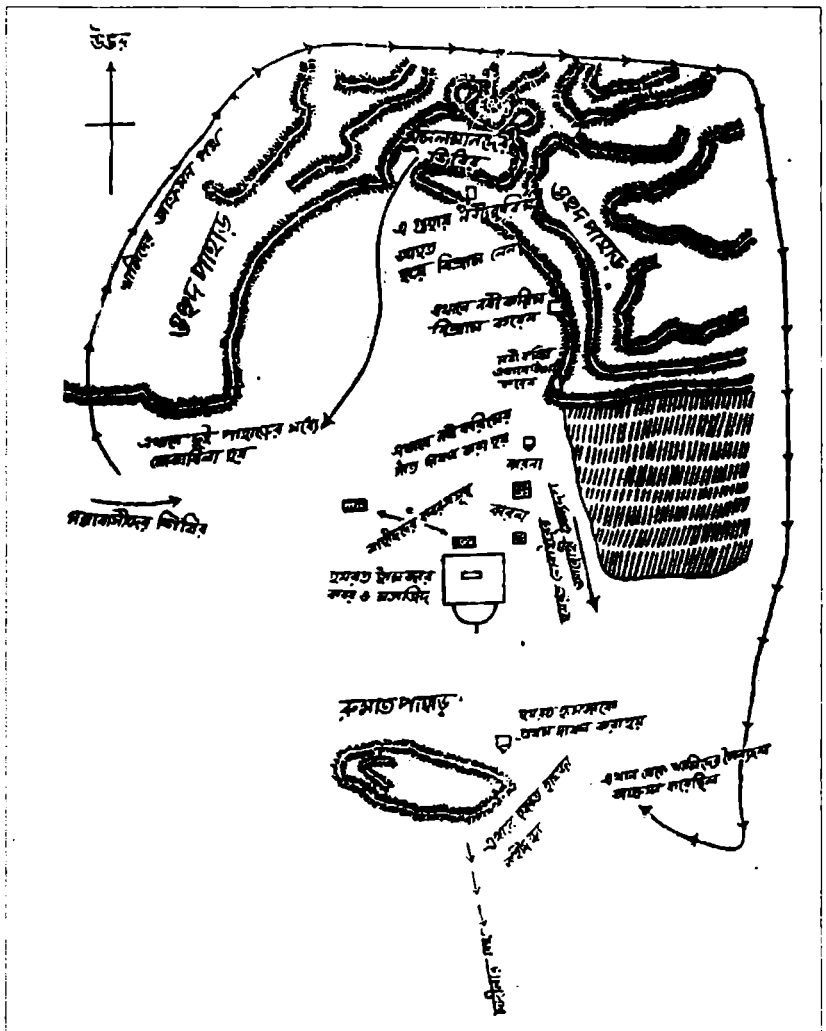

ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্রের নক্শা।

www.pathagar.com

সেখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইর-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ মোতায়েন করে দিলেন এবং তাদেরকে এ বলে তাকীদ করলেন যে, "কাউকেই আমাদের নিকটে আসতে দেবে না, কোন অবস্থায়ই এ স্থান ত্যাগ করবেনা। তোমরা যদি দেখ, পাখীরা আমাদের গোশত ছিঁড়ে খাচ্ছে, তবুও তোমরা এই স্থান হতে হটবে না।" এর পর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রথম দিকে মুসলমানদের জয় জয়কার ছিল, এমন কি বিরোধী বাহিনীতে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক বিজয়কে চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত করার পরিবর্তে মাঝখানেই মুসলমানগণ গনীমতের মালের লোভে পড়ে গেল ও তারা শত্রু পক্ষের ধন-মাল লুটবার কাজে লিপ্ত হল। ওদিকে যে তীরন্দাজদেরকে পশ্চাৎদিকে প্রতিরক্ষার কাজে নবী করীম (সঃ) নিযুক্ত করেছিলেন, তারা যখন শত্রুদের পলায়ন করতে ও গনীমতের মাল লুণ্ঠিত হতে দেখল তখন তারাও নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গনীমতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাদেরকে নবী করীম (সঃ) এর তাকিদী নির্দেশ স্মরন করে দিয়ে বিরত রাখতে যারপর নাই চেষ্টা করলেন, কিন্তু কয়েকজন ব্যতীত এর কেউই ফিরে থাকল না। এ সময় কাফের সৈনিকদের কমান্ডার খালিদ ইবনে অলীদ পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল এবং পাহাড়ের পশ্চাৎদিক হতে এসে পাশের ক্ষুদ্র পথ হতে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসল। আব্দুল্লাহ ইবেন জুবাইর অল্পসংখ্যক সাথীদের নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চাইলেন; কিন্তু রুখতে পারলেন না। ফলে শত্রু সৈন্যের এ সয়লাব মুসলমানদেরকে সহসা গ্রাস করে ফেলল। যেসব কাফের সৈনিক পলায়ন করে গিয়েছিল, তারাও এ সুযোগে ফিরে এসে এ আকস্মিক আক্রমণে যোগদান করল। এর ফলে যুদ্ধের মোড় অতি আকস্মিকভাবে ঘুরে গেল। এ আকস্মিক ও অভাবিতপূর্ব আক্রমণে মুসলমানগণ এতদূর হতাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়ল যে, তাদের একটি বিরাট অংশ পলায়নে তৎপর হল। তবুও কয়েকজন বাহাদুর সৈন্য ময়দানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছিল। এ সময় সহসা এ মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, নবী করীম (সঃ) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। এ সংবাদ সাহাবাদের অবশিষ্ট সাহস ও হুশ-জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত করে দিল। বাকী লোকেরা হুশ জ্ঞানশূন্য হয়ে একেবারে বসে পড়ল। এ সময় নবী করীম (সঃ) এর চতুষ্পার্শে মাত্র দশ বারজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ সিপাহী মওজুদ ছিলেন। নবী করীম (সঃ) নিজে আহত হয়েছিলেন। পরাজয় বরণের কোন কিছুই বাকি ছিল না। ঠিক এই সময়ই সাহাবাগণ জানতে পারলেন যে, নবী করীম (সঃ) জীবিত আছেন, তখন তাঁরা চারদিক হতে নবী করীম (সঃ)-এর চতুষ্পার্শে এসে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নিরাপদে পাহাড়ের উপর নিয়ে গেলেন। এ স্থানে একটি রহস্য আজও দুর্বোধ্যই রয়ে গিয়েছে যে, তখন কাফেরগণ অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করার পরিবর্তে নিজেরাই ময়দান ছেড়ে চলে গেল কেন? (কোন্ জিনিস তাদেরকে মুসলিম নিধন হতে বিরত রাখল?) মুসলমানরা তখন এতদূর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, পুনরায় সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কাফেরগণ যদি পূর্ণ বিজয়লাভে উদ্যোগী হত, তবে তাদের সাফল্য খুবই সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু তারা নিজেরাই কেন ময়দান ত্যাগ করে চলে গেল, তা আজও জানা যায়নি।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরান মজিদের সূরা আলে-ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনায় আল্লাহপাক বলেন, "(হে নবী মুসলমানদের নিকট সেই সময়ের কথা উল্লেখ কর) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজ ঘর থেকে বের হয়েছিলে এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে জায়গায় জায়গায় নিযুক্ত ও মোতায়েন করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথাই শোনেন এবং তিনি সবকিছুই ভাল করে জানেন। স্মরণ কর, তোমাদের মধ্য হতে যখন দুটি দল কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারীরূপে বর্তমান ছিলেন। আর ঈমানদার লোকদের তো খোদার উপরই ভরসা রাখা উচিত। ইতিপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তখন তোমরা খুবই দূর্বল ছিলে। অতএব খোদার না-শোকরী হতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশা করা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

এ গুহায় রসূল (সঃ) আহত হয়ে অবস্থান নেন

"স্মরণ কর, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলছিলে ঃ তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন? নিশ্চয়ই, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদাকে ভয় করতে থেকে কাজ কর, তবে যে মুহূর্তে শত্রুগণ তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তে তোমাদের খোদ (তিন হাজার নয়)-পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এ কথা আল্লাহ তোমাদেরকে সুসংবাদ হিসেবে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও ও তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়।

বস্তুত জয়লাভ ও সাহায্য যাহা কিছু হয়, তাহা সবই খোদার তরফ হতে হয়, যিনি বড়ই শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। (তিনি তোমাদেরকে এ জন্যেই সাহায্য দিবেন) যেন কুফরী-পথের পথিকদের একটি হাত কেটে যায় কিংবা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করবেন যে, তারা একেবারে ব্যর্থ হয়ে পশ্চাদপদ হয়ে যাবে।

"(হে নবী!) চূড়ান্তভাবে কোন কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোনই হাত নেই। আল্লাহ্রই ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা জালেম। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।"

www.pathagar.com

আমরা এখানে (ওহুদের ময়দানে) রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নিজ চাচা সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযাহ্ ও অন্যান্য শহীদের কবর জিয়ারত করে এখান থেকে প্রস্থান করলাম। উল্লেখযোগ্য যে, ওহুদের ময়দানের পূর্বের চিহ্ন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে বলে লক্ষ্য করলাম। পশ্চিম দিকে বিরাট আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এখানে অনেক বহুতলা ভবন, যা ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে সফরকালেও দৃষ্টি গোচর হয়নি।

ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের কবর ও মসজিদ

হযরত হামযাহ্ (রাঃ) ও তাঁর ভাগিনা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে ওহুদ পাহাড়ের দক্ষিণে, আররোমাহ পাহাড়ের উত্তর পশ্চিমে এবং কানাহ উপত্যকার উত্তর পাশে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ে দাফন করার কথা ইতিহাসে থাকলেও দেয়াল ও গ্রীল ঘেরা বিরাটকায় একটি কবরস্থানে শাহাদতপ্রাপ্ত অন্যান্য সত্তর জন সাহাবীর (রাঃ) কবরের পাশে আলাদাভাবেই হামযাহ্‌কে (রাঃ) দাফন করা হয়েছে বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। প্রবেশ দ্বারের কাছাকাছি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা একটি কবরস্থান অনেকে হযরত হামযাহ্‌র (রাঃ) কবর বলে দেখিয়েছেন।

এখানেই সংঘটিত হয়েছিল ওহুদের যুদ্ধ। যাতে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন।

ইতিহাসে উল্লেখিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের ৭০ জন শহীদের অধিকাংশকে হযরত হামযাহ্‌র কবরের উত্তরে দাফন করা হয়েছে। একাধিক শহীদকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে এবং অনেকের জন্যে দাফনের পর্যাপ্ত কাপড়ও পাওয়া যায়নি। তাই পরনের কাপড় সহ তাদেরকে দাফন করা হয়েছে। অদূরেই রয়েছে হামযাহ্‌র (রাঃ) স্মরণে নির্মিত একটি মসজিদ। হজ্ব ও ওমরা কারীগণ এখানে সফরকালে নফল নামাজ পড়ে থাকেন।

www.pathagar.com

মসজিদে কেবলাতাইনে

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান থেকে আমরা মসজিদে কিবলাতাইনে এলাম। দ্বিতল মসজিদ। মোটামুটি বড় সড়। এখানে আমরা কয়েক রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিলাম। দুই কিবলার স্মরণে বর্তমান মিম্বরের ঠিক উল্টাদিকে দেয়ালে (আরবীতে) নিম্নলিখিত আয়াত / কথাগুলো লিখা আছেঃ

"তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমরা দেখছি, এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। এখন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও, অতঃপর তুমি যেখানেই থাক না কেন, ওর দিকেই মুখ করে নামাজ পড়তে থাকবে" (সূরা বাকারা-১৪৪ আয়াত)।

ইংরেজীতে আরও লিখা রয়েছে ঃ

"Above verse descended to the Holy Prophet (Sm) in Almedina Al Monoara in which Allah, the Almighty has guided his Prophet (Sm) to turn his face from Baitul Maqdis to Makkah. So Makkah became Qibla of Muslims forever till the Day of Resurrection. Now no prayer is valid to any direction other than Makkah."

মসজিদে কেবলাতাইন

উল্লেখযোগ্য যে, কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত ছিল মূল নির্দেশ। দ্বিতীয় হিজরীর রজব বা সাবান মাসে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। নবী করীম (সঃ) এক সাহাবীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের ওয়াক্তে হুযুর (সঃ) ইমামরূপে নামাজ পড়ছিলেন। দু'রাকায়াত নামাজ শেষ হয়েছে, অকস্মাৎ তৃতীয় রাকায়াতে অহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযীল হয়। আর তখনই তিনি ও তাঁর অনুবর্তী জামায়াতের সকল সাহাবী বায়তুল মাকদাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ ফিরান। মদীনা ও তার চতুর্দিকে এই কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপক ঘোষণা প্রচার করা হয়।

কথিত আছে যে, বর্তমান কেবলাতাইন মসজিদের স্থানেই নবী (সঃ) উক্ত যোহরের নামাজ পড়ছিলেন এবং উল্লেখিত আয়াতটি এখানেই নাযিল হয়েছিল। মসজিদে দুই বিপরীত দিকে দুই মিহরাব তৈরী করা রয়েছে। পেছনের মেহরাবের স্থানেই উপরোক্ত আয়াতটি অংকিত আছে। কিবলা পরিবর্তনের আদেশের সাথে সাথে বিনা বাক্য ব্যয়ে সকল অনুসারী কর্তৃক নেতার এই নজিরবিহীন, আনুগত্য মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন

www.pathagar.com

যার পথ ধরেই একদিন মুসলিম মিল্লাত দিকে দিকে বিজয়ের ঝান্ডা উড্ডীন করেছিলেন।

খন্দকের ময়দানে

মসজিদে কেবলাতাইন থেকে আমরা খন্দকের ময়দানে উপস্থিত হলাম। বর্তমানে এখানে খন্দক ইত্যাদি নেই। খন্দক স্থলে রাস্তাঘাট হয়ে গেছে। কয়েকটি দোকান পাঠও লক্ষ্য করলাম, পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটি ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে। কয়েকটি মসজিদ ভেঙ্গে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বিগত সফরকালে মসজিদে ফতেহ, মসজিদে আবু বকর (রাঃ), মসজিদে সালমান ফারেসী (রাঃ) দেখেছিলাম। এবার সফরের সময় দেখলাম যে, উপরোক্ত মসজিদগুলোর কয়েকটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

মসজিদে ফাত্হ

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এ খন্দকের ময়দান মুসলমানদের বীরত্ব ও রণ কৌশলের এক অনন্য নজির হয়ে অবস্থান করছে। পরিখা খনন করে শত্রুর মোকাবিলা করার এমন ঘটনা ইতিপূর্বে ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত।

মসজিদগুলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে খন্দক যুদ্ধের স্মৃতির বিলুপ্তি ঘটবে বলে আশংকা হল। শুনা যায়, উপরোক্ত মসজিদগুলো যে সকল প্রসিদ্ধ সাহাবাগণের নামের স্মৃতি বহন করছিল তাঁরা সে সব স্থান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সে সব মসজিদে পাঞ্জেগানা নামাজ না হলেও জিয়ারতকারীগণ এখানে নফল নামাজ পড়ে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের নামে সালাম পেশ করার এবং তাঁদের বীরত্ব গাঁথা স্মরণ করে উজ্জীবিত হতে পারতেন।

শিশু ইসলামকে গলা টিপে নির্মূলে ও নিঃশেষ করার জন্যে মক্কার মুশরিক এবং মদীনার ইহুদী ও মুনাফিক সমাজ খন্দকে প্রচন্ডবেগে যেভাবে ধাবিত হয়েছিল তা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্পাকের সরাসরি সাহায্যের বরকতে এবং নবীপাক (সঃ) ও তাঁর সাথীদের বীরত্ব ও বিচক্ষণতার তোড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কারণ, আল্লাহ্পাকের ওয়াদা হচ্ছে "তিনি তাঁর আলোকে (ইসলামকে) পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খন্দকের ময়দানে রয়েছে সালমান ফারেসীর (রাঃ) নামে একটি মসজিদ। এখনো তা অক্ষত রয়েছে, সম্ভবত ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে। কথিত আছে যে, তাঁর পরামর্শেই খন্দক বা পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খন্দকের

www.pathagar.com

ময়দানে এলে এর পটভূমি ও এর পরিণতি প্রত্যেক মোমেনের মনকে নিঃসন্দেহে আন্দোলিত করবে।

পঞ্চম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের পটভূমি হলো, বনু নাযীর ও বনু ওয়াইলের ইহুদীদের একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল মক্কা গিয়ে কুরাইশদেরকে মদীনার ওপর হামলা চালিয়ে রসূলুল্লাহকে (সঃ) নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আহবান জানায় এবং এ কাজে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোক ছিল বনু নাযীর গোত্রের সালাম ইবনে আবুল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনানা ইবনে আবুল হুকাইক এবং ওয়াইল গোত্রের হাওযা ইবনে কায়েস ও আবু আম্মার। তারা আরবের বহু সংখ্যক গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে রসূলুল্লাহকে (সঃ) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করে। কুরাইশরা তাদেরকে বললো, "ইহুদীগণ, তোমরা প্রথম কিতাবের অধিকারী। আমাদের সাথে মুহাম্মাদের যে বিষয় নিয়ে মতভেদ, তা তোমরা ভাল করেই জানো। তোমরাই বলো আমাদের ধর্ম ভাল না মুহাম্মাদের ধর্ম ভাল?" তারা বললো, "তোমাদের ধর্ম মুহাম্মাদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরা সত্যের নিশানবাহী!"

মসজিদে সালমান ফারসী

তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার এই আয়াতগুলো নাযিল করেন, "তুমি কি সেই কিতাবধারীদের দেখোনি যারা মূর্তি ও খোদাদ্রোহী শক্তিকে মানে এবং কাফিরদেরকে মু'মিনদের চেয়ে বেশী সুপথপ্রাপ্ত বলে অবহিত করে? তারাই আল্লাহর অভিশাপগ্রস্ত। আর যারা আল্লাহর অভিশপ্ত তাদের কোন সাহায্যকারী কখনো মিলবে না। তাদের কি আল্লাহর রাজত্বে কোন অংশ আছে যে তারা মানুষকে তা থেকে কণামাত্রও দেবে না। নাকি তারা মানুষকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন অর্থাৎ নবুওয়াত তার ব্যাপারে হিংসা করে? আমি ইবরাহীমের বংশধরকে তো কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছি। তাদের কেউ কেউ তার ওপর ঈমান এনেছে আবার কেউ কেউ তা গ্রহণ করতে মানুষকে বাধা দিয়েছে। তাদের জ্বালানোর জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।"

ইহুদীরা যখন কুরাইশদের সম্পর্কে এরূপ কথা বললো তখন তাদের আনন্দ যেন আর ধরে না। অধিকন্তু তারা যখন রসূলুল্লাহর (সঃ) ওপর হামলা চালানোর আমন্ত্রণ জানালো তখন তারা তাতে একমত হলো এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। পরে ঐসব ইহুদী

www.pathagar.com

গাতফান গোত্রের কাছে গেল এবং তাদেরকে রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানালো। তাদের সাথে নিজেদের অংশ নেয়ার আশ্বাসও তারা দিল। তাদেরকে জানালো যে, কুরাইশরাও তাদের সাথে একমত হয়ে আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত হয়েছে।

যথাসময়ে কুরাইশ বাহিনী ও তাদের দলপতি আবু সুফিয়ান যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। গাতফানও বেরুলো বনু ফাজারা ও তার দলপতি উয়াইনা ইবনে হিসনকে সাথে নিয়ে। আর বনু মুররাকে সাথে নিয়ে হারেস ইবনে আওফ ইবনে আবু হারেসা ও আসজা গোত্রকে সাথে নিয়ে তার দলপতি মিসআর ইবনে রুখাইলা রওনা হলো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাত মদীনার চারপাশে খন্দক বা পরিখা খনন করালেন। মুসলমানরা যাতে সওয়াবের আশায় এই কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয় সে জন্যে তিনি নিজ হাতে পরিখা খননের কাজ করেন। তাঁর সাথে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে খননের কাজে যোগ দেয়। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অবিশ্রান্তভাবে এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কেবল কিছুসংখ্যক মুনাফিক রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানদের থেকে দূরে থাকে। তারা নানা রকমের ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে ও রসূলুল্লাহর (সঃ) অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে চুপিসারে বাড়ী চলে যেতে থাকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে কারো যদি মারাত্মক অসুবিধাও দেখা দিত এবং অনিবার্য প্রয়োজনে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে যাওয়ার দরকার পড়তো তা হলেও সে রসূলুল্লাহকে (সঃ) যথারীতি জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যেতো। রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমতি দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথেই তারা এসে অবশিষ্ট কাজে শরীক হতো। এভাবে তারা পুণ্যকর্মে আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিতো। আল্লাহ তায়ালা এসব মুমিনের প্রসঙ্গে সূরা নূরের এ আয়াত কয়টি নাযিল করেন ঃ

"মু'মিন তারাই-যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর রসূলের সাথে মিলিত হয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকলেও তাঁর অনুমতি না নিয়ে কোথাও যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে। হে নবী, তারা (মুমিনরা) তোমার কাছে তাদের কোন ব্যাপারে অনুমতি চাইলে তুমি তাদেরকে ইচ্ছা হলে অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।"

মুসলমানদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান, সৎকর্মের প্রতি আগ্রহী এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অনুগত, তাদেরকে লক্ষ্য করেই এই আয়াত কয়টি নাযিল হয়।

যেসব মুনাফিক নবীর (সঃ) অনুমতি না নিয়েই চুপে চুপে চলে যেতো তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

"তোমাদের প্রতি রসূলের আহবানকে তোমাদের পরস্পরকে আহবান করার মত মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের এইসব লোককে ভালভাবেই জানেন যারা আড়ালে আবডালে চুপে চুপে সরে পড়ে। রসূলের হুকুম অমান্যকারীদের এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের ওপর যে কোন মুহূর্তে মুসিবত কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

www.pathagar.com

আপতিত হতে পারে। মনে রেখো, আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহর। তোমরা কে সত্যের অনুসারী আর কে মিথ্যার অনুসারী তা তিনি ভালভাবেই অবহিত। আর যেদিন তাঁর কাছে তারা ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূর আয়াত-৬৪)

এই আয়াত কয়টিতে রাসূলের অনুমতি না নিয়ে তাঁর নির্দেশিত কাজ থেকে গোপনে সরে পড়া মুনাফিকদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) পরিখা খনন সম্পন্ন করতেই কুরাইশরা কিনানা গোত্র, তিহামার অধিবাসী ও তাদের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন মিলিয়ে সর্বমোট দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে এসে পৌঁছলো। তারা রুমা নামক স্থানে জুরুফ ও জুগাবার মধ্যবর্তী মুজতামাউল আসইয়ালে শিবির স্থাপন করলো। গাতফান গোত্রের লোকেরাও তাদের নাজদবাসী মিত্রদের নিয়ে হাজির হলো। তারা ওহুদের পার্শবর্তী 'জাম্ব নাকমা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলো। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) তিন হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে 'সালা' নামক পাহাড়কে পেছনে রেখে মুসলিম বাহিনীকে মোতায়েন করলেন। তাঁর ও শত্রুদের মাঝে থাকলো পরিখা। শিশু ও নারীদেরকে তিনি আগে ভাগেই দূর্গের মধ্যে রেখে আসার ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহর দুশমন বনু নাযীর গোত্রের হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কুরাইযার কা'ব ইবনে আসাদের কাছে গেল। বনু কুরাইযার সাথে রাসূলুল্লাহর আপোষ ও অনাগ্রাসন চুক্তির সংগঠক ছিল এই কা'ব ইবনে আসাদ। সে বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহকে (সঃ) শান্তির অঙ্গীকার দেয় ও চুক্তি সম্পাদন করে। কা'ব ভেতরে বসেই হুয়াইয়ের আগমন টের পেয়ে তার মুখের ওপর দূর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। হুয়াই দরজা খুলতে বললে সে দরজা খুলতে অস্বীকার করে। হুয়াই পুনরায় দরজা খুলতে অনুরোধ করলে কা'ব বললো. "ধিক্ তোমাকে হুয়াই, তুমি একটা অলক্ষুণে লোক। আমি মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং সে চুক্তি আমি ভঙ্গ করবো না। আমি মুহাম্মাদের আচরণে প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয়ই পেয়েছি।"

হুয়াই বললো, "কি হলো! দরজাটা একটু খোল না। আমি তোমার সাথে কিছু আলাপ করবো।" কা'ব বললো, "আমি দরজা খুলতে পারবো না।" হুয়াই বললো, "তোমার খাদ্য গ্রহণ করবো মনে করেই তুমি দরজা বন্ধ করেছো।" এ কথায় কা'ব অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল এবং দরজা খুলে দিল। অতঃপর সে বললো, "আমি তোমার জন্যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব এবং উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র এনে হাজির করেছি। নেতা ও সরদার সহ সমস্ত কুরাইশ বাহিনীকে আমি জড়ো করেছি এবং তাদেরকে রুমা অঞ্চলের মুজতামাউল আসইয়ালে এনে হাজির করেছি। অপরদিকে গোটা গাতফান গোত্রকেও তাদের নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ ওহুদের পার্শ্ববর্তী 'জাঘনাকমা'য় এনে দাঁড় করিয়েছি। তারা সবাই আমার সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হবে না।" কা'ব বললো, "তুমি বরং আমার মুখে চুনকালি মাখানোর আয়োজনই করেছো। তুমি এমন মেঘমালা সমবেত করছো যা বৃষ্টি বর্ষণ করে পানি শূন্য হয়েছে। এখন তার শুধু তর্জন গর্জন সার। তার দেয়ার মত কিছুই নেই। অতএব, হে হুয়াই, ধিক তোমাকে! আমাকে

www.pathagar.com

উত্যক্ত করোনা। যেমন আছি থাকতে দাও। মুহাম্মাদ আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি। সে শুধু সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি পরায়ণতারই পরিচয় দিয়েছে।" তথাপি হুয়াই নাছোড়বান্দা হয়ে কা'বের সাথে লেগে রইলো। সে তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে নাড়তে থাকলো এবং অবশেষে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে রাজি করাতে সক্ষম হলো। সে তার নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করতে সক্ষম হলো। সে বললো যে, কুরাইশ ও গাতফান যদি মুহাম্মাদকে হত্যা না করেই ফিরে যায় তাহলে সে কা'বের সাথে তার দূর্গে অবস্থান করবে এবং উভয়ে পরস্পরের সুখ দুঃখের সম অংশীদার হবে। এভাবে কা'ব রসূলুলাহ (সঃ) সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করলো।

রসূলুলাহ (সঃ) ও মুসলমানদের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি আওস গোত্রের তৎকালীন নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায ইবনে নু'মান (রাঃ), খাযরাজের নেতা সাদ ইবনে উবাদা ইবনে দুলাইম (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ও খাওয়াত ইবনে যুবাইরকে (রাঃ) পাঠালেন। তাদেরকে বলে দিলেন, "তোমরা গিয়ে দেখো, যে খবরটা পেয়েছি তা সত্য কিনা, যদি সত্য হয় তাহলে ফিরে এসে সংকেতমূলক ধ্বনি দিয়ে আমাকে জানাবে। প্রকাশ্যে বলে সাধারণ মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দিওনা। [redacted] যদি তারা চুক্তির অনুগত থাকে তাহলে ফিরে এসে সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে।"

তারা গিয়ে দেখলেন কা'ব ও হুয়াই এবং তাদের সাঙ্গ পাঙ্গরা যে রকম জানা গিয়েছিলো তার চেয়েও জঘন্য মনোভাব পোষণ করছে রসূলুলাহ (সঃ) বিরুদ্ধে। তারা বললো, "রসূলুলাহ (সঃ) আবার কে? মুহাম্মাদের সাথে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই।" একথা শুনে সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) তাদের তিরস্কার করলেন। জবাবে তারাও তাকে পাল্টা তিরস্কার করলো। বস্তুতঃ সা'দ ইবনে মুয়ায একটু চড়া মেজাজের লোক ছিলেন। সা'দ ইবনে উবাদা তাকে বললেন, "তিরস্কার বাদ দিন। আমাদের ও তাদের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে, তা তিরস্কারের চেয়ে অনেক বেশী।" এরপর উভয় নেতা ও তাদের সঙ্গীদ্বয় রসূলুলাহ (সঃ) এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, "আজাল ও কারা।" অর্থাৎ আজাল ও কারার লোকেরা সাহাবী খুবাইব ও তাঁর সঙ্গীদের (রাঃ) প্রতি রাজী'তে যে রূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, এরাও সেই পথ ধরেছে। তা শুনে রসূলুলাহ (সঃ) বললেন, "আল্লাহু আকবার। হে মুসলমানগণ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

এই সময় মুসলমানদের ওপর আপতিত দুর্যোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। তাদের মধ্যে ভীতি প্রবল হয়ে উঠলো। চারদিক থেকে শত্রুরা তাদের ওপর নানাভাবে আক্রমন চালাতে থাকে। মু'মিনদের মনে নানা রকমের চিন্তা-ভাবনা ঘুরপাক খেতে থাকলো। মুসলিম দলভূক্ত মুনাফিকদের মুনাফেকীও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। মুআত্তিব ইবনে কুশাইর তো বলেই ফেললো, "মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, আমরা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-দৌলতের মালিক হয়ে যাবো। অথচ আজ অবস্থা এই যে, আমরা নিরাপদে পায়খানায় যেতেও পারছিনা।" আওস ইবনে কায়যী বললো, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের বাড়ী-ঘর তথা পরিবার-পরিজন অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। (অর্থাৎ তাদেরই গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে হুমকি

www.pathagar.com

আসছে।) অতএব আমাদেরকে বাড়ীতে ফিরে যেতে দিন। কেননা আমাদের বাড়ীঘর মদীনার বাইরে অবস্থিত।" এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুশরিকরা বিশ দিনের বেশী এবং এক মাসের কম সময় পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান করলেন। দুই পক্ষের মধ্যে তীর নিক্ষেপ ও অবরোধ ছাড়া আর কোন রকম যুদ্ধ হয়নি।

মুসলমানদের (অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুণ) দুঃখ-কষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ (সঃ) গাতফান গোত্রের দুইজন নেতা উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারেস ইবনে আওফের কাছে এইমর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তারা যদি তাদের লোকজন নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) বিরুদ্ধে এই অবরোধ ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তিনি তাদেরকে মদীনার পুরা উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ দিবেন। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও গাতফানীদের মধ্যে সন্ধি হলো এবং সন্ধির দলিল লেখা হলো। কেবল স্বাক্ষর দান ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণের কাজ বাকী রইলো। তবে লেনদেনের ব্যাপারে উভয় পক্ষের দরকষাকষি ও সম্মতি দানের কাজটা চূড়ান্ত করা হলো। অবশিষ্ট কাজটুকু করার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাদ ইবনে মু'য়ায ও সাদ ইবনে উবাদাকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদেরকে বিষয়টা অবহিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। উভয়ে বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ), এটা কি আমাদের কল্যাণার্থে আপনার নিজের প্রস্তাব, না আল্লাহ আপনাকে এজন্যে নির্দেশ দিয়েছেন যা আমাদের করতেই হবে?" তিনি বললেন, "এটা আমার নিজেরই উদ্যোগ। কারণ আমি দেখছি গোটা আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে এবং সবদিক দিয়ে তোমাদের ওপর দুর্লংঘ্য অবরোধ আরোপ করেছে। তাই যতটা পারা যায় আমি তাদের শক্তি চূর্ণ করতে চাচ্ছি।"

সা'দ ইবনে মুয়ায বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ), ইতিপূর্বে আমরা এবং এসব লোক শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। তখন আমরা আল্লাহকে চিনতাম না এবং আল্লাহর ইবাদতও করতাম না। সে সময় তারা মেহমানদারীর অথবা বিক্রয়ের সূত্রে ছাড়া আমাদের একটা খোরমাও খেতে পারেনি। আর আজ আল্লাহ যখন আমাদেরকে ইসলামের গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করেছেন, সত্যের পথে চালিত করেছেন, তখন তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ দিতে হবে? আল্লাহর কসম, আমাদের এ সবের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, তরবারীর আঘাত ছাড়া তাদেরকে আমরা আর কিছুই দেবোনা। এভাবেই আল্লাহ তাদের ও আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেবেন।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "বেশ, তাহলে এ ব্যাপারে তোমার মতই মেনে নিলাম।" এরপর সা'দ ইবনে মুয়ায চুক্তিপত্র খানা হাতে নিয়ে সমস্ত লেখা মুছে ফেললেন। এরপর তিনি বললেন, "ওরা যা পারে করুক!"

রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানগণ শত্রুর অবরোধের ভেতরে অবস্থান করতে লাগলেন। কোন যুদ্ধই হলোনা। অবশ্য আমর ইবনে আব্‌দে উদ, ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, হুবাইরা ইবনে আবু ওয়াহাব ও দিরার ইবনে খাত্তাব প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ অশ্বারোহী যুদ্ধ শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। তারা ঘোড়ায় চড়ে বনু কিনানার কাছে এসে বললো, "হে বনু কিনানা, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আজ দেখবে যুদ্ধে কারা বেশী পারদর্শী!" অতঃপর তারা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল এবং পরিখার কিনারে গিয়ে

www.pathagar.com

থামলো। পরিখা দেখে তারা হতবাক হয়ে বললো, "আল্লাহর কসম, এটা এমন একটা যুদ্ধ কৌশল যা আরবরা কখনো উদ্ভাবন করতে পারেনি।"
অতঃপর পরিখার সবচেয়ে কম প্রশস্ত জায়গা দেখে তারা পরিখা পার হলো। ঘোড়ায় চড়ে তারা সালা পর্বত ও পরিখার মধ্যবর্তী মুসলমানদের অবস্থানে যেয়ে হাজির হয়। আলী (রাঃ) কতিপয় মুসলমানকে সাথে নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে যান এবং যে উন্মুক্ত স্থানটি দিয়ে কাফিররা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল সেখানেই তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ান। অশ্বারোহীরা তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

'আমর ইবনে আব্দে উদ বদর যুদ্ধে আহত হয়ে এতটা অচল হয়ে গিয়েছিল যে, উহুদ যুদ্ধে হাজির হতে পারেনি। সে নিজের মর্যাদা জাহির করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ প্রতীক দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করে এসেছিল। সে এসেই হুংকার দিল, "কে লড়াই করবে আমার সাথে?" আলী (রাঃ) তার সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "হে আমর, তুমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিলে যে, কুরাইশদের কোন লোক তোমাকে যেকোন দুইটি কাজের একটির দিকে দাওয়াত দেবে, তুমি তা গ্রহণ করবে। সত্য কিনা?" সে বললো, 'হ্যাঁ' আলী (রাঃ) বললেন, "তাহলে আমি তোমাকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি।"

সে বললো, 'এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।' আলী বললেন, "তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের দাওয়াত দিচ্ছি।" সে বললো, "তা কেন ভাতিজা, আমি তো তোমাকে হত্যা করতে চাইনা।" আলী (রাঃ) বললেন, "কিন্তু আমি তো তোমাকে হত্যা করতে চাই।" একথা শুনে আমর উত্তেজিত হলো। সে ঘোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রথমে ঘোড়াকে হত্যা করলো এবং তার মুখে আঘাত করলো। অতঃপর আলীর (রাঃ) দিকে এগিয়ে এলো। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। অবশেষে আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করলেন।

এরপর তার ঘোড়সওয়ার দলটি পরাজিত হয়ে পরিখা পেরিয়ে পালিয়ে গেল। আমর নিহত হওয়ায় হতাশ হয়ে আবু জাহল তনয় ইকরিমা তার বর্শা ফেলে দিয়ে পালালো। তা দেখে মুসলিম কবি হাসসান ইবনে সাবিত বললেনঃ "সে পালিয়ে গেল এবং আমাদের জন্যে তার বর্শা ফেলে রেখে গেল।

হে ইকরিমা, তুমি এমন ভান করেছো যেন (যুদ্ধ) করোনি।
তুমি নর উটপাখির মত উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছো।
ভাব খানা এই যে, তুমি যেন রাস্তা থেকেই আলাদা হয়েছো
তুমি আপোষের মনোভাব নিয়ে একটুও পেছনে ফেরনি।
(তোমার পালানো দেখে) তোমার পিঠ হায়েনার পিঠ বলে মনে হচ্ছিলো।"

খন্দক ও বনু কুরাইযার যুদ্ধে রসূলুল্লাহর (সঃ) সাহাবীগণের সংকেত ধ্বনি ছিল "হুম্মা, লা-ইউনছারুন।" অর্থাৎ শত্রুপক্ষের পরাজয় অবধারিত। শত্রুদের শক্তি ও পরাক্রম এবং অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক্যের চাপে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণকে প্রচন্ড ভয় ও ত্রাসের মধ্যে রণাঙ্গনে টিকে থাকতে হয়েছিলো।

www.pathagar.com

অবশেষে নাঈম ইবনে মাস'উদ নামক গাতফান গোত্রের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট এসে বললো, "ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে আমার গোত্র এ কথা জানেনা। এখন আপনি আমাকে প্রয়োজনীয় যে কোন নির্দেশ দিন।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "আমাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে শত্রুপক্ষের বিশ্বাসভাজন। তুমি যদি পার, আমাদের পক্ষ হয়ে শত্রুদের পর্যুদস্ত করো। যুদ্ধ তো কৌশলেরই নামান্তর।"

নাঈম ইবনে মাস'উদ বনু কুরাইযা গোত্রের কাছে গেলেন। জাহিলী যুগে তিনি তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "হে বনু কুরাইযা, আমি তোমাদের কত ভালবাসি তা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। বিশেষ করে তোমাদের সাথে আমার যে নিখাদ সম্পর্ক রয়েছে, তা তোমাদের অজানা নয়।" তারা বললো "হাঁ, এ কথা সত্য। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কখনো কোন অভিযোগ ছিল না।" তখন তিনি বললেন, "কোরাইশ ও গাতফানের অবস্থা তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র। এ শহর তোমাদেরই শহর। এখানে তোমাদের স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পদ রয়েছে। এগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোরাইশ ও গাতফান মুহাম্মাদ ও তাঁর সভহাবীদের সাথে লড়তে এসেছে। তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করছো। অথচ তাদের আবাসভূমি, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন অন্যত্র রয়েছে। সুতরাং তারা তোমাদের মত অবস্থায় নেই। তারা যদি এখানে স্বার্থ দেখতে পায় তাহলে তারা তা নিবেই। আর যদি না পায় তবে নিজেদের আবাসভূমিতে চলে যাবে। তখন তোমরা এই শহরে একাকী মুহাম্মাদের সম্মুখীন হবে। সে অবস্থায় তার বিরুদ্ধে তোমরা টিকতে পারবেনা। অতএব মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে হলে আগে কোরাইশদের মধ্য হতে কতিপয় নেতাকে জিম্মী হিসেবে হাতে নাও। তারা তোমাদের হাতে জামানত হিসেবে থাকবে। তখন তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমরা মুহাম্মাদের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজিত করতে পারবে। এ ব্যবস্থা না করে মুসলমানদের সাথে লড়াই করা তোমাদের ঠিক হবে না।" তারা বললো, "তুমি ঠিক পরামর্শ দিয়েছো।"

এরপর তিনি কুরাইশদের কাছে গিয়ে আবু সুফিয়ান ও তার সহযোগী কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, আমি তোমাদের পরম হিতাকাঙ্খী এবং মুহাম্মাদের ঘোর বিরোধী। আমি একটা খবর শুনেছি। সেটা তোমাদেরকে জানানো আমার কর্তব্য ও তোমাদের হিত কামনার দাবী। কথাটা তোমরা কারো কাছে প্রকাশ করোনা।" তারা বললো, "ঠিক আছে, আমরা তা কারো কাছে প্রকাশ করবো না।"

নাঈম বললেন, "তাহলে শোনো। ইহুদীরা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে অনুতপ্ত হয়েছে। তারা মুহাম্মাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে যে, আমরা যা করেছি তার জন্যে অনুতপ্ত। এখন আমরা যদি কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে পাকড়াও করে তোমার কাছে হস্তান্তর করি আর তুমি তাদের হত্যা করো তাহলে কি তুমি আমাদের প্রতি খুশী হবে? এরপর আমরা তোমার সাথে মিলিত হয়ে কুরাইশ ও গাতফানের অবশিষ্ট সবাইকে খতম করবো।' একথায় মুহাম্মাদ রাজী হয়েছে।" নাঈম আবু সুফিয়ানকে আরো বললেন, "ইহুদীরা যদি

www.pathagar.com

তোমাদের কতিপয় লোককে জিম্মী রাখতে চায় তা হলে খবরদার একটি লোকও তাদের হাতে সমর্পণ করোনা।"

এরপর নাঈম গাতফানীদের কাছে গিয়ে বললেন, "হে বনু গাতফান, তোমরাই আমার স্বগোত্র ও আপনজন। তোমরা আমার কাছে সবার চাইতে প্রিয়। মনে হয়, আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ নেই।" তারা বললো, "তুমি সত্য বলছো। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই।" নাঈম বললেন, "তাহলে আমি যে খবর দিচ্ছি তা কাউকে জানতে দিওনা।" তারা বললো, "ঠিক আছে। তোমার কথার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।" নাঈম তখন তাদেরকে অবিকল কোরাইশদের কাছে যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন এবং জিম্মীর প্রশ্নে কোরাইশদের কাছে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন গাতফানীদের কাছেও তাই উচ্চারণ করলেন।

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের শনিবারের পূর্ব রাত্রের ঘটনা। আল্লাহতায়ালা স্বীয় রসূলের সপক্ষে গোটা পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন করে দিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও গাতফান গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের নেতৃত্বে কোরাইশ ও গাতফানীদের একটি দল পাঠালো বনু কুরাইযার কাছে। তারা গিয়ে বনু কুরাইযাকে বললো, "আমরা আর তিষ্ঠাতে পারছিনা। আমাদের উট-ঘোড়া সব মারা যাচ্ছে। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আমরা মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধ করে চূড়ান্ত একটা ফায়সালা করে নিতে চাই।" তারা বললো, "আজ শনিবার। এই দিন আমরা কিছুই করি না। ইতিপূর্বে আমাদের কিছু লোক শনিবারে একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলো। তার ফলে যে পরিণতি হয়েছিলো তা তোমাদের অজানা নয়। তাছাড়া আমরা তোমাদের সহযোগিতা করার জন্যে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবোনা। তবে তোমরা যদি তোমাদের কিছু লোককে আমাদের হাতে নিরাপত্তার রক্ষা কবচ হিসেবে জিম্মী রাখো তাহলে তোমাদের সহযোগিতা করতে যুদ্ধে অংশ নিতে পারি। আমাদের আশংকা হয় যে, যুদ্ধে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা যুদ্ধ অব্যাহত রাখা কঠিন মনে করলে তোমরা আমাদের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে মুহাম্মাদের মুঠোর মধ্যে অসহায়ভাবে রেখে নিজ দেশে ফিরে যাবে। অথচ মুহাম্মাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

বনু কুরাইযার এই জবাব নিয়ে প্রতিনিধিদল যখন ফিরলো তখন কোরাইশ ও গাতফানীরা পরস্পরকে বললো, "নাঈম ইবনে মাসউদ আমাদেরকে যে খবর দিয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব বনু কুরাইযাকে জানিয়ে দেয়া হোক যে, আমরা তোমাদের কাছে একজন লোকও জিম্মী হিসেবে সমর্পণ করতে রাজী নই। যুদ্ধ করার ইচ্ছে থাকেতো এস যুদ্ধ করো।" কোরাইশ ও গাতফানীদের এ জবাব নিয়ে পুনরায় বনু কুরাইযার কাছে দূত গেলে বনু কুরাইযার নেতারা পরস্পরকে বললো, "দেখলে তো নাঈম যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য। কোরাইশ ও গাতফানীরা শুধু যুদ্ধই চায়। আমাদের ভালোমন্দ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তারা যদি লাভবান হয় তাহলে তো তাদেরই স্বার্থ উদ্ধার হলো। অন্যথায় তারা আমাদেরকে মুহাম্মাদের হাতে অসহায় ভাবে রেখে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে।"

কাজেই তারা কোরাইশ ও গাতফানীদের জানিয়ে দিল যে, "যতক্ষণ না তোমরা আমাদের হাতে জিম্মী না দেবে ততক্ষণ আমরা তোমাদের সহযোগী হয়ে মুহাম্মাদের

www.pathagar.com

সাথে যুদ্ধ করবো না।" এভাবে তারা গাতফান ও কোরাইশদের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখান করলো এবং শত্রুদের ভিতরে আল্লাহ কোন্দল সৃষ্টি করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিলেন। তদুপরি সেই প্রচন্ড শীতের রাতে আল্লাহ তাদের উপর অত্যন্ত ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করলেন। সে বাতাস তাদের তাঁবু ফেলে দিল এবং রান্নার আসবাবপত্র তছনছ করে দিল।

রসূলুলাহ (সঃ) এর নিকট তাদের এই কোন্দল ও বিভেদের খবর পৌঁছলে তিনি সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে রাতের বেলা শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে পাঠালেন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী থেকে বর্ণিত, জনৈক কুফাবাসী সাহাবী হুযাইফা ইবনে ইয়ামানকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি রসূলুলাহ (সঃ) কে দেখেছেন ও তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন?" তিনি বললেন, 'হাঁ'। সে বললো, "আপনারা তাঁর সাথে কি রকম ব্যবহার করতেন।" হুযাইফা বললেন, "আমরা তাঁর জন্যে যথাসাধ্য পরিশ্রম করতাম।" কুফাবাসী লোকটি বললো, "খোদার কসম, আমরা যদি তাঁকে জীবিত পেতাম তাহলে তাঁকে মাটিতে হেঁটে চলতে দিতামনা, বরং ঘাড়ে চড়িয়ে রাখতাম।" হুযাইফা (রাঃ) বললেন, ভাতিজা, শোনো। রসূলুলাহ (সঃ) এর আমরা পরিখায় ছিলাম। তিনি রাতের একাংশ নামায পড়ে কাটালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে শত্রুদের গতিবিধির খোঁজ নিয়ে আবার আসতে পারে? আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করছি, সে যেন জান্নাতে আমার সাথী হয়!" রসূলুলাহ (সঃ) কাজ সেরে ফিরে আসার শর্ত আরোপ করছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে কেউ-ই ভয়, শীত ও ক্ষুধার দরুণ যাওয়ার শক্তি পাচ্ছিলোনা। কেউ যখন প্রস্তুত হলো না তখন রসূলুলাহ (সঃ) আমাকে ডাকলেন। ফলে আমাকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতেই হলো। তিনি বললেন, "হে হুযাইফা, যাও শত্রুদের ভেতরে যাও, তারপর দেখো তারা কি করছে। আমাদের কাছে ফিরে না এসে তুমি কোন কিছু ঘটিয়ে বসোনা যেন।"

এরপর আমি গেলাম এবং সন্তর্পনে শত্রু বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তখনো বাতাস ও আল্লাহর অদৃশ্য সৈন্যরা তাদেরকে হেস্তনেস্ত করে চলেছে। তাদের তাঁবু ও রান্নার হাঁড়ি পাতিল সবই লন্ডভন্ড হ'য়ে গেছে এবং আগুন নিভে গেছে।

তখন আবু সুফিয়ান তাদের বললো, "হে কুরাইশগণ, তোমরা প্রত্যেকে নিজের আশেপাশে খেয়াল করে দেখো, অন্য কেউ আছে কিনা।" একথা শোনার পর আমিই প্রথম পার্শ্ববর্তী লোকের গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?" সে বললো, "অমুকের ছেলে অমুক।"

পরে আবু সুফিয়ান আরো বললো, "হে কুরাইশগণ, তোমরা যে স্থানে অবস্থান করছো সে স্থান আর অবস্থানের যোগ্য নেই। আমাদের উট-ঘোড়াগুলো মরে গেছে। আর বনু কুরাইযা আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। আমরা যা অপছন্দ করি তারা তাই করেছে। প্রচন্ড ঝড় বাতাসে আমাদের কি দশা হয়েছে তা দেখতেই পাচ্ছ। আমাদের রান্নার সাজ সরঞ্জাম, তাঁবু ইত্যাদি লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। এমনকি আগুনও নিভে গেছে। অতএব তোমরা সবাই নিজ বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করো। আমি রওনা হচ্ছি।"

www.pathagar.com

একথা বলেই সে তার উটের দিকে এগিয়ে গেল। উটটি ছিল বাঁধা। সে সেটির পিঠে উঠে বসলো। অতঃপর সেটিকে আঘাত করলো। তিনবার আঘাত করার পর সেটি লাফিয়ে উঠলো। উটটার বাঁধন খুললেও সেটি দাঁড়িয়েই ছিল। রসূলুলাহ (সঃ) যদি আমাকে নির্দেশ না দিতেন যে, "ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কিছু ঘটিয়ে বসবে না" তাহলে আমি ইচ্ছা করলেই তাকে হত্যা করতে পারতাম।

হুযাইফা বললেন, এরপর আমি রসূলুলাহ (সঃ) এর কাছে ফিরে গেলাম। তখন তিনি একটি ইয়ামানী কম্বল গায়ে জড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই তিনি আমাকে দেখে পায়ের কাছে টেনে নিলেন এবং কম্বলের একাংশ আমার গায়ের উপর তুলে দিলেন। এই অবস্থায়ই তিনি রুকু ও সিজদা করলেন। সালাম ফিরানোর পর আমি তাঁকে শত্রুদের সব খবর জানালাম। গাতফানীরা কুরাইশদের ফিরে যাওয়ার কথা জানতে পেরে স্বদেশ ভূমির পথে রওনা হলো।

সকাল বেলা রসূলুলাহ (সঃ) ও মুসলমানগণ পরিখা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন এবং অস্ত্র রেখে দিলেন।

বর্তমানে খন্দক বা পরিখার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। এ ব্যাপারে আলী হাফেজ বলেছেন, ঐতিহাসিক তথ্য সমূহের আলোকে এবং সামহুদীও যা সমর্থন করেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পূর্ব হাররার শেষ প্রান্তের আজমাতুশ শেখান থেকে পরিখা খননের নির্দেশ দেন। সেখান থেকে তা বনি ওবায়েদ পাহাড় পর্যন্ত খনন করা হয় যা মসজিদে আলফতেহ্ এর পশ্চিমে উত্তর পশ্চিম হাররার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কুবা মসজিদে

খন্দকের ময়দান সফর শেষে আমরা কুবা মসজিদে হাযির হলাম। এ-ই সেই মুসলিম জাহানের প্রথম মসজিদ যাতে সাহাবীগণ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ও নির্ভয়ে জামায়াতে নামাজ পড়তে পেরেছিলেন এবং যা নির্মাণে নবী (সঃ) প্রথম স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। হাদীসে রয়েছে এ মসজিদে দু'রাকাত নফল নামাজ এক ওমরা হজ্বের সমতূল্য। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "নিশ্চয়ই তা এমন

www.pathagar.com

মসজিদ যা তাকওয়ার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (সূরা তওবা।)
কথিত আছে, কুবা থেকেই নবী পাককে (সঃ) মদীনায় হিজরতকালে প্রথম দৃষ্টি গোচর হয় এবং মদীনাবাসী এখানেই নবী পাককে (সঃ) উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। নবীপাকের (সঃ) কুবা উপস্থিতি ও কুবা মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরন রয়েছে।

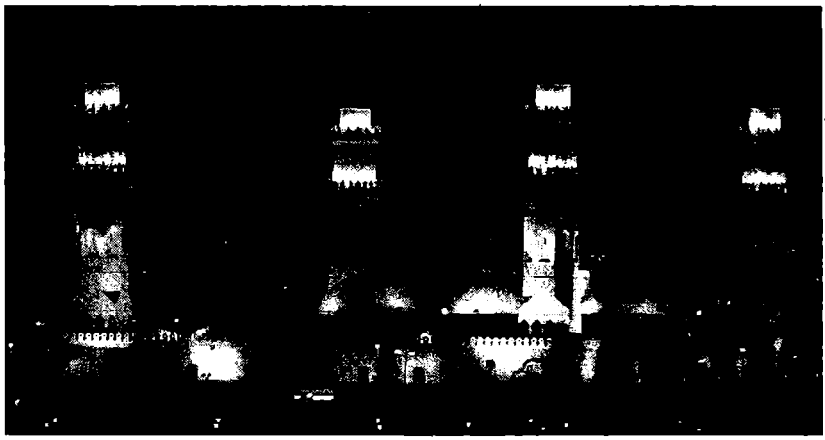

মসজিদে কুবা

বারই রবিউল-আউয়াল সোমবার। লোকজন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে ঐ দিনেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাদেরকে ফিরতে হল। তখন জনৈক য়াহুদী চরম ঔৎসুকবশত গৃহের ছাদের উপর উঠে তাঁর আগমন পথ লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি বহু দূরে সাদা যেন কিসের উপর পড়ল। তাঁদের দেহে হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর প্রদত্ত শ্বেত বস্ত্র ছিল। প্রথম তার মনে হল, বুঝিবা মরীচিকার কুহকিনী মায়াজাল তার সঙ্গে খেলা করছে। দূর থেকে মনে হল যেন অনন্ত মরীচিকার সফেন সমুদ্র বুকে একটি মায়াময়ী তরংগ রেখা, যেন একখানি ক্ষুদ্র তরণী উত্তাল তরঙ্গের তালে তালে দুলছে, উঠা পড়া করছে। ক্ষনিক পরে তার ঐ ভ্রম দূর হল। সে দেখল ধূলা উড়ছে। তাই সে যথাসাধ্য উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলঃ আরবগণ! যাঁর অপেক্ষায় তোমরা আকুল আগ্রহে কাল কাটাচ্ছ তিনি ঐ যে!
প্রচন্ড মার্তন্ড তাপে দুনিয়া জ্বলছে, মানুষ পশুপাক্ষী বের হতে অক্ষম, আর আমাদের নবী সারওয়ারে কায়িনাত আহমদ মুযতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) মরু সমুদ্র সাঁতার কেটে অগ্রসর হচ্ছেন।
য়াহুদীর চীৎকার শুনামাত্র মৃত জনপদ সজীব হয়ে উঠল, মরুবুকে আনন্দ বন্যা বয়ে চলল। নবীর আগমন, নবীর অভ্যর্থনা, গৃহে গৃহে সাজ সাজ রব! রাজ অতিথির রাজ সম্বর্ধনা, পলকেই সমগ্র কুবা সামরিক কায়দায় সজ্জিত, প্রত্যেকের সংগেই সামরিক সজ্জা। তারা প্রস্তরময় প্রান্তরেই যেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ঐ স্থানেই একটি খর্জুর বৃক্ষের ছায়ায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সহচর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) অবতরণ করলেন। লোকজন তাঁদেরকে ঘিরে দাঁড়াল। বহু লোকই রসূলুল্লাহ (সঃ) কে ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

দেখে নাই। তাঁরা তাঁকে সম্যক চিনতে পারল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে লোকজনের সাথে বাক্য বিনিময় করছিল। তাঁরা মনে করলেন যে, তিনিই রসূলুল্লাহ (সঃ) কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বয়সে বড় হলেও হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বাহ্যত বৃদ্ধ দেখাত এবং তাঁকে অধিকতর কম বয়স্ক বলে মনে হত। উভয়ের আকৃতি এবং প্রকৃতিতে অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। সূর্য যতই মাথার উপর আসতে লাগল ততই ছায়া সরে যেতে লাগল। পবিত্র দেহে রৌদ্র পড়ছে দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের চাদর রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর ধরে ছায়া দিতে লাগলেন। তখন সকলেই রসূলুল্লাহ (সঃ) কে চিনতে পারলেন।

আনসারগণ অতিথিদ্বয়কে সম্বোধন করে বলল ঃ আপনারা উষ্ট্রে আরোহণ করুন এবং নিরাপদে ও শান্তিতে প্রবেশ করুন। তখন তিনি সকলকে নিয়ে ডান দিকে ঘুরে বনি আমর-বিন-আওফের বসতিতে উপস্থিত হলেন এবং কুলসুম-বিন-হাদম (রাঃ)-এর গৃহে অবতরণ করলেন। সেই গৃহে লোকজনের স্থান হত না। তাই তিনি পার্শ্ববর্তী গৃহে এসে লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এই গৃহের মালিক ছিলেন সায়াদ-বিন-খায়সামা। তিনি একা ছিলেন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বলতে কেউই ছিল না। এ জন্যে যে সমস্ত মুহাযিরের সাথে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল না তাঁরাও এই গৃহে অবস্থান করত। তিন দিন পর হযরত আলী (রাঃ) এসে হযরত কুলসুম-বিন-হাদম (রাঃ) এর গৃহে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। মক্কা হতে রওয়ানা হবার পূর্বে তিনি আদেশানুযায়ী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গচ্ছিত সমস্ত আমানত ফেরৎ দিয়ে এসেছিলেন।

রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) দিনে থাকার ও নামায পড়ার অসুবিধা দেখে হযরত আম্মার (রাঃ) বললেন যে, দিনের বেলায় থাকবার ও নামায পড়বার জন্যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের আবশ্যক। তাই তিনি একখানা মসজিদ নির্মাণের জন্যে প্রস্তর সংগ্রহ করে আনলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বুনিয়াদ স্থাপন করলেন। এই মসজিদই ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুবা মসজিদ। উদ্যোক্তা হযরত আম্মার (রাঃ) এবং বুনিয়াদ স্থাপনকারী রসূলুল্লাহ (সঃ)। কুলসুম বিন-হারাম নামক জনৈক আনসারীর খেজুর শুকাবার স্থানে এই মসজিদ নির্মিত হল। এই মসজিদ যেরূপ তাক্‌ওয়ার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত সেরূপ মসজিদে নববীও তাক্‌ওয়ার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এই মসজিদ সম্বন্ধে কোরআনে নাযিল হয়েছে এবং মসজিদে নববী সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। মসজিদ নির্মাণ শুরু হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে প্রস্তর আনতে আদেশ করলেন। তাঁরা প্রস্তরময় স্থান হতে তা আনতে লাগলেন। তাঁদের সাথে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও বৃহদায়তন প্রস্তর বহন করে আনতে লাগলেন। প্রস্তরের গুরুভারে তাঁর দেহ মুবারক বেঁকে পড়ত। প্রিয় সাহাবীগণ এসে বিনীত কণ্ঠে বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের মাতাপিতা আপনার জন্যে কুরবান হউক, আপনি প্রস্তর বহন করবেন না, আমাদেরকে বহন করতে দিন।" রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁদের ভক্তিপূর্ণ নিবেদনের উত্তরে বললেন, "না, তোমরাও একটি করে আন।" প্রিয় সাহাবীগণের অনুরোধে তিনি কখন কখন গুরুভার প্রস্তর ছেড়ে দিতেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই অনুরূপ আরেকটি উঠিয়ে নিয়ে আসতেন।

www.pathagar.com

ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কুবায় অবস্থান করেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার আদেশে শুক্রবার পূর্বাহ্নে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বোখারীর বর্ণনা অনুসারে কুবা হতে বহির্গমন পরবর্তী শুক্রবারে সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রকাশ। কুবার সমস্ত লোক কেহ হেঁটে, কেহবা সাওয়ার হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনুগমন করল। সমস্ত পথেই অপূর্ব ভিড়। সকলেই বরকত গ্রহণ ও রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোসওয়ার রশি ধারণের জন্যে পরস্পর বাদানুবাদ করতে লাগল। সহগামী জনতা মুহুর্মূহু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিল।

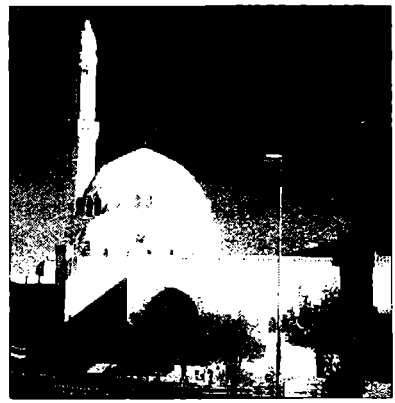

মসজিদে জুময়া

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শহরে আসছেন, এ সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ামাত্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে স্রোতের মত জনতা ছুটে আসে কুবা হতে মদীনা পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সকলেই আনন্দ হিল্লোলে হিল্লোলিত। তাঁর শুভাগমনে তথাকার অধিবাসী হাবশীগণ ছোট ছোট তলওয়ার নিয়ে খেলতে লাগল। পথে তিনি বনি সালেমের মহল্লায় বাতনুল ওয়াদিতে সোবাইব নামক একখানা ক্ষুদ্র মসজিদে জুময়ার নামায পড়েন। সেই থেকে তা মসজিদুল জুময়া নামে পরিচিত। নামাযের পূর্বে তিনি খোত্বা পাঠ করেন। এটাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সর্বপ্রথম জুময়ার নামায ও খোত্বা। খোত্বার প্রারম্ভে হাম্দ এবং সানা পাঠের পর তিনি বললেন, "লোকগণ! তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রে নেক আমল প্রেরণ কর। আল্লাহ্র কসম, তোমরা অচিরেই অবগত হবে (কিয়ামতের সময়) তোমাদের প্রত্যেকেই চেতনাশূন্য হয়ে পড়বে এবং নিজের বকরীর পাল (ধন সম্পদ) ছেড়ে যাবে, তখন সেই বকরীর পালের কোন চাকর থাকবেনা। অতঃপর (রোজ কিয়ামতে) তার প্রতিপালক জিজ্ঞেস করবেনঃ (তার ও তাঁর মধ্যে তখন কোন দোভাষী বা আবরণ থাকবে না) আমার কোন রসূল কি তোমার নিকট কখনও গমন করেনি এবং তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছায়নি? আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছিলাম, তোমার উপর নিয়ামতের ধারা বর্ষণ করেছিলাম, তুমি নিজের জন্যে কি কি নেক আমল প্রেরণ করেছ? তখন সে (বদকার) দক্ষিণ ও বামে দৃষ্টি সঞ্চালিত করবে; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। অতঃপর সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করবে, তখন জাহান্নাম ব্যতীত সে কিছুই দেখবে না। সুতরাং যে কেউ স্বীয় মুখমন্ডল অর্ধাংশ খর্জুর দানে দোজখ হতে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, সে তাই করুক। আর যে ব্যক্তির তাও জুটে না সে একটি কলেমা তাইয়্যিবা বা একটি দীনের কথা দ্বারাই তা করুক। নিশ্চয়ই সে তার বিনিময়ে দশ হতে সাত শত গুণ নেকী লাভ করবে। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

www.pathagar.com

জুমুয়া শেষ হল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-তাঁর উষ্ট্রী কোসওয়ায় আরোহণ করলেন এবং স্বহস্তে বলগা ধারন করলেন। কোসওয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাতে লাগল। প্রতিটি লোকই তাঁকে অতিথিরূপে গ্রহণ করতে চাইল। সকলেই তাঁর খেদমতে আরজ জানাতে লাগল। বনি সারেম কবিলা এসে আরজ করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঘর এই, মাল এই, জান এই, কবূল করুন। আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আমাদের অস্ত্র শস্ত্র পর্যাপ্ত, বাগ-বাগিচা প্রচুর, শক্তিও বিপুল। আমরা আপনাকে সসম্মানে ও নিরাপদেই রাখব। আরবের লোক আমাদেরই নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আপনি আমাদের এখানে অবস্থান করুন।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদের ভক্তিপূর্ণ আবেদনের উত্তরে স্মিত হাসি হাসছিলেন এবং স্বাভাবিক বিনয় মধুর কণ্ঠে বলছিলেন, "কোসওয়ার পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র আদেশেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।" তিনি তাঁদের জন্যে দোয়া করছিলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের উপর বরকতের ধারা বর্ষণ করুন।" মদীনার পথে সমস্ত কবিলা হতেই অনুরূপ আরজ আসল এবং তিনিও অনুরূপ উত্তর দিয়ে চললেন। কিছু দূর অগ্রসর হলে তাঁর নানার বংশধর বনি নাজ্জারের মহল্লার নিকট যেখানে মসজিদে নববীর দরজা অবস্থিত সেখানে গিয়ে কোসওয়া বসে পড়ল; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অবতরণ করলেন না। কোসওয়া উঠল ও কিছুদুর অগ্রসর হল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পথের নির্দেশ দিচ্ছিলেন না। কিছুদুর অগ্রসর হয়ে সে পশ্চাত দিকে দৃষ্টি ফিরাল এবং পূর্বস্থানে এসে আবার বসে পড়ল-দেহ ঈষৎ সঞ্চালন করল, মৃদু গুঞ্জন তুলল আর মাটির উপর দীর্ঘ গ্রীবা প্রসারিত করে দিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অবতরণ করলেন এবং চারবার পড়লেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মুবারক মঞ্জিলে অবতরণ করাও এবং তুমিই সর্বোত্তম অবতরণকারী।" (সূ'রা মুমিনুন) তিনি বুঝলেন-এটাই তাঁর মঞ্জিল। এর অনতিদূরেই নাজ্জার বংশীয় আবু আইউব আনসারীর বাসভবন ছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শহরে প্রবেশ করলে মহিলাগণ ও বালিকাদল আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরের ছাদের উপর ছুটে আসল এবং গাইতে লাগল ঃ "সানিয়াতুল বেদা, হতে পূর্ণ শশী উদয় হয়েছে, যতকাল প্রার্থনাকারী আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে ততকাল (আমাদের এই শুভক্ষণ ও মহান নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে) শোকর আদায় করা অবশ্য কর্তব্য; হে আমাদের প্রতি প্রেরিত পুরুষ! আপনি এমন বিষয় নিয়ে এসেছেন যা আমাদেরকে মানতেই হবে।"

ছোট ছোট বালিকাদল দফ্ বাজিয়ে গাইতে লাগলঃ- "আমরা বনি-নাজ্জার কবিলার বালিকা! কী আনন্দ! মুহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী।"

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বালিকাদের প্রতি চেয়ে বললেন, "তোমরা কি আমাকে ভালবাস?" শিশুদের কলকণ্ঠে ধ্বনিয়ে উঠল, "হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ্!" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।"

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোসওয়া হতে অবতরণের পর হাওদা নামাতে আদেশ দিলেন। হযরত আবু আনসারী (রাঃ) হাওদা নামিয়ে নিজ বাসভবনে রেখে বললেন, "এই গৃহে আপনার হাওদা।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট আনসারগণ সকলে স্ব স্ব গৃহে অবস্থান ও আতিথ্য

www.pathagar.com

গ্রহণের আবেদন জানালেন, এমন কি পরস্পর কলহের সৃষ্টি হল। তিনি আনসারগণকে স্বাভাবসূলভ মধুর ভাষায় সন্তোষজনক উত্তর দানে বিদায় দিলেন।

হিজরতের বছর হতে হিজরী সাল গনণা করা হয় এবং তা চান্দ্রমাস অনুসারে হয়ে থাকে, সৌর মাস অনুসারে নয়। মহররম মাস হতে বছর শুরু হয়ে থাকে।

মদীনা মনোয়ারায় আমাদের রুটিন কাজ

মদীনা মনোয়ারায় আমরা ৩ দিন ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর, '৯৯ইং রাত ১২-৩০ টা পর্যন্ত অবস্থান করি।

জিয়ারত ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন কাজের তালিকায় ছিল তাকবিরে উলার সাথে প্রতি ওয়াক্তের নামাজ মসজিদে নববীতে আদায় করা। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের আগে-পরে রিয়াজুল জান্নাতে নফল নামাজ পড়া, প্রায় প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্যে প্রবেশকালে বাবে জিব্‌রাঈল দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ এবং বাবে বাকি দিয়ে প্রস্থান করা এবং প্রতিবারের প্রস্থানকালে নবীর (সঃ) এবং পাশে শায়িত দু'সাহাবীর প্রতি সালাম পেশ করা। রিয়াজুল জান্নাতে যে সব স্থানে আসন গ্রহন করতে চেষ্টা করেছি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি মোবারক স্তম্ভের (খাম্বা) কাছাকাছি স্থান, যেমন, '১। ওস্তোয়ানা হান্নানা, ২। ওস্তোয়ানা তওবা, ৩। ওস্তোয়ানা আয়িশা, ৪। ওস্তোয়ানা হরির, ৫। ওস্তোয়ানা আলী (রাঃ), ৬। ওস্তোয়ানা ওফুদ। এসব স্তম্ভ নবীর (সঃ) জামানার কিছু বিশেষ নিসানা / স্মৃতি বহন করছে। এগুলো দোয়া কবুলের স্থান।

ওস্তোয়ানা হান্নানাকে ক্রন্দনকারী স্তম্ভও বলা হয়। এটি রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) মোসাল্লার (মেহরাব) সব চাইতে নিকটবর্তী স্তম্ভ। ওস্তোয়ানা হান্নানার সাথে নবীর (সঃ) একটি মোজেযাহ জড়িত আছে। নির্ভরযোগ্য হাদিসের ৬টি গ্রন্থের ৫টিতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে নববীতে নামাজের মুসল্লার ডান পাশে দাঁড়িয়ে একটি খেজুরের খুটিতে হেলান দিয়ে-জুময়ার খোতবা প্রদান করতেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দূর হতে তাকে স্পষ্ট দেখা যেতনা। তাই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এমন কিছু একটা নির্মাণ করতে তার নিকট আরজ করলেন যার ওপর দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করলে সকলেই তাঁকে দেখতে পাবেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর একটি মিম্বর ছিল। তাঁর অনুসরনে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-ও মিম্বর প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। তিন সোপানবিশিষ্ট একটি মিম্বর প্রস্তুত হল, দুটি বসবার জন্যে, একটি পা রাখবার জন্যে। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন খুতবা প্রদানের জন্যে মিম্বরে আরোহন করলেন তখন খেজুরের খুটিটি করুন স্বরে কাঁদতে লাগল। খুটির ক্রন্দন মসজিদের মুসল্লিগণের শ্রুতিগোচর হলে আকুলভাবে তাঁরাও এ অলৌকিক ব্যাপারে ক্রন্দন করতে লাগলেন। ক্রন্দন করতে করতে এক ভীষণ রব করে খুটিটি ফেটে গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মিম্বর হতে নেমে খুটিটি জড়িয়ে ধরলেন এবং ক্রন্দন থামাবার জন্যে শিশুকে প্রবোধ দেয়ার মত তাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, "শান্ত হও, শান্ত হও"। খুটিটি শান্ত হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এর বিরহে এবং আল্লাহ্‌র জিকির হতে বঞ্চিত হওয়াতেই খুঁটিটি ক্রন্দন করেছিল। যদি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সান্তনা না দিতেন তা হলে খেজুর গাছটি রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দন করতে থাকত।

www.pathagar.com

ওস্তোয়ানা তওবা'র আরেক নাম আবু লুবাবাহ স্তম্ভ। এটি কবর মুবারক থেকে ২য়, কিবলার দিকে থেকে ৩য় এবং আয়িশা স্তম্ভের পূর্বদিকের পরবর্তী স্তম্ভ। আবু লুবাবাহ বিন মুনজের একজন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি মদীনার ইহুদী বনি কুরায়জাহ্‌র কাছে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) একটি গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়ার অপরাধে নিজেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্তম্ভে বেঁধে রাখেন এবং তওবা কবুল হওয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার না করার শপথ গ্রহন করেন। তাঁর তওবা কবুল হলে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নিজ হাতে তাঁর বন্ধন খুলে দেন।

ওস্তোয়ানা আয়িশার অপর নাম ওস্তোয়ানা কোব্‌আহ্‌ (ভাগ্য পরীক্ষা)। এটি মসজিদের মধ্য স্থানে অবস্থিত। এটি কবর মোবারক থেকে কিব্‌লার দিক থেকে এবং উত্তর দিকের সাবেক উন্মুক্ত দিক থেকে ৩য়। কিবলা পরিবর্তনের পর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মেহরাব নির্ধারনের আগ পর্যন্ত কিছুদিন এ জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজের ইমামতি করেন।

ওস্তোয়ানা ছরির পূর্বদিকে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) কবর মুবারকের জানালা ও হযরত আয়িশার (রাঃ) জন্যে তৈরী কক্ষ সংলগ্ন এবং তওবা স্তম্ভের পেছনে যা মিম্বর থেকে ৪র্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। এর সাথে খেজুর পাতার তৈরি একটি মাদুর বিছানো হত এবং তাতে কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) শুয়ে ঘুমাতেন।

ওস্তোয়ানা আলী স্তম্ভের স্থানে হযরত আলী (রাঃ) সহ কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) ঘরের বাইরে রাতে পাহারা দিতেন। এটি হুজরার দরজার পরেই অবস্থিত ছিল।

ওস্তোয়ানা অফুদকে প্রতিনিধি স্তম্ভও বলে। এটি ওস্তোয়ানা আলীর উত্তরে অবস্থিত। এখানেই রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতেন। তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন ও এর সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করতেন।

প্রত্যেকটি স্তম্ভেরই বিশেষ ফজীলত রয়েছে। ইব্‌নে নাজ্জার বলেছেন, স্তম্ভ সমূহের কাছে নামাজ পড়া মুস্তাহাব। কেননা, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম সবাই এসব স্থানে নামাজ পড়েছেন। বুখারী শরীফে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "মাগরিবের সময় আমি বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে স্তম্ভসমূহের কাছে অবস্থান করতে দেখেছি।"

আমরা রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) মিম্বরের কাছেও নামাজ পড়তে চেষ্টা করেছি। এটি বড়ই বরকত ও মুবারক জায়গা। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, "আমার এই মিম্বর বেহেশতের একটি নহরের মুখে এবং এর পায়াগুলো বেহেশতে অবস্থিত।" তিনি আরো বলেছেন, আমার কবর ও আমার মিম্বরের মধ্যে বেহেশতের উদ্যানরাজির একটি উদ্যান রয়েছে।

সুফ্‌ফায় আমরা

আমরা মাঝে মধ্যে 'সুফফাহ' তেও নামাজ পড়েছি। সুফফাহ্‌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ছায়াদার স্থান। এটি হচ্ছে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নির্মিত মসজিদের শেষাংশে, তাঁর দরিদ্র ও ছিন্নমূল সাহাবীদের আশ্রয় স্থান। বর্তমানে মসজিদের মেঝের স্বাভাবিক সমতল থেকে প্রায় দেড়ফুট উঁচু চারদিকে প্রায় দেড়ফুট উঁচু গ্রীল বেষ্টিত। এখানে বসবাসকারী ব্যক্তিরাই ছিলেন সুফ্‌ফাহ, উত্তর দিক থেকে দক্ষিনে কিবলা পরিবর্তিত হওয়ায় সুফফাহ্‌ ছিল মসজিদের শেষ ও পেছনের দেয়াল সংলগ্ন।

www.pathagar.com

সুফ্ফায় যাঁরা বাস করতেন তাঁরাই আসহাবে সুফ্ফা বলে পরিচিত। তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল না। আসহাবে সুফ্ফার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। সত্তর জন আসহাবে সুফ্ফা বীরে মায়ুনার জিহাদে শাহাদত প্রাপ্ত হন। এর পর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম। তিনি সত্তর জন আসহাবে সুফ্ফার সম্বন্ধে এক উক্তি করেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁদের সংখ্যা মোট এক শত চল্লিশের অধিক ছিল। তাঁর উক্তি হতে আসহাবে সুফ্ফার জীবনের কঠোরতার কিঞ্চিত আভাষ পাওয়া যায়। তাঁর উক্তিটি এই, "তাঁদের কারো দেহে একখানা চাদর পর্যন্ত ছিল না। কারো পরিধানে শুধু তহবন্দ ছিল, কারো বা একখানা মাত্র কাপড় ছিল-তা গলায় বাঁধা থাকত, আবার তাও কারো হাঁটুর অর্ধেক, কারো বা পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌছত। ছতর দৃষ্ট হওয়ার ভয়ে তাঁরা তা জড়িয়ে ধরে রাখতেন। আনসারগণ খেজুরের কাঁদি ভেঙ্গে এনে মসজিদের ছাদে লটকিয়ে রাখতেন। যে সমস্ত খেজুর ঝরে নীচে পড়ত তাঁরা তা কুড়িয়ে খেতেন। মাঝে মাঝে দুই তিন দিন পর্যন্ত তাঁদেরকে অনাহারে কাটাতে হত। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে নামাযের মধ্যেও তাঁরা অনেক সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যেতেন; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার একাগ্রচিত্ত সাধকদের ঈমান তাতে বিন্দুমাত্রও টলত না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সদকার খাদ্য দ্রব্যাদি তাঁদেরকে দিয়ে দিতেন, দাওয়াতের খানা আসলে তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে আহার করতেন, অনেক সময় আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে তাঁদের নৈশ আহারের বন্দোবস্ত করে দিতেন।"

আসহাবে সুফ্ফাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কী দৃষ্টিতে দেখতেন, তার একটি ঘটনা মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর স্নেহের দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ) পিতার নিকট এসে বললেন, "সর্বদা যাতা পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছে, আমাকে একটি দাসী সংগ্রহ করে দিন।" তদুত্তরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "আমি তোমাকে দাসী দেব আর আসহাবে সুফ্ফা ক্ষুধায় মরবে, তা কিছুতেই হতে পারে না।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে আসহাবে সুফ্ফার নিখুঁত মুহব্বতের কি নিবিড় যোগ ছিল, উপরের ঘটনাই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁরা তা'লীম ও ইবাদতের জন্যে আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁরা নেক সোহবতে থেকে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী হুবহু হৃদয়-ফলকে এঁকে রাখতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র সান্নিধ্যে বসে তাঁরা কুরআন শিক্ষা করতেন। ইসলাম প্রচারের জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকেই পাঠানো হত। কন্টাকাবৃত মরুতে ফুল ফোটানোর কঠিন দায়িত্ব এই সকল নিঃস্বার্থ মহামানবের স্কন্ধেই চাপানো হত।

আযান ঘরের নীচে

আমরা আযান ঘরের নীচেও নামাজ পড়তে চেষ্টা করেছি। হযরত বেলাল (রাঃ) কোথায় দাঁড়িয়ে ৫ ওয়াক্ত নামাজের আযান দিতেন তার চিহ্ন না থাকলেও মু-আযযিন বর্তমানে যেখানে আযান ও ইকামত দেন তার স্থান হচ্ছে রসূলুল্লাহ্র (সঃ) মেহরাবের পেছনে দোতলার মত কিছুটা উঁচু অথচ খোলা জায়গা। মুআযযিনকে আযান দেয়ার সময় একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, আযানের প্রতিটি বাক্য উচ্চারন করার সময় তিনি

www.pathagar.com

দু'হাত নীচে ছেড়ে দেন। কারন কাউকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি। মসজিদে নববীতে আযান শুনার সাথে সাথে হযরত বেলাল (রাঃ) এবং আযান প্রবর্তনের ইতিহাস এখানকার সকল নামাজীর মনে ভেসে উঠা স্বাভাবিক।

আযান, ইকামত, জামায়াত এবং তকবীর-তাহরীমা-এ কয়েকটি হুকুম উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে খাস নিয়ামত, পূর্ববর্তী উম্মতগণের নামাযে তা ছিল না। অপরাপর নবীগণ তাওহীদ, তাসবীহ ও তাহলীল (আল্লাহু আহাদ, সেবহানাল্লাহ, লা-ই-লাহা-ইল্লাল্লাহ) দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) করতেন তকবীর বা আল্লাহু আকবার দ্বারা।

আযান ও ইকামত প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরীতে প্রবর্তিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীগণসহ যথারীতি জামায়াতে নামায পড়তে লাগলেন। বিশেষ বিধানের অবর্তমানে জামায়াতে উপস্থিত হবার জন্যে কোন ইন্তেজাম ছিল না। এ সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীগণসহ পরামর্শ করতে বসলেন, তাঁরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন, "নামাযের সময় ঝান্ডা উঠান হোক। তা দেখে লোক বুঝতে পারবে যে, জামায়াতের সময় হয়েছে।" এ প্রস্তাব রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর মনঃপূত হলনা। কেউবা বললেন, "শিংগা বাজান হোক।" তিনি বললেন, "তা য়াহুদীদের রীতি।" আবার কেউ বললেন, "ঘন্টা বাজান হোক।" তিনি বললেন, "তা নাসারাদের রীতি।" আবার কেউ বললেন, "বৃহদাকারে আগুন জ্বালান হোক।" তিনি বললেন, "তা অগ্নি উপাসকদের রীতি।" হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "লোকদেরকে জামায়াতের প্রতি ডাকবার জন্যে একজন লোক নিযুক্ত করা হোক।" এই কার্যের দায়িত্ব হযরত বিলাল (রাঃ) এর উপর ন্যস্ত হল। তিনি লোকদেরকে এই বলে ডাকতেনঃ "আস্সালাতু জামেয়াতুন - নামায উপস্থিত।"

হযরত আবদুল্লাহ্ - বিন-যায়েদ (রাঃ) একদিন ভোর রাতে একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, সমারোহময় সবুজ লেবাস পরিহিত জনৈক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর হাতে একটি ঘন্টা। আমি বললামঃ আপনি কি এটি বিক্রয় করবেন? তিনি বললেনঃ কেন? আমি বললামঃ জামায়াতে লোক ডাকবার জন্যে। তিনি বললেনঃ তোমাকে কি অধিকতর উৎকৃষ্ট উপায় বলে দেব? আমি বললামঃ কি? তিনি বললেনঃ তুমি বলবেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ..... লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তৎপর তিনি কিছু দূরে সরে দাঁড়ালেন এবং বললেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ..... কাদ্কামতিস সালাতু কাদ্কামতিস-সালাহ্ ..... লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, "ইশায়াল্লাহ্ এটি সত্য স্বপ্ন, বিলালকে শিখিয়ে দাও। সে আযান দিক, তার কণ্ঠই সর্বাপেক্ষা উচ্চ।' মি'রাজের রাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে ইকামত শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। তাই তিনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনা মাত্র তা সত্য বলে ব্যাখ্যা করলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) আযান শিখে নিলেন। পরক্ষণেই তাঁর আযানের মধুর সুর লহরী রাতের শেষের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। ফজর হতে প্রথম আযান শুরু হল। স্বপ্ন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর এবং তা রূপায়িত হল হযরত বিলাল (রাঃ) এর কণ্ঠে। স্বপ্নের দিক হতে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) এবং

www.pathagar.com

ধ্বনির দিক হতে হযরত বিলাল (রাঃ) মুসলিম জগতের সর্ব প্রথম মুয়াজ্জিন। একই সময় হযরত ওমর (রাঃ) ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি হযরত বিলাল (রাঃ) এর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনে তিনি দেহে চাদর জড়িয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি যে, আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র।" তিনি আরও বললেন, "এ সম্পর্কে ওহীও এসেছে।" এ স্বপ্নটি আরও বহু সাহাবী দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে।

হিজরতের পূর্বে ফরয নামায দু'রাকআত করে ছিল। হিজরতের পর দিবারাতে পাঁচবার আযান ও ইকামত প্রবর্তিত হল এবং জোহর, আসর ও ইশার শেষে আরও দুই রাকআত করে বর্ধিত হল।

মসজিদে নববীর নিকট নাজ্জার বংশীয় জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলার গৃহের ছাদ সর্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল। রাতের শেষভাগে হযরত বিলাল (রাঃ) ঐ ছাদের উপর বসে আযানের অপেক্ষায় থাকতেন। পূর্ব গগনের তোরণ দ্বারে সোবেহ সাদেকের ক্ষীণ শুভ্র রেখা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠা মাত্র তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং মহান প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ করতেন, "আল্লাহ্! আপনারই প্রশংসা করছি, ধর্ম বিরোধী কুরাইশদের বিরুদ্ধে আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।" পরক্ষণেই ঐ ছাদের উপর হতে মধুর কণ্ঠের আযান ধ্বনি মরুউষার শীতল হাওয়ার তরংগে তরংগায়িত হয়ে দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলত ও ঈমানদারগণের কর্ণ কুহরে অপার্থিব সুরের সুধা ঢেলে দিত। হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ) দ্বিতীয় মুয়াজ্জিন ছিলেন। উষার আযান দু'বার দেয়া হত -রাতের অধিক অতীত হলে এক মুয়াজ্জিন, সোবেহ সাদেক উদয় হলে অপর মুয়াজ্জিন।

প্রথম আযানের উদ্দেশ্য রাতে জেগে নামায আদায়কারীদিগকে শয়ন করতে নির্দেশ দেয়া, যেন সামান্যক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর প্রশান্ত চিত্তে ফজরের নামায আদায় করতে পারেন; আর দ্বিতীয় আযানের উদ্দেশ্য নিদ্রিত লোকদিগকে ফজর নামাযের জন্যে জাগ্রত করা। জু'মার নামাযে তখন একটি মাত্র আযান ছিল। খোত্‌বা প্রদানের জন্যে মিম্বরে আরোহণ করে উপবেশন করলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সম্মুখে জু'মার আযান দেয়া হত। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খিলাফত কালে জু'মার অধুনা 'প্রথম' আযান প্রবর্তিত হয়; আযানের পূর্বে মিনার শীর্ষে আরোহণ করে তকবীর তাসবীহ ও দরূদ পাঠ বাদশাহগণের আমলে প্রবর্তিত রীতি, খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের নহে।

মসজিদে নববীতে কোরআনে পাকের জলসা বসে

এ সফরে মসজিদে নববীতে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে আরবী ও উর্দ্দুতে কোরআনে করীমের উপর তফসীর মাহফিল বসে। এ দুটি ভাষায় নিজের জ্ঞানের দৈন্যতার কারনে তা থেকে ফায়দা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। মসিউল্যাহ্ সাহেব জানালেন যে, হজ্বের মওসুম ব্যাতীত অন্য সময়ে প্রায়শঃই এখানে কোরআনে করীমের তফসীর করা হয়।

www.pathagar.com

জান্নাতুল বাকিতে

জান্নাতুল বাকিতে প্রত্যেহ হাযিরা দেয়া ছিল আমাদের অন্যতম প্রধান রুটিন কাজ। এখানে হাজার হাজার আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা শুয়ে আছেন। বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্‌লে বাইতের সদস্যগণকে এখানে দাফন করা হয়েছে। কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌পাক এখান থেকে সত্তর হাজার নেক বান্দাহকে উঠাবেন যাঁরা বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

প্রতিদিন বাদ আছর এবং সময় সময় বাদ ফজর জান্নাতুল বাকীতে দোয়া কালাম পড়ার চেষ্টা করেছি। এখানে শায়িত আল্লাহ্‌পাকের নেক বান্দাহ্‌দের প্রতি সালাম পেশ করেছি; আর কামনা করেছি আল্লাহ্‌পাক যেন আমাকে উক্ত সত্তর হাজার নেক বান্দার অন্তর্ভূক্ত করেন।

জান্নাতুল বাকিতে কারো পরিপূর্ণ কবরের চিহ্ন নেই। তবে কিছুদূর পরপর বড় বড় পাথরের টুকরা বসানো আছে যেগুলো থেকে অসংখ্য কবরের অবস্থান অনুমান করা যায় মাত্র। তবে প্রধান ফটকের কাছাকাছি কয়েকটি কবর মাটির সমতল দেয়াল ঘেরা মনে হল এবং এগুলোর পাশে জিয়ারত কারীদের ভিড়ও লক্ষ্য করলাম। বাঙ্গালী কাউকে পাওয়া গেল না বলে এগুলো সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ইরাণী জিয়ারত কারীগণকে জান্নাতুল বাকীতে দলেবলে লক্ষ্য করেছি। প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে পাগড়ি পরিহিত একজন দলনেতাকে দেখেছি। তিনি সমাহিত বান্দা/বান্দী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত অন্যান্য ইরাণী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তা শ্রবন করেন এবং ক্ষনে ক্ষনে ডুকরে কেঁদে উঠেন। সমালোচকরা বলে যে, ইরাণীরা মদীনায় আসেন শুধুমাত্র কবর জিয়ারতের জন্যে। আল্লাহ্‌পাকই ভাল জানেন। অনেক ইরাণীর হাতে জান্নাতুল বাকির নক্সা লক্ষ্য করেছি। এক ইরাণী থেকে আমি জান্নাতুল বাকির একটি নক্সা চেয়ে নিয়েছি।

শিরক মিশ্রিত তৎপরতা কঠোরভাবে দমন করা হয়

জান্নাতুল বাকিতে কেউ যাতে শিরক মিশ্রিত কাজে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখানে কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদেরকে মাঝে মধ্যে জিয়ারত কারীগণকে সতর্ক করতে লক্ষ্য করেছি। তাছাড়াও প্রবেশমুখে একটি বিরাট সাইনবোর্ড রয়েছে যাতে লিখা রয়েছে ঃ

Dear Visitor,

This is the Prophet (Sm) way of visiting the grave yard:

1. Graves are to be visited for introspection and learning a lesson. The Prophet (Sm) said, "Visit the grave yard for they remind you of death"
2. Upon entering the grave yard the Prophet (Sm) used to greet the people of the graves saying peace be on you O' people of the abode of the believers we are surely going to join you Insha Allah. May Allah show mercy to the former and to the latter. We ask well being for us and for you. O' Allah do not deprive us of the recompense that you may grant for our bereavement and do not subject us to temptation after their departure.

www.pathagar.com

3. The Prophet (Sm) has forbidden to perform salah towards the graves and also to sit on the graves nor perform salah towards them (Muslim).
4. The Prophet (Sm) has forbidden addressing supplications to the dead and asking them to procure for us what is good and ward off what is evil.

Allah says, "And those whom you call upon beside Him (Allah) can not help you nor can they help themselves (Al-Araf-197)."

And the Prophet (Sm) said, "If you ask, ask Allah, if you seek help, seek Allah's help."

নবী পাকের (সঃ) প্রতি ভালবাসা পেশ করতে গিয়ে যাতে কেউ শিরকে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে মসজিদে নববীর খাদেমগণও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। অনেক জিয়ারতকারী হুযুরের (সঃ) রওজা মোবারকে উঁকি মারতে চেষ্টা করে। অনেকে রওজা মোবারকের দেয়ালে চুমু খেতে এমনকি মাথা ঠেকাতেও চেষ্টা করে। এগুলো খাদেমগণ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেন।

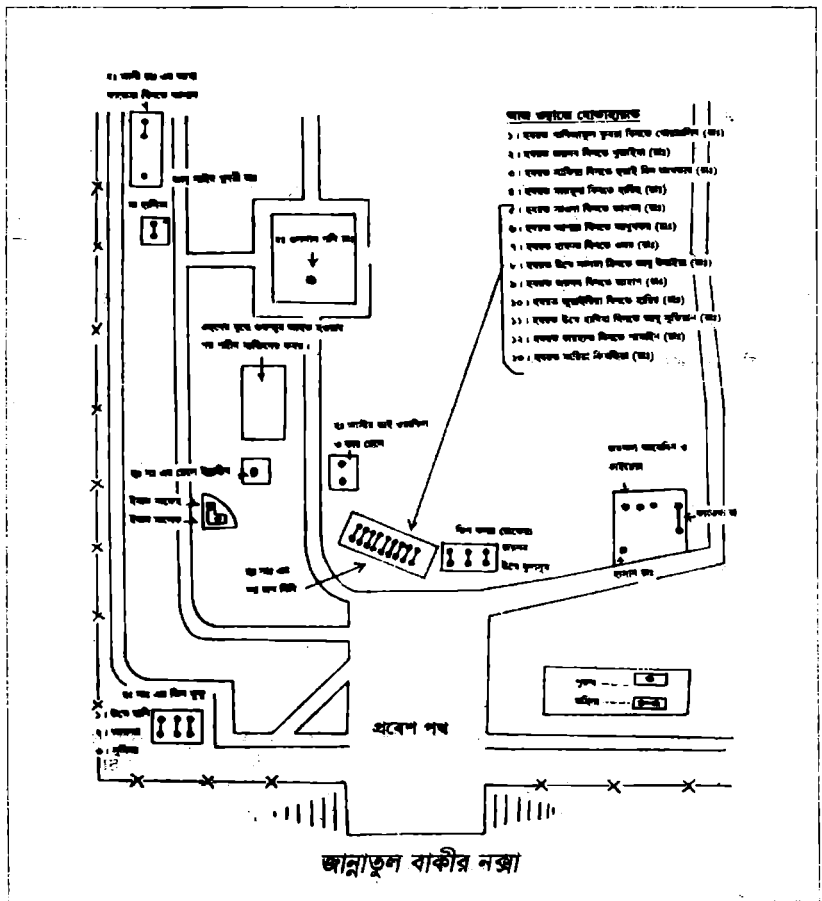

জান্নাতুল বাকীর নক্সা

www.pathagar.com

মদীনা মনোয়ারার অন্যান্য মসজিদ জিয়ারত

মদীনা মনোয়ারায় আমরা ১লা অক্টোবর, ১৯৯৯ইং রাত ১২-৩০টা পর্যন্ত অবস্থান করি। এখানে অবস্থানকালে উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো জিয়ারত ছাড়াও মসজিদে নববীর পাশে অবস্থিত অন্যান্য মসজিদগুলো-যেমন, হযরত বেলালের (রাঃ) মসজিদ, হযরত ওমরের (রাঃ) মসজিদ, হযরত আবু বকরের (রাঃ) মসজিদ, হযরত আলীর (রাঃ) মসজিদ, হযরত জিন্নুরাইন (রাঃ) মসজিদ, মসজিদে গামামা, মসজিদে আবুযর গিফারী (রাঃ), মসজিদে ইমাম বোখারী (রাঃ) পরিদর্শন করি। বেলালের (রাঃ) মসজিদ ব্যাতীত অন্যান্য মসজিদে মুসল্লি পরিলক্ষিত হয়নি। মসজিদে গামামা সম্পর্কে উল্লেখিত আছে যে, নবী পাক (সঃ) এক মজলিশে বক্তব্য কালে উপস্থিত সাহাবাগণ তাঁর নিকট বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে অনুরোধ করেছিলেন। তখন নবীপাক (সঃ) দোয়া করলে বৃষ্টি হয় এবং এ কারণেই উপরোক্ত মসজিদে গামামার নামকরন করা হয়েছে।

মসজিদে গামামা

আত্মীয়ের খোঁজে

৩০শে সেপ্টেম্বর রাতে বাদ এশা আমি একাকী এখানে অবস্থানরত আমার এক খালাত ভাইয়ের সন্ধানে বের হয়ে পড়ি। ১৯৯৮ইং সনে হজ্ব উপলক্ষে সফরের সময় মদীনা মনোয়ারায় তার বাসাতেই অবস্থান করি। বাসা হারাতুল মুগারবা, কু'বা রোড, কু'বা জিলা-এ ঠিকানায়। তার বাসায় গিয়ে দেখি দরজায় তালা। পাশে স্থানীয় এক ব্যক্তির মুদিদোকানে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, আমার খালাত ভাইটি এখন এখানে থাকছেনা, তবে তার ভগ্নিপতি আবুল হোসেন থাকেন।

দোকানীর সাথে আলাপ শেষে বের হবার পথেই আবুল হোসেনের দেখা। সে-ত প্রথমে আমাকে চিনতেই পারছিল না। যাহোক চেনার সাথে সাথে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় শেষে অদূরে আরেক বাসায় আমার খালাত ভাই আবদুল আলীর নিকট নিয়ে গেল। একাকী কিভাবে তাদেরকে আমি খুঁজে বের করলাম তা-তে তারা অবাক আর কি! যাই হোক কিছু নাস্তা আপ্যায়ন করে তারা আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিল। ইতিমধ্যে আমরা এখানে কিছু কেনা কাটার কাজ সেরে নিলাম। মসিউল্যা সাহেব আমাদেরকে খেজুর মার্কেট থেকে পাইকারী দামে খেজুর কিনতে সাহায্য করলেন।

www.pathagar.com

বিদায় মদীনা মনোয়ারা

পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা ১লা অক্টোবর, রাত ১২-৩০ টায় "SAPTCO" বাসযোগে মক্কা মোয়াজ্জুমার উদ্দেশ্যে চোখ মুছতে মুছতে রওয়ানা হলাম। নবীর (সঃ) প্রতি বার বার দরূদ ও সালাম পেশ করলাম। আল্লাহ্পাকের নিকট নিবেদন করলাম, মদীনা মনোয়ারায় এটি যেন আমার শেষ সফর না হয়। এ পবিত্র নগরীতে বার বার সফরের তৌফিক চেয়ে প্রার্থনা করলাম মহামহিমের নিকট। উল্লেখ্য যে, আমরা হোটেল থেকেই ইহরাম বেঁধে নিলাম। লক্ষ্য করেছি যে, জিয়ারত কারীদের অনেকে পথে মীকাত মসজিদে ইহরাম বেঁধেছেন। আমরা এখানে চার রাকাত নফল নামায পড়ে নিলাম।

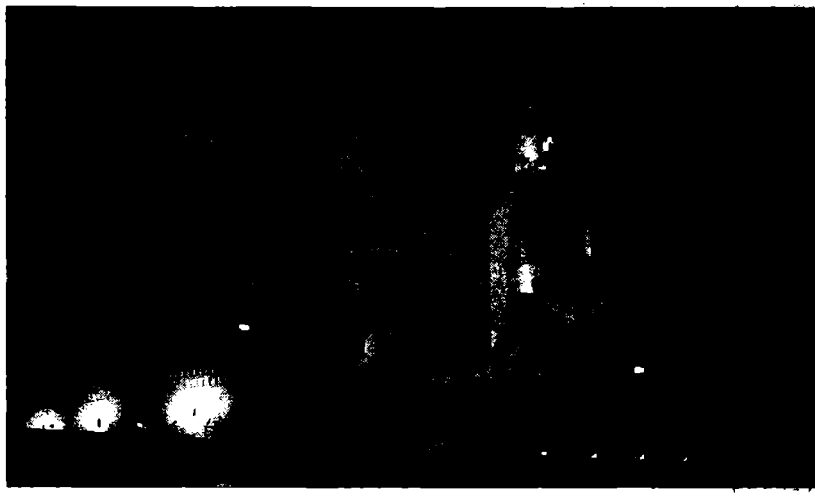

মসজিদে মিকাত্

দ্বিতীয়বার ওমরা সম্পাদন

আলহামদুলিল্লাহ্। ২রা অক্টোবর সকাল ৭টায় আমরা মক্কা মোয়াজ্জমায় পৌঁছে গেলাম। হোটেলে আমাদের লাগেজ রেখে আমরা সকাল ১০-০০ টার মধ্যে ওমরা সম্পন্ন করে মাথা মুন্ডন / চুল ছোট করে হালাল হয়ে নিলাম।

আব্বাস আলী খান সাহেব ইন্তেকাল করলেন খবর পেলাম

৩রা অক্টোবর, ১৯৯৯ইং সালাতুল মাগরীব, এশা ও কয়েকবার তওয়াফ শেষে মসজিদে হারামের সেই ১৫নং পিলারের নিকট মূসা সাহেবের সাথে অন্যান্য দিনের মত যথারীতি মিলিত হলে বিভিন্ন কথার পর তিনি আমাদের জানালেন যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ঐদিন বেলা ১টার সময় ইন্তেকাল করেন, পড়ে নিলাম - "ইন্নালিল্লাহি অ'ইন্না ইলাইহি রাজেউন"। বেশ কিছুদিন থেকে বার্দ্ধক্যজনিত রোগসহ বিভিন্ন জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত খান

www.pathagar.com

সাহেবের মৃত্যু অপ্রত্যাশিত না হলেও তাঁর মত ইসলামী আন্দোলনের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও এক নির্ভীক সেনানীর তিরোধানে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বলে অনুভূত হল। ১৯৮৩ ইং সনের প্রথম দিকে কিছু দিন তাঁর সাহচর্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন "ইসলামী ব্যাংকিং" এর উপর ইসলামিক ইকোনেমিক্স রিসার্চ ব্যুরোতে একটি ট্রেনিং গ্রহণ উপলক্ষে আমি বড় মগবাজারের আলফালাহ্ ভবনে মাস খানেক ছিলাম। এসময় সেই বর্ষিয়ান জননেতাকে ব্যাচেলর জীবন যাপন করতে দেখেছি। আলফালাহ্ ভবনের একটি কক্ষে থাকেন একা। আলাদা খাবারের ব্যবস্থাও নেই। আমাদের সাথেই মেসের 'কমন' খাবার খাচ্ছেন। এমন অকুতোভয়, দায়ী ইলাল্লাহ্, চরম আত্মত্যাগী নিরহংকার, সরল ও সাচ্চা জননেতার মত এ যুগের কাউকে আমার জানা নেই। এ সকল কথা চিন্তা হতেই চোখের কোন সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি আমার আত্মীয় নন; কিন্তু আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করি বলেই আজো তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ হলে অশ্রু সংবরন করতে পারিনে। খান সাহেবের বর্নাঢ্য কর্মময় জীবন সকল মোমেন মুজাহিদের জন্যে অনুকরণীয়-অনুসরনীয়। আব্বাস আলী খান উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী সিপাহসালার ছিলেন। একাধারে সুসাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ, সুবক্তা, সংগঠক ও অকুতোভয় দেশপ্রেমিক এক জননেতা।

তিনি ১৯৪১ সালে জয়পুরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ এদেশে এসেছিলেন আফগানিস্তান থেকে। তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন হুগলী নিউ স্কীম মাদ্রাসা থেকে ১৯৩০ সালে। তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কারমাইকেল কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি.এ. পাস করেন। সরকারী চাকরির এক পর্যায়ে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর শিক্ষকতা জীবন। এক সময়ে তিনি ফুরফুরা শরিফের মুরীদ হন। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান এবং এ সংগঠনে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে জামায়াতের তদানীন্তন রাজশাহী বিভাগীয় আমীর সাবেক কেন্দ্রীয় আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে আব্বাস আলী খান বলেন, "এই শপথের মাধ্যমে আমি আমার জান-মাল আল্লাহ্র কাছে বিক্রয় করে দিলাম এবং আল্লাহ্র খরিদ করা জান-মাল তাঁরই পথে ব্যয় করার শপথ নিলাম। এবার সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলুম"।

তিনি ১৯৫৭ সালে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দেন ইসলামী আন্দোলনের কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকার প্রয়োজনে। এ বছর তাঁর উপর অর্পিত হয় রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতের দায়িত্ব। এ দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যন্ত। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে জামায়াত পুনর্গঠিত হওয়া পর্যন্ত তিনি জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি ছিলেন খাঁটি দায়ী ইলাল্লাহ্।

জননেতা আব্বাস আলী খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের (পার্লামেন্ট) সদস্য নির্বাচিত হন এবং নেতৃত্ব দেন জামায়াতের পার্লামেন্টারী গ্রুপের। পার্লামেন্টে ইসলাম ও গণতন্ত্রের সপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। স্বৈরশাসকের কুখ্যাত পারিবারিক আইন বাতিলের জন্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করেছিলেন ক্ষমতাসীনদের হুমকি ও প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও। সামরিক এক নায়ক আইউবের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণআন্দোলনকালে গঠিত কপ, পিডিএম ও ডাক নামক জোটসমূহের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

www.pathagar.com

বাংলা, ইংরেজী, উর্দু ভাষায় পারদর্শী জনাব খান ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন স্কুল-কলেজ। শিক্ষার বিস্তারের জন্যে দান করে গেছেন নিজের সম্পত্তি। আব্বাস আলী খান একাধিকবার পালন করেছেন হজ্ব ও ওমরা। ইসলামী সংস্থা-সংগঠনের আহবানে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, লিবিয়া, পাকিস্তান ও ভারত সফর করেছেন।

খান সাহেব ছিলেন আজীবন একনিষ্ঠ পাঠক ও সাহিত্য প্রেমিক। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, মৃত্যু যবনিকার ওপারে, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, ঈমানের দাবী, মাওলানা মওদুদী, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস প্রভৃতি। রস রচনার জন্যে খ্যাত আব্বাস আলী খান অনুবাদেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

তাঁর রচিত গ্রন্থ মৃত্যু যবনিকার ওপারের শেষে তিনি লিখেছিলেন ঃ "সর্বশেষে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আমার কাতর প্রার্থনা, তিনি যেনো আমাদেরকে উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের পূর্ণ তওফিক দান করেন। সকল প্রকার গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র রেখে তাঁর সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার শক্তি দান করেন। অবশেষে যেনো তাঁর প্রিয় বান্দাহ হিসাবে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি। আমীন।"

আল্লাহ্পাক খান সাহেবের সেই মুনাজাত কবুল করুন- এ দোয়া করি। খান সাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও খান সাহেবের সেই আরাধ্য জীবনের জন্যে আল্লাহ্পাকের নিকট নিবেদন করি।

মূসা সাহেব জানালেন যে, বাদ এশা মসজিদে হারামের আযান ঘরের নীচে প্রফেসর গোলাম আযম কর্তৃক খান সাহেবের জন্যে দোয়া পরিচালনার কথা রয়েছে। কিন্তু তখন আমাদের দেরী হয়ে গেছে। আমরা এ সময় যথাস্থানে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে এলাম। উল্লেখযোগ্য যে, অল্প ক'দিন আগে অধ্যাপক গোলাম আযম, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ মক্কায় এসেছিলেন। পরে শুনেছি যে, অধ্যাপক গোলাম আযম, খান সাহেবের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে ঐদিনই ঢাকার উদ্দেশ্যে সৌদিআরব ত্যাগ করেন।

পরের দিন ফজরের নামাযের পর আমি খান সাহেবের রূহের মাগফিরাত কামনা করে একটি তওয়াফ করি এবং বিশেষভাবে দোয়া করি।

তানঈম থেকে বার বার ওমরা করা থেকে বিরত থেকেছি

পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় আমরা মোট প্রায় নয়দিনের মত অতিবাহিত করেছি। এ কদিন আমি বেশী বেশী তওয়াফ করতে চেষ্টা করেছি। আমার 'হজ্বের ডায়েরী থেকে' বইতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছি বলে বইটির জনৈক সমালোচক আমাকে আত্মপ্রচারের জন্যে অভিযুক্ত করেছেন বলে এ বইতে তওয়াফের সংখ্যা উল্লেখ করছিনে। তবে সব ধরনের ইবাদতের উপর নিঃসন্দেহে তওয়াফকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেছি এ কথা বলা নিশ্চয়ই দোষের নয় বলে আমি মনে করি। অনেকে তওয়াফ বাদ দিয়ে আয়িশা মসজিদ থেকে বারবার ওমরা করেন, আমরা তা পরিহার করেছি সুন্নতের খেলাপ বলে।

আমি তওয়াফের উপরই জোর দিয়েছি অথবা কমছে কম মসজিদে হারামে বসে বসে খানায়ে কা'বার দিকে চেয়ে থেকেছি। তওয়াফের তূলনায় তানঈম (আয়িশা রাঃ মসজিদ) থেকে বার বার ওমরা করাকে অনেকে উত্তম বলে মনে করেন। মূলতঃ এটি একটি ভুল ও গোমরাহী। ইহা ভুল হওয়ার

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট প্রমাণ হল সালফে ছালেহীনের বিরোধিতা। কেননা, একই সফরে রসূল (সঃ) তাঁর সাহাবী ও তাবেয়ীদের কারো থেকে একাধিক ওমরা করা সাব্যস্ত নেই। হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে নেয়া বর্ণিত হাদীসটি তার সাথে খাছ বা বিশেষিত। তার প্রমাণ হল, তাঁর ভাই আব্দুর রহমান। তিনি তাঁর সাথে তানঈম পর্যন্ত গিয়েও ওমরার ইহরাম করেননি। অন্য দিকে রসূল (সঃ) বিদায় হজ্বে মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেও কখনো তানঈম থেকে ওমরা করেননি।

তাউছ ইবনু কাইছান (রহঃ) বলেন, আমার জানা নেই, যারা তানঈম থেকে ওমরা করে তারা কি সওয়াব প্রাপ্ত হবে না শাস্তি প্রাপ্ত হবে। বলা হল কেন? তিনি বলেন, কেননা তারা সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করে। আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ ছেড়ে দিয়ে চার মাইল বাইরে গিয়ে ফিরে আসে। মক্কায় অবস্থান করে তানঈম গিয়ে বার বার ওমরা আদায় করা যেমনিভাবে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) কোন সাহাবীর আমল দ্বারাও বুঝা যায় না; সুতরাং তানঈম থেকে ওমরা করা বেদ'আত প্রমাণিত হল।

এবার ফেরার পালা

আমাদের দেশে ফেরার তারিখ ৪ঠা অক্টোবর। স্থানীয় সময় ১০-৩০টার ফ্লাইটে। ইতিমধ্যে টিকেট কনফার্ম করে নিতে হয়েছে। কেনা কাটাও যথারীতি সমাধা করা হয়েছে। সকল ব্যাপারে মূসা সাহেব আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করলেন। পবিত্র যমযমের পানি আমরা নিজ হাতেই কেইনে তুলে নিলাম। ৪ঠা অক্টোবর মূসা সাহেব রাত ৭ টায় আমাদের হোটেলে হাযির হয়ে আমাদের লাগেজ বাঁধায় সাহায্য করলেন। অতঃপর আমাদেরকে হোটেলে রাতের খাবার খাওয়ালেন এবং সেই ট্যাক্সি যাতে আমার ব্যাগ রেখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল, ভড়া করে আমাদেরকে জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌছে দিলেন। এবার পোর্টে কিছুক্ষণ তিনি আমাদের সাথে ছিলেন এবং অবশেষে সালাম বিনিময়ের পর সেই মহান হৃদয়ের ড্রাইভার সহ প্রস্থান করলেন। তাদের দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করে শেষ করা যাবে না। ওমরার এ সফরে তাঁদের সহযোগীতার কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে। আল্লাহ্‌পাক তাঁদের উত্তম জা'যা দিন। এ দোয়াই করি। পবিত্র ওমরা করার তৌফিক দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি শোকর আদায় এবং নবীপাকের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে ভবিষ্যতে বার বার এ পূন্য ভূমিতে সফরের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করে আমরা আমাদের বিমানে আসন গ্রহণ করলাম। বিমানে এসে দেখলাম যে, সৌদি আরবে সফররত জামায়াতের অন্যান্য নেতারাও একই ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ফ্লাইট ৫ই অক্টোবর সকালে যথাসময়ে ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আমাদেরকে নিয়ে অবতরণ করল। বাসা থেকে বিবি বাচ্চারা এবং অফিসের এক সহকর্মী আমাদেরকে বিমান বন্দরে ফুলের তোড়া দিয়ে রিসিভ করলেন। ওমরা সম্পাদনের সুযোগ দানের জন্যে পথে বারবার আল্লাহ্‌পাকের দরগাহে কৃতজ্ঞতা পেশ করলাম।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাবের নিয়মাবলী

১। শুধুমাত্র একক ব্যক্তির নামে মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবেন।

২। ইসলামী শরীয়ার মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই জমা গ্রহণ করে।

৩। উক্ত হিসাব খোলার জন্যে কোন ছবি প্রয়োজন হয় না।

৪। এক হতে পঁচিশ বছরের ভিতর হজ্ব সম্পাদনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ মাসিক কিস্তিতে হজ্বের টাকার জমা গড়ে তুলতে পারেন।

৫। ২০০১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বছর ওয়ারী মাসিক কিস্তির হার নিম্নে দেখান হল। যিনি যে সালে হিসাব খুলবেন, তার জন্য সে সালের কিস্তি প্রযোজ্য হবে।

মেয়াদ	২০০১		২০০২		২০০৩	
	মাসিক কিস্তি টাকা	হজ্বের আনুমানিক খরচ	মাসিক কিস্তি টাকা	হজ্বের আনুমানিক খরচ	মাসিক কিস্তি টাকা	হজ্বের আনুমানিক খরচ
২৫	২০৫	২২০,০০০	২১০	২২৫,০০০	২১৫	২৩০,০০০
২৪	২২০	২১৫,০০০	২২৫	২২০,০০০	২৩০	২২৫,০০০
২৩	২৪০	২১০,০০০	২৪৫	২১৫,০০০	২৫০	২২০,০০০
২২	২৬০	২০৫,০০০	২৬৫	২১০,০০০	২৭০	২১৫,০০০
২১	২৮০	২০০,০০০	২৮৫	২০৫,০০০	২৯৫	২১০,০০০
২০	৩০৫	১৯৫,০০০	৩১০	২০০,০০০	৩১৫	২০৫,০০০
১৯	৩৩০	১৯০,০০০	৩৩৫	১৯৫,০০০	৩৪৫	২০০,০০০
১৮	৩৫৫	১৮৫,০০০	৩৬৫	১৯০,০০০	৩৭৫	১৯৫,০০০
১৭	৩৮৫	১৮০,০০০	৩৯৫	১৮৫,০০০	৪১০	১৯০,০০০
১৬	৪২০	১৭৫,০০০	৪৩৫	১৮০,০০০	৪৪৫	১৮৫,০০০
১৫	৪৬০	১৭০,০০০	৪৭৫	১৭৫,০০০	৪৯০	১৮০,০০০
১৪	৫০৫	১৬৫,০০০	৫২০	১৭০,০০০	৫৩৫	১৭৫,০০০
১৩	৫৫৫	১৬০,০০০	৫৭০	১৬৫,০০০	৫৯০	১৭০,০০০
১২	৬১০	১৫৫,০০০	৬৩০	১৬০,০০০	৬৫০	১৬৫,০০০
১১	৬৮০	১৫০,০০০	৭০০	১৫৫,০০০	৭২৫	১৬০,০০০
১০	৭৬০	১৪৫,০০০	৭৮৫	১৫০,০০০	৮১০	১৫৫,০০০
০৯	৮৫৫	১৪০,০০০	৮৮৫	১৪৫,০০০	৯২০	১৫০,০০০
০৮	৯৭৫	১৩৫,০০০	১০১০	১৪০,০০০	১০৫০	১৪৫,০০০
০৭	১১২৫	১৩০,০০০	১১৭০	১৩৫,০০০	১২১০	১৪০,০০০
০৬	১৩২৫	১২৫,০০০	১৩৭৫	১৩০,০০০	১৪৩০	১৩৫,০০০
০৫	১৬০০	১২০,০০০	১৬৬৫	১২৫,০০০	১৭৩০	১৩০,০০০
০৪	২০০০	১১৫,০০০	২১০০	১২০,০০০	২১৭৫	১২৫,০০০
০৩	২৬৭৫	১১০,০০০	২৮০০	১১৫,০০০	২৯২০	১২০,০০০
০২	৪০০০	১০৫,০০০	৪২০০	১১০,০০০	৪৪০০	১১৫,০০০
০১	৭৯৫০	১০০,০০০	৮৩৫০	১০৫,০০০	৮৭৫০	১১০,০০০

৬। হিসাবটি যথারীতি চালু থাকাকালীন ১.১০-হারে ওয়েটেজের (Weightage) ভিত্তিতে দৈনিক স্থিতির উপর লাভ বর্ষপূর্তিতে হিসাবে জমা হবে।

www.pathagar.com

৭। কোন জমাকারী যদি পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হজ্ব সম্পাদনে আগ্রহী হন, তাহলে তিনি তাঁর মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত টাকার সাথে ঐ বছর নির্ধারিত হজ্বের টাকার অবশিষ্টাংশ জমা করে হজ্ব সম্পাদন করতে পারবেন।

৮। কোন জমাকারী পরবর্তীতে হজ্ব সম্পাদনে আগ্রহী না হলে এবং তাঁর জমাকৃত টাকা উঠিয়ে নিতে চাইলে তিনি জমার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব এর হারে মুনাফা পাবেন।

৯। আমানতকারী গ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে আবেদন করলে এক শাখা হতে অন্য শাখায় হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব স্থানান্তর করতে পারবেন।

১০। মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব হতে কোন টাকা উত্তোলন করা যাবে না এবং সে কারনে কোন চেক বই প্রদান করা হবে না।

১১। কিস্তি জমার ক্ষেত্রে ১২ কিস্তিতে বছর ধরা হবে। যেমন ৫ বছর মেয়াদের জন্যে ৬০ কিস্তি, ১০ বছর মেয়াদের জন্যে ১২০ কিস্তি ও ২৫ বছর মেয়াদের জন্যে ৩০০ কিস্তি জমার প্রয়োজন হবে।

১২। নিয়মিত কিস্তি প্রতিমাসের ১০ তারিখের ভিতর জমা করতে হবে। কিস্তির টাকা কেহ অগ্রিম জমা দিতে চাইলে তা জমা করা যাবে।

১৩। যদি কোন জমাকারী পর পর তিনটি কিস্তি জমা না করেন তবে তাঁর মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব বাতিল হয়ে যাবে এবং জমাকৃত টাকার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হারে মুনাফা পাবেন। কিন্তু পর পর এক/দুই কিস্তির বকেয়া টাকা পরবর্তী নিয়মিত কিস্তির সাথে জমা করলে হিসাব বলবৎ থাকবে। তবে কোন বছরে এরূপ অনিয়ম পুনরাবৃত্তি হলে এ হিসাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪। চূড়ান্ত মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমাকৃত টাকা যদি উক্ত বছরে হজ্বের প্রকৃত খরচের কম হয় তবে বাকী টাকা এককালীন জমা করে হজ্ব করতে পারবেন।

১৫। জমার মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমা হজ্বের প্রকৃত খরচের বেশী হলে অতিরিক্ত টাকা জমাকারীকে ফেরত দেয়া হবে।

১৬। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে হজ্ব পালনে ব্যর্থ কোন জমাকারী পরবর্তী কোন সময়ে হজ্ব সম্পাদনে আগ্রহী হলে তিনি তার জমার মূল মেয়াদকাল পর্যন্ত হজ্ব সঞ্চয়ী হার অনুযায়ী মুনাফা পাবেন। মেয়াদোত্তর সময়ের জন্যে উক্ত হিসাবে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব এর হার প্রযোজ্য হবে।

১৭। এ হিসাব থেকে সরকারী নিয়মানুসারে কর/শুল্ক কর্তন করা হবে।

১৮। ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও উক্ত স্কীমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১৯। ব্যাংক যে কোন সময় এ হিসাব সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারে এবং আমানতকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২০। আমানতকারীর মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি সমুদয় স্থিতির প্রাপক হবেন।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ১৯৪৯ সালে নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার অন্তর্গত বিনোদপুর ইউনিয়নের জালীয়াল গ্রামে এক রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নোয়াখালী শহরের কল্যাণ হাই স্কুল ও নোয়াখালী সরকারী কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে যথাক্রমে এস.এস.সি. এবং গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে ঢাকা / চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। কর্ম জীবনে তিনি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা, পত্রিকায় সাংবাদিকতা সহ বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে অবশেষে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি সেখানে কর্মরত আছেন। বর্তমানে তিনি এ ব্যাংকের একজন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ছোট গল্প ও প্রবন্ধকার অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ১৯৯৮ সালে হজ্বব্রত পালন শেষে "হজ্বের ডায়েরী থেকে" বইটি রচনা ও প্রকাশ করেন। হজ্ব উপলক্ষে তাঁর সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বইটি সর্বমহলে অভিনন্দিত হয়।

তাঁর দ্বিতীয় রচনা "ওমরার ডায়েরী থেকে" বইটিও তাঁর মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মনোয়ারার সফরকাহিনী সহ ঐতিহাসিক ঘটনা সমৃদ্ধ যা সবার নিকট শিক্ষণীয় এবং উপভোগ্য হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com